ইসলামী স্বাস্থ্য নীতি

ফজল করিম ফারানী

ফযল করীম ফারানী

.....

ইসলামী স্বাস্থ্যনীতি

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ সিরাজুল হক

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী স্বাস্থ্যনীতি
মূল ঃ ফযল করীম ফারানী
অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ সিরাজুল হক

ই. ফা. বা. প্রকাশনা ঃ ১২২১/১
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার ঃ ৬১৪'০২৯৭

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ১৯৮৬; ভাদ্র ১৩৯৩; মহররম ১৪০৭

প্রকাশনা
অধ্যাপক আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২

প্রচ্ছদ
রায়হান শরীফ

মুদ্রণ
অরিয়েণ্টাল প্রেস
১৩, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১

বাঁধাই
আল-ইসলাম বুক বাইণ্ডার্স
৬৩/১, শুকলাল দাস লেন

মূল্য ৩৫'০০ টাকা

ISLAMI SWASHTHYA NITI ঃ (Health Policy in Islam) by Fazal Karim Farani, translated by Mohammad Sirajul Hoque and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. September 1986

Price ঃ Tk. 35·00; Dollar (U. S.) ঃ 2·00

উৎসর্গ

মরহুম আবব্বা ও আম্মার রুহের মাগফিরাত কামনায়

মোহাম্মদ সিরাজুল হক

আমাদের কথা

ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা—এ কথাটা আমরা যত সহজে মুখে বলে থাকি, ততটা গুরুত্ব দিয়ে প্রায়শই এর অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করি না। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে বিবেচনা করতে হলে এর মধ্যে আমাদের শুধু আধ্যাত্মিক দিকের নয়, অন্যান্য দিকের, এমন কি, দৈহিক তথা স্বাস্থ্যগত উন্নতিরও পথ নির্দেশ থাকতে হবে। অথচ আমরা অনেকেই রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির ন্যায় ইসলামের যে একটা স্বাস্থ্যনীতিও থাকতে পারে—এমনটা মেনে নিতে ততটা অভ্যস্ত নই। অনেকে বরং বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে চান, স্বাস্থ্যের সাথে আদর্শের কি সম্পর্ক থাকতে পারে!

এই তো গেল চিত্রের এক দিক। এবার অপর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখবো—পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্বাস্থ্যের বিষয়ে উল্লেখ এসেছে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে—এ কথা আমরা অনেকে জানলেও এ জানা থেকে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার তেমন সমৃদ্ধ হতে পারে না এজন্য যে, এগুলো অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মিশে আছে, আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, ফলে এসব সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান লাভের উপযোগী গ্রন্থের অভাব বড্ড বেশী। বিশেষত বাংলা ভাষায় এ অভাব অতি প্রকট।

আমাদের সৌভাগ্য, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গবেষকের দৃষ্টিতে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ফযল করীম ফারানীর রচিত 'ইসলামী উসূলে সেহেত' শীর্ষক উর্দু ভাষার একখানি গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে আমাদের বহুদিনের একটি অভাব দূর করার চেষ্টা করা হয়। ইসলামী জীবন বিধানের অন্যান্য বহু দিকে বহু বই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রয়েছে। কিন্তু ইসলামের

স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে গ্রন্থের সংখ্যা, বিশেষত বর্তমান যুগে যে সারা পৃথিবীতেই কম, তা কোন প্রতিবাদের ভয় না করেই বলা যেতে পারে। এ কারণেই ফারানী রচিত উল্লিখিত গ্রন্থের গুরুত্ব সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। পাক কুরআন ও হাদীসের বিশাল সাগর মন্থন করে লেখক স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিষয়গুলি একটি গ্রন্থে সুবিন্যস্তভাবে পরিবেশন করে এক সুদূরপ্রসারী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

এই মহামূল্যবান গ্রন্থখানি বাংলায় তরজমা করে মোহাম্মদ সিরাজুল হক আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

গ্রন্থখানির বিপুল চাহিদার কারণে কিছুদিনে মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া। এই গ্রন্থখানির উসিলায় আল্লাহ্ তা'আলা অনুবাদকের লেখনী শক্তি আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করুন এবং এ প্রচেষ্টাকে আমাদের সকলের মাগফিরাতের একটি উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

আবদুল গফুর
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৩রা মহররম, ১৪০৭ হিঃ
৮. ৯. ৮৬ ইং

অনুবাদকের আরয

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে রয়েছে মানব-জীবনের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় নীতি ও যে কোন সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায়-উপকরণ। কিন্তু অনেকে মনে করেন ইসলামে রয়েছে শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত-এর ন্যায় কতগুলো নির্দেশ। জীবন সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায় এতে নেই। এটা ইসলাম ও পবিত্র গ্রন্থ কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ ইসলামে অন্যান্য নীতির ন্যায় স্বাস্থ্যনীতির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এ যাবত তা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি।

ফযল করীম ফারানী রচিত উর্দু اسلامی اصول صحت নামক গ্রন্থখানি পাঠ করে আমি দেখতে পেলাম এতে রয়েছে ইসলামী স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, যা মানব জীবনের স্বাস্থ্যরক্ষায় অনেক সহায়ক হবে। তাই বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে এ অভিনব গ্রন্থ পেঁাছে দেওয়ার অভিপ্রায়ে আমি এর অনুবাদের কাজ আরম্ভ করি। বইখানা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার যে সুযোগ আমি পেয়েছি সে জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া। দ্রুত প্রকাশ করার কারণে মুদ্রণজনিত ভুল-ত্রুটির জন্য সম্মানিত পাঠকবর্গ সমীপে অনুরোধ রইল-তা যেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভবিষ্যতে সংশোধনের সুযোগ দেন। বইখানা পাঠ করে যদি কেউ উপকৃত হন তা হলেই শ্রম সার্থক মনে করব।

অনুবাদকের আরয
দ্বিতীয় সংস্করণ

স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে ইসলামের যে বিধান রয়েছে এ সম্পর্কে আমাদের অনেকের জ্ঞান খুবই সীমিত। অবশ্য এ বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় খুব কম বই প্রকাশিত হয়েছে। তাই 'ইসলামী স্বাস্থ্য-নীতি' নামক এ অভিনব গ্রন্থখানি প্রকাশ হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। গ্রন্থখানি দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক জনাব আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আবদুস সাত্তার আদ্যোপান্ত পাঠ করে এর প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং দু'এক জায়গায় সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেছেন। বন্ধুবর আলহাজ্জ অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম গ্রন্থখানি সম্পাদনা করে আরো পরিমার্জিত করে দিয়েছেন। এজন্য তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় মহান আল্লাহ্র দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া। গ্রন্থখানি পাঠে কেউ উপকৃত হলে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করব। সর্বশেষে মহান আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত করি, আল্লাহ যেন এ শ্রম সার্থক করে গ্রন্থখানি কবুল করেন এবং পরকালে মহানবী (স.)-এর শাফা'আত নসীব করেন। আমীন।

ঢাকা
৩রা মুহররম
৮ই সেপ্টেম্বর/১৯৮৬ ইং।

অনুবাদক

গ্রন্থকারের ভূমিকা

পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার যে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো 'রাববুল 'আলামীন' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি করে, লালন-পালন- করে স্তরে স্তরে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীতকারী। তাঁর প্রতিপালনবাদী গুণের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক রয়েছে এতে মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় উন্নতিই অন্তর্ভুক্ত। মানুষের দেহ ও আত্মার সাথে পারস্পরিক অত্যন্ত গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। একের সুস্থতা বা অসুস্থতা অন্যের উপর শুভ বা অশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং উন্নতির সহায়তা কিংবা বাধার সৃষ্টি করে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে পবিত্র কুরআন এক অদ্বিতীয় কর্মপদ্ধতি স্থির করেছে। সে বিষয়ে এখানে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। শুধু মানুষের দৈহিক উন্নতি তথা স্বাস্থ্য ও এর স্থায়ী চিকিৎসা সম্পর্কেই এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে কিছু নিবেদন করা হবে।

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্মের দাবিদার। তাই এর জন্যে প্রয়োজন, মানব জীবনের যে-কোন দিক সম্পর্কে—তা এরূপ নীতি ও পথনির্দেশ করবে এবং এতে এরূপ নমনীয়তা থাকবে, যাতে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ, প্রত্যেকটি অঞ্চল এবং যে-কোন অবস্থা ও পরিবেশে কোন কষ্ট বা বাধা ছাড়াই এর প্রয়োগ হতে পারে।

ইসলাম, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (স.) মানুষের স্বাস্থ্য ও সুচিকিৎসা সম্পর্কে এরূপ শিক্ষা দিয়েছেন যে, অন্য কোন

শরীয়ত বা কোন ধর্মের নবী বা পথ প্রদর্শক তা দেন নি। আধ্যাত্মিক শিক্ষার মত এটাও অদ্বিতীয়। এটা শুধু দাবিই নয়, বরং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এবং সততা ও ঘটনার উপর নির্ভরশীল।

আমরা কখনো এ কথা বলব না যে, পূর্বের শরীয়ত ও ধর্ম স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কিছুই ঘোষণা করেনি বা স্বাস্থ্য-রক্ষার নীতিসমূহ তাতে একেবারেই উহ্য ছিল। প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির মাঝে পাক-পবিত্রতা, ধোয়ামোছা, সুগন্ধি লাগানো এবং জ্বালানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধানের প্রচলন ছিল। এ সম্পর্কে নীতি-নির্দেশও ছিল। কিন্তু এর একটি সাধারণ রূপমাত্র সেখানে ছিল। নিয়ম-শৃংখলা এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা সেখানে ছিল না।

ইসলাম পূর্বের স্বাস্থ্যরক্ষা নীতির সাথে নতুন ও অত্যন্ত ফলদায়ক এবং কর্মকারক নীতি মিলিয়ে এগুলোকে আরো সংহত রূপদান করেছে। ঐগুলো একটি নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে নিয়ে এসে যেন অমূল্য মণি-মুক্তার মালার রূপ দিয়ে তা দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করেছে।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (স.)-কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে বলেন: وثيابك فطهر والرجز فاهجر ওয়া সিয়াবাকা ফাতাহ্হির, ওয়ার রুজযা ফাহজুর।" অর্থাৎ আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র করুন এবং যে-কোন প্রকার ময়লা, নোংরামী ও অপবিত্রতা থেকে নিরাপদ থাকুন।

আরবী ভাষা এরূপ অলংকারপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় যে, দুনিয়ার অন্য কোন ভাষা এর সাথে তুলনীয় হতে পারে না। একই শব্দে দু'একটি অক্ষরের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এর অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সৃষ্টি হয়। ইস্‌মে নাকেরা বা অনির্দিষ্ট ব্যক্তিবাচকের উপর আলিফ-লাম (الف لام) বসালে এর অর্থ এরূপ বিশদ করে দেয় যে, ঐ বস্তুর প্রত্যেক প্রকার, প্রত্যেক অবস্থা

এবং প্রত্যেক পরিমাণের উপর সাধারণভাবে গণ্য হয়ে থাকে। এটাকে আলিফ-লাম ইসতিগরাকী (الف لام استغرقی) বলা হয়। এর উদাহরণ পবিত্র কুরআনের প্রথম শব্দ الحمد। حمد এর অর্থ প্রশংসা এবং সৌন্দর্য। কিন্তু এর উপর الف لام ব্যবহার করে অর্থের মধ্যে এত ব্যাপকতা আনা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রকারের প্রশংসা এবং সৌন্দর্য যতদূর কল্পনা করা যায়, এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

সুতরাং "والرجز فاهجر" বাক্যে رجز-এর মধ্যে الف لام-এর ব্যবহার হওয়াতে এর অর্থ হলো প্রত্যেক প্রকারের অপবিত্র ময়লা, আবর্জনা এবং নোংরা বস্তু। আধ্যাত্মিক বা দৈহিক, একক বা জাতীয়, পোশাক সম্পর্কে হোক বা আহার সম্পর্কে, আবাসস্থলে হোক বা অলি-গলিতে, জনসাধারণের চলার পথে হোক বা বিশ্রামাগারে, অধিক হোক কিংবা অল্প, এর থেকে পরিত্রাণ লাভ করার জন্যে অতি গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিয়েছেন।

বস্তুত এ অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যটি কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ের বহুবিধ অর্থ-বোধক, যাতে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত ইসলামী বিধান ও নির্দেশাবলীই একীভূত হয়েছে এবং ঐ গুলো এসব সাধারণ নির্দেশাবলীরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। যদি এ শিক্ষায় স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে অন্য কোন নির্দেশ পাওয়া না যেত, তবুও এই একটি নির্দেশই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামে এত ব্যাখ্যা, এত উন্নত, প্রজ্ঞাময় এবং প্রয়োজনীয় উপকারী নির্দেশ রয়েছে যে, এর অর্ধেকও অন্যান্য ধর্ম বা জাতির মধ্যে দেখা যায় না এবং বর্তমান যুগের সভ্য ও উন্নত জাতি, যারা আজ আকাশের পানে উড্ডয়ন করছে, এত অধিক জ্ঞান অর্জন, চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতি এবং বিরাট বিরাট সাফল্যের দাবি করা সত্ত্বেও এখনো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে এত উন্নত হতে পারেনি। যে অবস্থায় ইসলাম মানবজাতিকে দেখতে চায়।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের এ নির্দেশ ছাড়াও মহানবী (স.)-এর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশ পাওয়া যায়, যা অত্যন্ত উপকারী ও কার্যকর। যেমন হুযুর (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ্

তা'আলা স্বয়ং পবিত্র এবং তিনি পবিত্র বস্তু পসন্দ করেন।[১] পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক, কেননা ইসলাম পবিত্র ধর্ম।[২] তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা ময়লা আবর্জনা ও অবিন্যস্ত কেশ পসন্দ করেন না।[৩]

এ সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করে চিন্তাধারা ও মন-মানসিকতার দিক দিয়ে মুসলমানদের দুটো দল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমান যুগে মৌলভী সাহেবগণ এ সমস্ত মাস'আলা বর্ণনা করে এর সাথে সাথে ন্যায়াচার ও প্রজ্ঞার কথাও বেশী পরিমাণে বলে থাকেন। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি কোন হুকুম-আহকামের হিকমত বা তত্ত্ব এবং যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে তাঁদের কোন প্রশ্ন করে, তখন তাঁরা রাগান্বিত হয়ে প্রশ্নকারীকে কাফির বা ইত্যাকার ফতওয়া দিয়ে থাকেন। প্রকৃত-পক্ষে নিজেও এর হিকমত এবং যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে জানেন না, আবার অন্য কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুক তাও তিনি পসন্দ করেন না। তিনি তো প্রত্যেকটি নির্দেশ কোন সমালোচনা ছাড়াই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করার জন্যে কঠোরভাবে বারবার বলে থাকেন।[৪]

এর বিপরীতে বর্তমানকালের মুসলমান নব্য শিক্ষিতদের একটি দল রয়েছে, যাঁদের অধিকাংশ বস্তুজগত ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও চিন্তাধারার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করে স্বীয় সংকীর্ণ জ্ঞানের শিকার হয়েছেন। তাঁরা পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি শব্দ বা আওয়াজের উপর—যদিও সেটা তাদের পূর্ববর্তী মনীষী ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের আওয়াজই হোক না কেন, সর্বদা 'লাব্বায়েক' বলার জন্যে তৈরী থাকে এবং এটাকে বর্তমান যুগের আবিষ্কার বলে স্বীকৃতি দেয়। এ সমস্ত প্রভাব এবং মৌলভী সাহেবগণের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁরা

---

১. মুসলিম

২. "تنظفوا فان الاسلام نظيف"

৩. "ان الله يبغض الوسخ والشعث"

৪. লেখকের উপরিউক্ত মন্তব্য সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কেননা সব মোল্লা-মৌলভী বা উলামা-ই-কিরাম মাস'আলা জানেন না বা এর হিকমত ও যুক্তি-প্রমাণ জানেন না—এটা হতেপারে না বরং দীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ যথেষ্ট উলামা-ই-কিরাম এখনও আছেন—অনুবাদক।

ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন এবং এর থেকে দূরে থাকেন। যখনই এ শিক্ষার কোন নীতি বা বিধান তাঁদের সামনে পেশ করা হয়—যার উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত, তখন তাঁরা এগুলোকে অতি প্রাচীন বলে তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন।

ইসলামের বিধানগুলো মানার জন্যে মৌলভী সাহেবগণের চাপ প্রয়োগ এবং নিত্য নতুন দর্শনের ভক্তদের অস্বীকার ও তাদের ইসলামী শিক্ষা ও ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা ইসলামের শত্রুদের হাতে এক অস্ত্র তুলে দিয়েছে। তারা ইসলামী শিক্ষার উপর সমালোচনার ঝড় তুলে দিয়েছে। কিন্তু যখন যুক্তি-প্রমাণ এবং ঘটনার আলোকে এর হিকমত ও সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়েছে, তখন তাদের অস্বীকারের কোন উপায় বাকী থাকে নি। তখন তারা এ আক্রমণ ধারা পরিবর্তন করে অন্য দিক হতে সমালোচনা শুরু করে। এরূপে এটাকে এমনভাবে লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছে যে, এর ফলে শিক্ষিত মহল এতে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েন।

তাঁরা বলে থাকেন, কিভাবে অসভ্য, নিরক্ষর এবং অত্যন্ত অপরিচিত ও নিম্নশ্রেণীর একটি জাতির অত্যন্ত মূর্খ কোন ব্যক্তি অন্য কোন প্রসিদ্ধ ও উচ্চশ্রেণীর অভিজ্ঞ ও সম্মানিত ব্যক্তির কাছে শিক্ষা গ্রহণ না করে প্রজ্ঞাময় ও উন্নতমানের শিক্ষা প্রদান করতে পারে ?

'এ নিরক্ষর আরববাসীর বর্ণিত শিক্ষা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রবর্তিত শরীয়তের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ তাঁর স্বীয় জাতির মূর্খতা এবং লেখাপড়ার প্রতি অনীহা য়াহূদী ও নাসারাদের (খৃস্টানদের) নিজ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অবস্থান, একই যুগে এ দুটো জাতির সারা দুনিয়ায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চা, যৌবনকালে তাঁর সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ এবং য়াহূদী ও নাসারাদের সাথে সাক্ষাত, এগুলোই বুঝি প্রমাণ করে যে, এই নিরক্ষরকে শিক্ষাদানকারী য়াহূদী ও নাসারাদের আলিম সম্প্রদায়।

বস্তুত এগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, অনুমান ও কাল্পনিক চিন্তা—যেগুলোর অনুকূলে কোন নিশ্চিত ঘটনাবহুল সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করা যায় না। এর পূর্বে বহু মুসলিম আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তি

এ ধরনের সমালোচনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। কিন্তু বিরোধী দল তবুও এই সমালোচনা করতে থাকবে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্তরে সর্বদা এ সন্দেহের উদ্রেক হতে থাকবে। তাই এ সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলা উচিত বলে মনে করি।

বর্তমান যুগে এ সমালোচনা উন্নত জাতির তথাকথিত উন্নত চিন্তাধারা এবং ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (স.)-এর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষেরই ফল। এ সমস্ত জাতি নিজেদেরকে সর্বপ্রকার উন্নতি ও গুণাবলীর ইজারাদার মনে করে সাধারণত অন্য জাতির মাঝে কোন উন্নত দর্শন অপসন্দ করে। যদিও কোন উন্নতি বা মঙ্গল বাস্তবে পাওয়া যায় তবু তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হন না। আবার মেনে নিলেও সর্বদা এ স্বীকৃতির সাথে যে এ জাতি তাদের থেকে শিখে এ উন্নতি লাভ করেছে।

মহানবী (স.)-এর নিরক্ষর বা উম্মী হওয়া সর্বজনস্বীকৃত এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। লেখাপড়া উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা বস্তুজগতের জ্ঞান অর্জনের জন্য অপরিহার্য। এ ছাড়া লেখা-পড়া ব্যতীত জ্ঞান আহরণ করা একেবারেই অসম্ভব। যদি কোন নিরক্ষর মানুষ কারো থেকে কিছু অর্জন করে, তবুও সে এটা তেমন উত্তমরূপে অন্যের নিকট প্রকাশ করতে পারে না, যা একজন শিক্ষিত লোক করতে পারেন।

এ ঘটনার সাক্ষী ইতিহাসে রয়েছে যে, মক্কার কুরায়শগণ গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতো এবং শীতকালে ফিরে আসত। এটাও ঐতিহাসিক ঘটনা যে, মহানবী (স.) স্বীয় যৌবনকালে অত্যন্ত পরিশ্রম, আমানতদারী ও সততার সাথে কাজ করতেন। তাঁর ব্যবসার উদ্দেশ্যে এ কাজে লিপ্ত থাকা এবং ঐ সমস্ত দেশে সাময়িক অবস্থান কখনো এটা প্রমাণ করে না যে, তিনি আধ্যাত্মিক ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার জন্যে অথবা কোন সাধারণ শিক্ষার জন্যে নিরক্ষর হওয়ার ফলে তাদের থেকে কিছু অর্জন করেছেন।

নবুয়াত প্রাপ্তির পর হুযূর (স.)-এর জীবন এত ব্যস্ততা ও দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ ছিল যে, কোন বিজ্ঞ আলিমের সংস্পর্শে

আসা এবং কিছু অর্জন করে তা গোপন রাখা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। মদীনায় মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশায় য়াহুদী-নাসারাদের বিরোধিতা প্রকাশ্য এবং চরম পর্যায়ে পেঁাছেছিল। তারা কিভাবে হুযুর (স.)-এর সাথে সম্পর্ক রাখবেন ? মজার ব্যাপার হলো এই যে, মদীনাবাসী য়াহুদীদের প্রধান আলিমদের অন্যতম আবদুল্লাহ বিন সালাম ইসলাম গ্রহণ করে নিরক্ষর নবীর সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। শুধু এ ঘটনাই শিক্ষা গ্রহণের সমালোচনার উপযুক্ত প্রমাণ।

পবিত্র কুরআনের উপর—যা নিরক্ষর নবীর পেশকৃত সমস্ত জ্ঞান ও শিক্ষার উৎস, সামান্য দৃষ্টিপাতেই এই সমালোচনার কারণ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাওহীদ ও রিসালত এবং আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জিলের পেশকৃত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ইসলামের বিশ্বাস ও মতবাদ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেকটি দেশেই স্বীয় মনোনীত নবী প্রেরণ করেছেন। জাতে প্রত্যেকটি জাতিই তাঁর সন্তুষ্টির মাধ্যমে তাঁর নিয়ামত ও বরকতসমূহ অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে। এটা অবশ্য য়াহুদী ও নাসারাদের সর্বজনস্বীকৃত বিশ্বাসের পরিপন্থী। তাদের বিশ্বাস হলো, সারা বিশ্বে শুধু বনি ইসরাঈলই এরূপ একটি জাতি, যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও রহমত-দানের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের ছাড়া অন্য কোন জাতির জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা আসমানী এবং আধ্যাত্মিক দরজা খোলেনি। যদিও বাস্তব প্রয়োজনে সমস্ত জাতি ও রাষ্ট্রের উপর প্রয়োজনানুযায়ী বরাদ্দ ছাড়া সর্বদা বৃষ্টি বর্ষণ হয়ে থাকে।

ইসলামে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সাম্য হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইমামত ও নেতৃত্বে কোন কোন শ্রেণী বা বংশের বিশেষত্ব ইসলামে প্রকাশ্য নিষেধ ও বর্জনীয়। ইবাদত ও ধর্মীয় রীতিনীতির সরলতায় এটাই প্রমাণিত যে, হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়ত; ইসলামের উৎস নয়।

হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তে অংশীদার আইন অসম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু পবিত্র কুরআন এমন একটা পূর্ণাঙ্গ উত্তরাধিকার আইন

পেশ করে যা ঐ যুগের য়াহুদী ও খৃস্টান উলামার চিন্তা-কল্পনায়ও ছিল না এবং যা অনুধাবন ও প্রয়োগ করার জন্যে হিসাব বিজ্ঞান এবং অংকশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। বর্তমান যুগের ইউরোপীয় অভিজ্ঞ আইনবিদগণ, যেখানে য়াহুদী জাতিও রয়েছে— এ কথা স্বীকার করেছে যে, ইসলামের উত্তরাধিকার আইন পৃথিবীর সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বিধান।

ওয়াক্‌ফ ও এতদসম্পর্কিত আইন-কানুন ইসলামই আবিষ্কার বা প্রণয়ন করেছে। ইসলাম বহু বিবাহ সম্পর্কে কড়া বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে এবং মহিলাদের সংকটময় মুহূর্তে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার বাস্তব পন্থা ইসলামই পেশ করেছে। তাছাড়া ইসলাম আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে নরনারীদের সামনে এরূপ একটি সুযোগ খুলে দিয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষার বিপরীত মহিলা-দেরকে পাপের মূল বা উৎস হিসেবে স্বীকার করা হয়নি।

পবিত্র কুরআনে বারবার সারা দুনিয়ার আরব-অনারব, য়াহুদী খৃস্টান, একেশ্বরবাদী ও অংশীদারবাদীদেরকে চ্যালেঞ্জ করে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে যে, এরূপ একটি কিতাব বা একটি সূরা অথবা কয়েকটি আয়াত তৈরী করে উপস্থাপন কর এবং এই কিতাব-খানা ঐ নবীর নিজের তৈরী বা অন্য কারো থেকে পড়ে বা শিখে অর্জন করেছেন তা প্রমাণ কর। কিন্তু নমস্ত য়াহুদী-খৃস্টান তথা এই উম্মী নবীর তথাকথিত শিক্ষাদাতা ও পাঠদাতারা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে যায়। অথচ ঐ যুগে য়াহুদী ও খৃস্টান উলামার বিদ্যা ও প্রজ্ঞা সারা দুনিয়ায় বিশ্রুত ছিল।

এরপর যখন মুসলমানদের কোন পদমর্যাদা ও একতা ছিল না এবং তারা দুঃখ ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পিছু হটেছিল, মাতৃ-ভূমি মক্কায় ছোট বড় সকলের অত্যাচারের শিকার হচ্ছিল এবং তাদের উন্নতি তো দূরের কথা কুরায়শদের অত্যাচারের থাবা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশাও ছিল না; এমনি সংকটময় মুহূর্তে

পবিত্র কুরআন বজ্রকণ্ঠে সংশয়হীন বাক্যের দ্বারা মুসলমানদের প্রভূত উন্নতি, অসাধারণ শক্তি সঞ্চয়, তাদের শত্রুদের ধ্বংস ও সম্পূর্ণ পরাজয়ের সংবাদ পূর্বেই পেশ করেছে। য়াহুদী ও খৃস্টান আলিম সম্প্রদায়, যারা ইসলামের প্রবর্তক মহানবী (স.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতো, তারা কি তাদের অনুসারীদের এরূপ সংবাদ দিতে ক্ষম হতো?

ইসলাম 'আমলবিহীন য়াহুদী 'আলিমদেরকে কিতাব বহনকারী গাধার সাথে তুলনা করে, খৃস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল পিতৃত্ব, ঈশ্বরত্ব ওত্রিত্ববাদকে দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় ফিতনা ও বিপদ বলে ঘোষণা করে এ দু'জাতির মর্যাদাবোধ ও একাগ্রতাকে অবদমিত করেছে, কিন্তু তবুও কেউ এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসেনি। কখনো এটা প্রমাণ করার চেষ্টাও করেনি যে, তোমরা আমাদের কাছ থেকে এ সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছ।

অতি আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হবার মত বিষয় হলো এই যে, য়াহুদী ও খৃস্টানদের থেকে চুরি করা জ্ঞানে সম্পূর্ণ মূর্খ ও নিরক্ষর, অসভ্য, লেখাপড়া থেকে দূরে বাসকারী, চতুষ্পদ জন্তুর চরিত্র গ্রহণকারী জাতির একজন নিরক্ষর ব্যক্তি এমন রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং এমন যাদু ভরে দিয়েছেন যে, দশ বছরেরও কম সময়ে—যা কোন জাতির উন্নতির জন্যে যথার্থ সময় নয় এবং দুনিয়ার ইতিহাসে যার কোন উদাহরণ মেলে না, এই বিপথগামী দ্বিধাবিভক্ত জাতিকে, যাদের খৃস্টান ও য়াহুদী কর্তৃক সবচেয়ে হীন জাতি হিসেবে মনে করা হতো এবং অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হতো, তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষকে চরিত্রবান মানুষ এবং চরিত্রবান মানুষকে আল্লাহ্‌র গুণে-গুণান্বিত করে দিয়েছেন, যদিও এর মাঝে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রকট বাধা বিদ্যমান ছিল। একদিকে যেন রক্ত-পিপাসু পশুর দল, সাপ-বিচ্ছু পরস্পরকে দংশনরত দৃষ্টিগোচর হতো এবং পর্দার এ পার্শ্বে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর এদের মাঝে এক আশ্চর্য ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি হতো যা মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি বুঝতে অক্ষম। তাদের অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছিল যে,

এটা কল্পনাও করা যেত না, এর পূর্বে এদের দ্বারা কোন অন্যায় কাজ সম্ভব ছিল।

উপরোল্লিখিত বৈপ্লবিক চিন্তা ও চেতনা আনয়নকারীর পবিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও য়াহূদী [হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী] ও খৃস্টধর্মের প্রবর্তকদের পবিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তির তুলনামূলক আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত ঘটনার আলোকে করা যেতে পারে।

নীচ ও হীনতার অতল গহ্বরে পতিত জাতি, পৃথিবীর ইতিহাসে যাদের উদাহরণ পাওয়া যায় না, এমনি একটি জাতি, এই নিরক্ষর নবীর নেতৃত্ব ও শাসনে শুধু চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নতিই লাভ করেনি বরং পার্থিব জগতের বিদ্যা-বুদ্ধি এবং রাজনীতিতে অতি অল্প সময়েই বিস্ময়কর সফলতা অর্জনও করেছে। আরব লিজান (আসক-ই-আরবীয়া)-এর লেখক গ্লাব পাশার মতে ঐ যুগে পৃথিবীর দু'টি পরাশক্তি রোম ও ইরান সাম্রাজ্য—যা আটশত বছর যাবত পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্যে বদ্ধপরিকর ছিল—মাত্র আট বছরে আরববাসীরা তাদের নির্মূল করে দেয় এবং এ অল্প সময়ে এ দুটো পরাশক্তিকে পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম হয়।

এই নিরক্ষর ব্যক্তি জ্ঞান ও দূরদর্শিতায় শতাব্দীর এক-দশমাংশ (দশ বছর) সময়ে অলৌকিকভাবে এমন কিছু করে দেখিয়েছেন, যার দশমাংশ ঐ শিক্ষা, যা ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানিগণ ইসলামের উৎস বলে দাবি করে—হযরত মূসা (আ.)-এর যুগ থেকে ইসলামের প্রথম যুগ পর্যন্ত দুই হাজার বছরের দীর্ঘ সময়ে কেউ দেখতে পায়নি। এটা সম্রাট আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন ও অন্যান্যদের বিজয়ের মত সফলতা নয়, যেখানে অন্ধকার ও ঘূর্ণাবর্তের আবরণ বিদ্যমান ছিল বরং এটা একটা আলাদা ও স্থায়ী বিপ্লব যা এই নিরক্ষর ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কার্যকর করেছিলেন।

এ সমস্ত বাধা-বিপত্তির দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা ও এর পরিচর্যা সম্পর্কে ইসলামী স্বাস্থ্যনীতি নতুন চিন্তাধারায় উপস্থাপন

করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে ইসলামী বিধান বিষয়ক একটি মূলনীতিও স্মরণ রাখতে হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রসূল উত্তম আদর্শ। 'উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হুযুর (স.)-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'হুযুর (স.)-এর চরিত্র হলো কুরআন।' অর্থাৎ হুযুর (স.)-এর সমস্ত কাজকর্ম পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী ছিল। অন্য কথায়, তিনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রতিকৃতি ছিলেন। সুতরাং কোন বিষয় সম্পর্কে যদি পবিত্র কুরআন বা হুযুর (স.)-এর কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ না থাকে এ বিষয়ে হুযুর (স.)-এর ব্যক্তিগত আমল, আচরণাদি, আদেশ ও নির্দেশের মর্যাদা রাখে এবং তা প্রত্যেক মুসলমানের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

—ফযল করীম ফারানী

সূচীপত্র

১ ॥ বায়ু/১—৫

২ ॥ পানি/৬–৯

৩ ॥ আলো ও আঁধার/১০—১১

৪ ॥ জন্ম/১২—২৫

খত্না/১২ শিশুর কেশ/১৫ শিশুদের নখ/১৫ পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস/১৬ মাতৃদুগ্ধ/১৬

৫ ॥ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও দেহের যত্ন/২৬-৭৬

প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া/২৬ জাগ্রত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত কিছু প্রাথমিক নির্দেশ/২৮ প্রাকৃতিক প্রয়োজন/২৯ ওযূ বা হাত, মুখ ইত্যাদি ধোয়া/৪৩ হাত ধোয়া/৪৪ মুখ, গলদেশ এবং দাঁতের পরিচ্ছন্নতা/৪৫ নাকের পরিচ্ছন্নতা/৪৫ চোখের পরিচ্ছন্নতা/৪৬ কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া/৪৬ মাথা মোসেহ করা/৪৭ পা ধোয়া/৪৮ ওযূর মধ্যে সতর্কতা/৪৯ একটি অমূল্য সম্পদের অপচয়/৫০ স্বাস্থ্যরক্ষার অনুপম নিয়মাবলী/৫২ হীনমন্যতাবোধের একটি ঘটনা/৫৫ দাঁতের যত্ন/৫৬ চোখের যত্ন/৬৫ ব্যায়াম/৬৬ গোসল/৬৯

৬ ॥ ওযূ ও গোসল সম্পর্কে নির্দেশাবলীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা /৭৬—৮১

মহিলাদের প্রকৃতিগত বিপত্তি/৭৮

৭ ।। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা/৮২—১০৫
পানির বিকল্প/৮২ লোম ও নখ/৮৪ পোশাক-পরিচ্ছদ/৯০ পাত্র/৯২ বাড়ীঘর ও 'ইবাদতখানা/৯৩ পানাহার/৯৭ স্বল্পাহার /১০১

৮ ।। আহার সম্পর্কে কয়েকটি উপকারী নির্দেশনা/১০৬—১৩৯
স্বাস্থ্যরক্ষার একটি অতুলনীয় পদ্ধতি/১০৭ পানাহারের নিয়মাবলী/১১০ পানীয় সামগ্রী/১১৪ পানি এবং অন্যান্য পানীয় সামগ্রী সম্পর্কে কতিপয় জরুরী নির্দেশ/১১৬ ফল, শাক-সব্জি ও স্বাস্থ্য/১২০ মাদক দ্রব্য ও স্বাস্থ্য/১২২ বৈরাগ্য এবং স্বাস্থ্য/১৩৭

৯ ।। পাপাচার ও স্বাস্থ্য/১৪০—১৫৪

১০ ।। পর্যটন, ভ্রমণ ও স্বাস্থ্য/১৫৫—১৫৭
নিদ্রা ও স্বাস্থ্য/১৫৬

১১ ।। গৃহে সংঘটিত দুর্ঘটনা এবং নিদ্রা সম্পর্কে কতিপয় উপকারী নির্দেশ/১৫৮—১৬৭
নাগরিক স্বাস্থ্যরক্ষা/১৬২ মৃতদেহ ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা/১৬৫

১২ ।। স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার কতিপয় বিধান/১৬৮—১৭৬
'ইবাদতে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি/১৬৮ আত্মহত্যা/১৭১ উন্মুক্ত অস্ত্র নিয়ে চলা বা এগুলো দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা/১৭১ হাই তোলা, হাঁচি দেওয়া ও অট্টহাসি/১৭৩ জ্বর/১৭৪ রোগীর প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতি/১৭৪ কুষ্ঠরোগ/১৭৫ ক্রোধ/১৭৫ দ্রুত চলা/১৭৬ দাঁত দ্বারা কাটা/১৭৬

১৩ ।। জীব-জন্তুর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা/১৭৭—১৮০

১৪ ।। শেষ কথা/১৮১—১৮২

ইসলামী স্বাস্থ্যনীতি

১

বায়ু

আল্লাহ্ তা'আলা জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, বায়ু এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বায়ুর গুরুত্ব এত বেশী যে, এটা ছাড়া কোন প্রাণী এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারে না। এ জন্যে প্রকৃতি সমগ্র বিশ্বজাহানে জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর তুলনায় প্রতিটি মুহূর্তের জন্যই অনেক বেশী পরিমাণে বায়ু মজুদ রেখেছে। প্রত্যেক প্রাণী প্রয়োজনানুযায়ী বিনাবাধায় সব সময় অতি সহজে এ বায়ু কাজে লাগিয়ে থাকে। পৃথিবীর কোন শক্তিই বায়ুর বিস্তৃতি কিম্বা প্রবাহ কিছুক্ষণের জন্যও থামিয়ে রাখতে পারে না।

কিন্তু জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বায়ু যতটা প্রয়োজন, যদি সে প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তবে সে বায়ু তখন বিনাশ ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর গতিবেগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ঝড়-তুফান সৃষ্টি করে, ধ্বংস টেনে আনে। বায়ুর শান্ত রূপ অথবা এর পরিমিত চলাচল যদি কমে যায়, তখন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা দেখা দেয়। এর মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত আর্দ্রতা বা শুষ্কতা, উষ্ণতা বা কোমলতা বা রুক্ষতা সৃষ্টি হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে বা বালা-মুসীবত, রোগ-ব্যাধি বিস্তারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বায়ুর কারণে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বিস্তার লাভ করে। কোথাও যদি সামান্য সুগন্ধি বা দুর্গন্ধময় দ্রব্য থাকে, বায়ু তা আশেপাশে ছড়িয়ে দেয়। ফলে পরিবেশে হয়ত সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বিরাজ করে। কিন্তু খোলা বাতাসে এর

প্রভাব তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যায়। বাড়ীঘরে, অলি-গলিতে, জনপদে এর প্রতিক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে তা স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর বা ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়।

এ কারণেই বাড়ী-ঘর, অলি-গলি, হাট-বাজার এবং জনপদ খোলামেলা পরিবেশে তৈরি করা স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এগুলো সংকীর্ণ স্থানে তৈরী করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।

ইসলামের প্রথম অবস্থায় পবিত্র কুরআনের সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। এতে মহানবী (স.)-কে হুকুম দেওয়া হয়েছে, 'ওয়াররুজ্‌যা ফাহ্‌জুর' অর্থাৎ সর্বপ্রকার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক। এ আদেশ মহানবী (স.) এর প্রত্যেক অনুসারীর উপরও সমভাবে প্রযোজ্য। এই সাধারণ আদেশের মধ্যে কোন অপবিত্রতা সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে বলা হয় নি। এ আদেশ বায়ু, পানি, খাদ্য, পোশাক, বাড়ী-ঘর, অলি-গলি, জমি-জমা ইত্যাদির উপরও সমভাবে প্রযোজ্য। এটা এমনি একটি মৌলিক নির্দেশ ও কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি, যার পারিপার্শ্বিকতা ইসলামী স্বাস্থ্যবিধির সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বায়ু দূষিত হওয়ার উপরও তা প্রযোজ্য। বাড়ী-ঘর, অলি-গলি ও কৃষি-জমির বায়ু বিশুদ্ধ রাখার জন্য জোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন কি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হওয়াকে মন প্রফুল্ল থাকা ও বৃষ্টির বার্তাবহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উন্মুক্ত বায়ুতে বাসস্থান এবং প্রশস্ত বাগানের কথা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর চিত্র এবং এতে রক্ষিত বিভিন্ন সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধের কথা এমনি চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পাঠমাত্র মানসে এগুলো পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

বৃক্ষলতা, শাক-সব্‌জি ও ফলমূল ইত্যাদি হলো বায়ু বিশুদ্ধ রাখার উপায়। মহানবী (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ নিয়তে কোন ফল বা ছায়াদার বৃক্ষ রোপণ করে যে, এর ফল বা ছায়া দ্বারা মানুষ বা জীবজন্তু উপকৃত হবে—তবে সে অশেষ নেকীর অধিকারী হবে।[১]

১. তাজরীদে বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৮৩১; সংকলন, মৌলবী ফীরুযউদ্দীন এণ্ড সন্স, লাহোর।

যেখানে একটি বৃক্ষ রোপণ করা এরূপ প্রশংসার যোগ্য এবং নেকীর কারণ, সেখানে বাগান তৈরী করা এবং বৃক্ষ রোপণ অভিযান পরিচালনা করা কত বড় সওয়াব ও মানব সেবার কাজ হতে পারে তা অবশ্যই চিন্তনীয়।

মহানবী (স.) মসজিদ ব্যতীত বাগানে নামায পড়া পসন্দ করতেন।[১] এ কারণেই মুসলমানগণ পৃথিবীর বুকে কর্তৃত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথে কৃষিকার্য, বন বিভাগ এবং উদ্যান উন্নয়নের জন্য সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেন। তাঁরা উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে এরূপ বহু দেশে—যেখানে এগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল অথবা এগুলোর নাম বলতেও কিছু ছিল না, যেমন—স্পেন, ভারত ও আফ্রিকার উপকূলীয় দেশগুলোতে চাষাবাদের উৎকর্ষ সাধন করেন। ঐ সব দেশের ভূমির রূপ পাল্টিয়ে দিয়ে তাঁরা পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে দেন। বর্তমান যুগের কৃষি ও বন বিভাগের উন্নতি তৎকালীন মুসলমানদের আপ্রাণ চেষ্টারই ফলশ্রুতি।

সুগন্ধি বায়ু বিশুদ্ধ করার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে। হযরত রসূলে করীম (স.) বলেছেন, 'তিনটি বস্তু আমার অতি প্রিয়। নামায, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং সুগন্ধি।'[২] মসজিদ এবং জনসমাগমে সুগন্ধি ছড়াবার জন্য হুযুর (স.) নির্দেশ দিতেন।

মুসলমান শাসনামলের পূর্বে বিরাট ও উঁচু ইমারত নির্মাণ করা হতো কিন্তু এগুলোর মধ্যে আলো-বাতাস চলাচলের প্রতি তেমন খেয়াল রাখা হতো না। মুসলিম শাসনামলে উন্মুক্ত বায়ুতে বিরাট ও প্রশস্ত দালান নির্মাণ করা শুরু হয়। এটা বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে, ইসলামের ইবাদত পদ্ধতি ও অনাড়ম্বরতা মুসলমানদের উন্মুক্ত বায়ুতে ইমারত নির্মাণে উৎসাহিত করে। বর্তমান দুনিয়াতে প্রাসাদ নির্মাণের চরম উন্নতির যুগেও অন্যান্য ধর্মের উপাসনা গৃহ মুসলমানদের মসজিদের মত আলো-বাতাস চলাচলের উপযোগী করে নির্মাণ করা হয় না।

এখনো হিন্দু ও বৌদ্ধদের মন্দির পারসিকদের অগ্নি উপাসনালয় আতশ্‌কদা প্রভৃতি সংকীর্ণ ও অন্ধকারময় করে নির্মাণ করা হয়। পাশ্চাত্যের

---

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৮৩, প্রকাশক, হামিদীয়া প্রেস, দিল্লী।
২. মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪৯৪৩, প্রকাশক হামিদীয়া প্রেস, দিল্লী।

গির্জাগুলো যদিও চাকচিক্যমণ্ডিত এবং উন্মুক্ত বায়ুতে নির্মাণ করা হয় কিন্তু উপাসনাকারীদের সংখ্যানুপাতে মসজিদের তুলনায় এগুলো সংকীর্ণ করেই নির্মাণ করা হয়।

নিঃসন্দেহে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর উপাসনাগৃহ মসজিদের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তাতে সুগন্ধি ছড়াবার প্রচলন আছে। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে প্রশস্ততা এবং উন্মুক্ত বায়ু নিয়ে।

হযরত রসূলুল্লাহ (স.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা খাস ও বিশেষ সম্মান দ্বারা সমস্ত নবীদের মধ্যে সম্মানিত করেন। এর জন্য তিনি গৌরবও করতেন। তা হলো, 'আমার জন্য সমগ্র ভূমি 'ইবাদতের জায়গা হিসেবে স্থির করা হয়েছে। যেখানেই কোন মুসলমানের নামাযের সময় হবে সেখানেই নামায আদায় করবে।'[১] এ কারণেই কার্পেট, বিছানা ও আলো ইত্যাদি ছেড়ে উন্মুক্ত ব্যয়ুতেও মুসলমানদেরকে নামায আদায় করতে দেখা যায়।

মসজিদে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে কাতার করা, কাতারের মাঝে সিজদা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি নামাযের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং এগুলোর জন্যই মসজিদের ইমারত প্রশস্ত ও উন্মুক্ত বায়ুতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মসজিদের আঙ্গিনা এরূপ উন্মুক্ত হওয়া চাই, যাতে প্রয়োজনানুযায়ী ইবাদতকারী সহজেই উন্মুক্ত বায়ুতে নামায আদায় করতে পারে। সাধারণত তাই মসজিদের আঙ্গিনা মূল ইমারতের চেয়ে প্রশস্ত রাখা হয়।

ইমারতের অভ্যন্তরভাগে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে বিছানোর কোন কিছু থাকলে তা একেবারে সাদামাটা প্রকৃতিরই হয়ে থাকে যাতে অতি সহজেই তা বাইরের আঙ্গিনায় এনে বিছানো যায়। বাইরের আঙ্গিনায় নিয়ে আসতে অসুবিধা হলে মাটির আঙ্গিনার উপরেই নামায আদায় করা যেতে পারে।

এর তুলনায় অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়গুলোর আঙ্গিনা অথবা খোলা-মেলা জায়গায় উপাসনা করার কোন প্রশ্নই আসে না। উপাদান-উপকরণাদি—

১. তাজরীদে বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল তায়াম্মুম, হাদীস নং ২০৩।

যথা, স্থাপিত প্রতিমা, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড, গান-বাজনার উপকরণাদি, বিছানা, চেয়ার, প্রদীপ তথা অন্যান্য জরুরী সামগ্রী বাইরে নিয়ে আসা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। এগুলোর অবর্তমানে তাদের উপাসনাই সম্ভবপর হয় না।

মসজিদের উপরিউক্ত বর্ণনায় ইমারতের মধ্যে মুসলমানদের দৈনিক পাঁচবার যাতায়াত তাঁদের আবাসকেও তদনুরূপ করার অনুপ্রেরণা প্রদান করে। তাঁরা তাঁদের নতুন বিজিত দেশসমূহে এ ধরনের ইমারতাদি নির্মাণকে বিকশিত করে আধুনিক যুগের স্থাপত্য শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

সমাবেশ ও সভা-অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বায়ু প্রবাহ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার ও সুগন্ধি প্রজ্বলনের জন্যে হযরত রসূলে-করীম (স.) তাগিদ প্রদান করেছেন এবং এতদ্বিষয়ক কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। পরবর্তী সময়ে এগুলো উল্লেখ হবে। অলি-গলি-সড়ক ও চলার পথ এবং বিশ্রামস্থলের বায়ুর নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্যে এরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে, তা পালন করলে এ সমস্ত স্থানের বায়ু বিশুদ্ধ থাকবে। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন রাস্তা-ঘাটে কিম্বা মানুষ বা জীবজন্তু বিশ্রাম নেয় এরূপ বৃক্ষের ছায়ায় কোন পায়খানা-প্রস্রাব করে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত হয়।'[১] মলমূত্র ত্যাগই যদি এত অপসন্দনীয় হয়, তা হলে ঐরূপ স্থানের নিকটে ও আশেপাশে মলমূত্র ও আবর্জনার স্তূপ জমা করা কত জঘন্য ও নিন্দনীয় বিষয় হতে পারে তা সহজে অনুমেয়। মোটকথা, এই বিধি-বিধান ও নির্দেশনা এবং কুরআনুল করীমে উল্লিখিত সঞ্জীবিত বায়ু প্রবাহে আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে, ইসলামী শিক্ষায় খোলামেলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বায়ু প্রবাহকে কি পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

---

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩০৪।

২

পানি

আল্লাহ্ তা'আলা জীবজন্তু ও তরুলতার জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বায়ুর পরে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হিসেবে পানি সৃষ্টি করেছেন। এর স্বল্পতা ও আধিক্য জীবজন্তুর স্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এমনকি এদের খাদ্য উৎপাদন হওয়ার উপরও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কোন এলাকায় এর স্বল্পতা বা আধিক্য দুর্ভিক্ষ, জীবজন্তুর মড়ক ও গাছপালার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পানির গুরুত্ব অতি সংক্ষেপে অথচ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের দ্বারা এমনিভাবে বর্ণনা করেছেনঃ 'ওয়া জা'আল্না মিনাল মায়ে কুল্লা শাইইন্ হাইউন'—অর্থাৎ পানি দ্বারা আমরা সমস্ত বস্তুর জীবন দান করেছি। যে বায়ু ছাড়া মুহূর্তও বাঁচা যায় না, যদি প্রয়োজনানুযায়ী সে বায়ুতে পানির আর্দ্রতা বা পরিমিত পরিমাণে বাষ্প মজুদ না থাকে, তাহলে তাও বিষাক্ত হয়ে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বায়ু এবং উষ্ণতা কোন বস্তু পরিষ্কার করতে বা ময়লা ও অপবিত্রতা দূরীভূত করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া খুব ধীরে হয় এবং এ কাজে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে পানির প্রতিক্রিয়া খুব দ্রুত প্রকাশ পায় এবং নোংরা বস্তুকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র করে—যা বায়ু ও উষ্ণতা কয়েক মাসেও করতে পারে না।

আগুন পানির চেয়ে দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করতে পারে, কিন্তু ঐ বস্তুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে অথবা পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য দুনিয়ার অন্য কোন বস্তুই পানির মতো এত সহজলভ্য, প্রতিক্রিয়াহীন ও অক্ষতিকর নেই। পানি নিজে পবিত্র এবং অন্য বস্তুকে পবিত্র করার মত আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট দান বিশেষ। স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য পানি যেমনি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান, তেমনি যদি ঐ পানি অপবিত্র ও কদর্য হয়ে যায়, তবে তা ভীষণ ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষা, পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য পানি পবিত্র ও নির্মল হওয়া একান্ত আবশ্যক। মানবজাতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সমস্ত ব্যবহারিক বস্তুর মধ্যে পানি পবিত্র হওয়ার উপর বেশীর ভাগ নির্ভর করে।

পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় পবিত্র ও সুমিষ্ট পানির ফোয়ারা ও কূপ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনিভাবে তা অপবিত্র, দুর্গন্ধ ও কদর্য হওয়ার বর্ণনাও করা হয়েছে। নির্মল পানি ব্যবহার করার এবং অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় পানি ব্যবহার থেকে দূরে থাকারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআনে এই পানির এত বেশী প্রশংসা করা হয়েছে যা বৃষ্টিরূপে সব দূষিত বস্তু থেকে পরিষ্কার হয়ে আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং মৃতপ্রায় জমি, তরুলতার জীবন দান করে।

ইসলামী শাস্ত্রে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অধিকাংশই পানির সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং এ শাস্ত্রে যদি পানির পবিত্রতা ও গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা না থাকে, তাহলে এ নির্দেশ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু ইসলামে এ সম্পর্কে একটি বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। ইসলামী শরীয়তে পানির পবিত্রতা সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম হলো, পানির মধ্যে কোন ময়লা পতিত হলে যদি এর রং, গন্ধ ও স্বাদের পরিবর্তন হয় তাহলে ঐ পানি অপবিত্র বলে গণ্য হবে।[১] ইসলামী শরীয়তে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কতটুকু পানির মধ্যে কতটুকু নাপাকী বা নোংরা বস্তু পতিত হলে তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। তা হলো দহ্ দর্ দহ্ দর্ দহ্ হওয়া অর্থাৎ দশ হাত লম্বা, দশ হাত চওড়া, দশ হাত গভীর অথবা এক হাজার

১. তাজরীদে বুখারী, কিতাবুল উযূ, হাদীস নং ২৩২।

ঘন (মকউব) হাত পানির মধ্যে কোন সাধারণ-নোংরা বস্তু পতিত হলে এর রং, গন্ধ এবং স্বাদ পরিবর্তন না হয় তবে উহা অপবিত্র বলে গণ্য হবে না।

এইসব বিষয়ে ফকীহদের মধ্যকার ছোট ছোট মতানৈক্য প্রমাণ করে যে, ইসলামী শিক্ষায় পানির পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা কত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে পানি বিষয়ক সমস্যা স্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক সমস্যা।

স্বাস্থ্যরক্ষার বিধির মধ্যে এটাও স্মরণযোগ্য যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানির স্বল্পতা ও আধিক্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রতার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু উন্নত দেশে, বড় বড় শহর ও মহল্লায় সাধারণত পানির স্বল্পতার কোন প্রশ্নই উঠে না, এরা পৃথিবীর ৭৫-/- -এর আবাদী এলাকার অন্তর্ভুক্ত। যারা জঙ্গল, মাঠ এবং অনাবাদী গ্রামে বাস করে, তারা কষ্ট ও বিপদকে না দেখার ভান করে এটাও নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার চেষ্টা করে যে, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পানির ঐ পরিমাণ পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন মনে করে, যা নিজের জন্য পসন্দ করে। অথচ পৃথিবীর অনেক এলাকায় পানি কয়েক মাইল দূরে থেকে মাথায় বা পশুর দ্বারা বহন করে সরবরাহ করতে হয়। কোন কোন সময় ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের পানাহারের জন্য কিছুই মেলে না। তাদের পক্ষে দৈনিক কয়েক মণ পানি হাউজের মধ্যে ভরে গোসলের ব্যবস্থা করা অথবা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এত অধিক পরিমাণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পানি ব্যবহার করার কথা চিন্তা করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই হবে না।

প্রত্যেক অঞ্চলে মানবজাতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং পানির স্বল্পতা এবং আধিক্য অনুসারে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তা বণ্টন করে দিয়েছেন। এর মধ্যে এরূপ নমনীয়তা রেখেছেন যার ফলে এগুলো সংগ্রহ করতে কারো কষ্ট হয় না। এর দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার সব চাহিদাও পূর্ণ হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পানি জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশাবলী পরবর্তীতে বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ্; তবে তা পবিত্র রাখা সম্পর্কে এখানে একটি নির্দেশ বর্ণনা করা হলো। হুযূর (স.) পানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'খোলা ও আবদ্ধ পানি—যা গোসল,

ধৌত করা ও পান করার কাজে ব্যবহার করা হয়, এরূপ পানিতে কোন নোংরা বস্তু ফেলবে না বা প্রস্রাব করবে না।'[১]

'যে কূপ বহু বৎসর যাবত অকেজো হয়ে পড়ে আছে, তার পানি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'[২] এরূপ কূপ থেকে বিষাক্ত গ্যাস বের হয়, যার ফলে ঐ কূপ ব্যবহারকারীরা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

১. তাজরীদে বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল উযু, হাদীস নং ১৬৭।
২. তাজরীদে বুখারী, ২য় খণ্ড, বাদউল খালক, হাদীস নং ২৪৪।

৩

আলো ও আঁধার

আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আলো অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আলো ছাড়া মানুষকে নানা কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। ক্রমাগত আলো থেকে দূরে থাকা চোখের জ্যোতি নষ্ট করে অথবা অপূরণীয় ক্ষতি করে, এর দ্বারা স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চীন দেশে কোন কোন সাধু জীবন্ত অবস্থায় কবরবাসী হয়। আলো ও খাবার পৌঁছবার জন্য কবরের উপর একটি ছিদ্র রেখে দেওয়া হয়। এমনিভাবে সে জীবন অতিবাহিত করে। যদি কেউ অসহ্য হয়ে এ জীবন যাপন ছেড়ে দেয় এবং কবর থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে সে অর্ধমৃত হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু তো বটেই, এমনকি ছোট ছোট চারাগাছ—যেগুলো কোন প্রকান্ড বৃক্ষের নীচে গজায়, পরিমিত আলো ও রৌদ্রের অভাবে তা সঠিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে মানুষের শারীরিক ও আত্মিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আলো অতীব প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আঁধারের ক্ষতিকর দিকও বর্ণনা করা হয়েছে। আলো ও আঁধার সমান নয়। এর বাস্তবতা বোঝাবার জন্য কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ প্রসঙ্গে বর্ণনা এসেছে। এমনকি আলো সম্পর্কে চল্লিশের চেয়ে বেশী জায়গায় এবং আঁধার সম্পর্কে কুড়ির চেয়ে বেশী জায়গায় বর্ণনা এসেছে। সূরায়ে নূর-এর পঞ্চম রুকুতে চমৎকার উদাহরণের দ্বারা আলোর উপকারিতা ও আঁধারের অপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। কোন

বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি এ আয়াতগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে আলোর প্রতি তার আকর্ষণ বেড়ে যাবে এবং আঁধার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে। ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি মতে মানবজাতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আলো কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তা এ বর্ণনা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, পবিত্র কুরআন নীতিগতভাবে যে কোন বস্তু বা যে কোন কর্মের ভাল ও মন্দ উভয় দিকই বর্ণনা করে এটা গ্রহণ ও বর্জন করার জন্য মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও বিবেক সেটাই গ্রহণ করে, যা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর এবং উপকারী। যেমনঃ শরাব ও জুয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, 'এ দুটোর মধ্যে উপকারিতার চেয়ে অপকারিতাই বেশী।'[১]

এমনিভাবে আঁধারের ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করার সাথে সাথে কুরআন শরীফে এর উপকারিতাও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনঃ রাত প্রকৃতপক্ষে আঁধার। কিন্তু এতে মানবজাতির জন্য বিশ্রাম ও পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছে[২] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দিনের আলো স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেমনি অতীব প্রয়োজনীয়, তেমনি রাতের আঁধারও স্বাস্থ্যের জন্য পরম উপকারী। সারা দিনের কাজকর্মের দ্বারা শারীরিক শক্তির যে ক্ষয় হয়, যদি বিশ্রামের দ্বারা এটা পূর্ণ না করা হয় তবে কিছুদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। ভবিষ্যতে জীবিকার্জনের জন্য কোন কাজকর্ম করার ক্ষমতা থাকবে না। বস্তুতপক্ষে পূর্ণ বিশ্রাম মানুষ রাতেই উপভোগ করে থাকে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যে কোন অন্ধকারের বিপদ ও অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকা এবং আলো থেকে উপকারিতা লাভ সম্পর্কে অসংখ্য দু'আ রয়েছে।

---

১. সূরা বাকারা ঃ ২৭ রুকূ।

২. সূরা নমল ঃ ৭ রুকূ; সূরা নাবা ঃ ১ রুকূ।

৪

জন্ম

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট জীবনের তিনটি প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখন স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি বর্ণনা করা হবে যা মানবজাতির জীবনের বিভিন্ন অংশের সাথে সম্পৃক্ত। অতঃপর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইসলাম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত বিধান পেশ করেছে, এগুলোর কৌশল ও দর্শন বর্ণনা করা হবে।

মানবজাতি যদিও সৃষ্টির সেরা, কিন্তু জন্মগ্রহণের সময় অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে এদের বেশী পরনির্ভরশীল হতে হয়। জন্মের সময় কোন কোন ব্যাপারে যদি সতর্কতা অবলম্বন না করা হয় তবে তার স্বাস্থ্যের উপর এমন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যা তাকে সারা জীবন ভোগ করতে হয়। তাছাড়া শিশুরাই হবে জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার ও নেতা। তাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় ব্যাপার। সুতরাং শিশুদের জন্ম ও জন্মের পর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইসলাম যে সমস্ত বিধান দিয়েছে তা বর্ণনা করা প্রয়োজন।[১]

খত্না

শিশু ও প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক জাতির কতকগুলো স্বাস্থ্যবিধি প্রচলিত আছে। পারিপার্শ্বিকতা ও

১. জন্ম, খত্না, নখ কাটা, লোম মুড়িয়ে ফেলা ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশাবলী হাদীস এবং ফিকহ্ গ্রন্থে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। চৌদ্দশত বছর ধরে মুসলিমগণ এ সকল নিয়ম পালন করে আসছে।

প্রয়োজনানুযায়ী সকলেই ঐ সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি গ্রহণ করে থাকে। নাভীরজ্জু কাটার পর নবজাতককে গোসল দেওয়া ইত্যাদি এরূপ কাজ যা সারা দুনিয়ায় প্রচলিত। কিন্তু খত্‌নার প্রচলন শুধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর ও অনুসারীদের মধ্যে দেখা যায়। তারা এটাকে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করে। খৃস্টানরা এটা ছেড়ে দিলেও মুসলমান ও ইয়াহুদীরা এটা যথাযথভাবে পালন করে আসছে।

পাশ্চাত্যের কোন কোন খৃস্টানের মতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পূর্বেও পৃথিবীতে এটা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাওরাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে আশি বৎসর বয়সে নিজে খত্‌না নেন এবং বংশের সমস্ত পুরুষ, এমনকি গোলামদেরও খত্‌না করান।[১] ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে প্রচলন করবেন বলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যে সমস্ত অঙ্গীকার করেছিলেন, এটা ঐগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি। ঐ অঙ্গীকার অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের অষ্টম দিনে তাঁকে খত্‌না করানো হয়।[২] ঐ বিধান পালনকারী খৃস্টানগণ পলুস নামক এক ব্যক্তির বর্ণনানুযায়ী বলেন যে, ঐ শরীয়ত অভিশপ্ত এবং ঐ অঙ্গীকার ও শর্ত বহু পুরানো। তাই খৃস্টানদের জন্য এটা পালন করা নিষ্প্রয়োজন।[৩] সুতরাং তারা যে এই উপকারী পদ্ধতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে তাই নয়; বরং তারা এটা সম্পর্কে এরূপ ঘৃণাভাব পোষণ করে যে, তাদের নাট্যকারগণ এটা নিয়ে ঠাট্টাও করেছে। সুতরাং শেক্সপিয়র তাঁর নাটক ওথেলো'র নায়কের আত্মহত্যার বর্ণনা প্রদান করে লিখেছেন যে, নায়ক নিজের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে চীৎকার দিয়ে বলেছিল, 'আমি খত্‌না করানো কুকুরের পেট কেটে দিয়েছি।'

পাশ্চাত্যের চিকিৎসকগণ খত্‌নার গুরুত্ব ও উপকারিতা ভালভাবে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু খৃস্টান জগত এটা অপসন্দ করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে এর প্রচলন করা অথবা এর উপকারিতা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হতে বিরত থাকে। কোন কোন রোগ এরূপ আছে, খতনা করানো

১. পয়দায়েশ, পৃ. ১৭, ১২, ১।
২. লুক পৃ. ২, ২১।
৩. আমাল পৃ. ১৫, ২৯, ৩৮; গীতিউন পৃ. ৩, ১০, ১৩।

ছাড়া যার অন্য কোন চিকিৎসা নেই। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়েই তারা এটা গ্রহণ করে থাকে।

বর্তমান যুগে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী কোন কোন রোগে রোগীর দেহে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবেশ করানো খুব উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু রোগীর দেহ হতে কোন রোগে অথবা যে কোন অবস্থায় হোক শিঙ্গা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করা ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়। তবে বর্তমান যুগের চিকিৎসকদের কেউ কেউ না মানলেও এ ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। তা হলো, কোন কোন রোগে ইউনানী চিকিৎসা অনুযায়ী রোগীর দেহের নির্দিষ্ট অংশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে রক্ত বের করে দেওয়া অত্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। খতনা করানোর নির্দেশ এ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অংশবিশেষ। এভাবে রক্ত প্রবাহিত করা শিশু স্বাস্থ্যের উপর অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং বহু মারাত্মক রোগের প্রতিষেধকরূপে কাজ করে থাকে।

যে জাতির মধ্যে এটার প্রচলন নেই, তাদের মায়েদের খুব সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয়। শিশুদের এ চামড়াটুকু যদি কাটা না হয়, তা হলে এর ভিতর প্রস্রাব ও ঘাম থেকে ময়লা জমে। কোন কোন সময় এতে জ্বালা-যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। এমনকি কীট ডিম ও বাচ্চা পর্যন্ত জন্ম দেয়। এর ফলে শিশুর মস্তিষ্ক এবং প্রাপ্ত বয়স্কে যৌন ক্ষমতায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

কোন কোন চিকিৎসকের মতে যদি শিশুদের খত্না করানো না হয় তাহলে সে মৃগী রোগে মাঝে মাঝে মারাত্মকভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন তাকে খত্না করানো হলে সে শীঘ্র রোগমুক্ত হতে পারে। খত্না না করানো শিশুদের জন্য এর চেয়ে উত্তম অন্য কোন চিকিৎসা নেই। এ চামড়াটুকু বর্তমান থাকলে শরীরের এ অংশটি অত্যন্ত অনুভূতিপরায়ণ হয়ে থাকে, যার প্রভাব বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর অনুভূত হয়। এটা কেটে ফেললে কোমলতা এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি হ্রাস পায়। খত্না না করানো কোন কোন পুরুষের সন্তান হয় না অথবা অল্প বয়সেই সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থায় চিকিৎসকগণ খত্না করানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সন্তানহীনতার এটা একটা মোক্ষম ও ফলপ্রদ চিকিৎসা।

জন্মের সাত-আট দিনের মধ্যে শিশুর খত্না করানো উত্তম। এটাই ঈসায়ী ও ইসলামী শরীয়তের বিধান। এ বয়সে খুব শীঘ্র যখম শুকিয়ে যায়। কিন্তু শিশু একটু বড় হলে বেশী করে হাত-পা নড়াচড়া করে, ফলে যখম বা কাটা ঘা শীঘ্র শুকাতে দেয় না। একটু বয়স হ'লে এটা কাটতে বেশ কষ্টও হয়। বেশী বিলম্ব করা হলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, যেটা অনেক সময় মারাত্মক অবস্থা ধারণ করে।

শিশুর কেশ

পৃথিবীর প্রায় সব জাতিই নবজাত শিশুর মাথার কেশ মুণ্ডন করে ফেলে। কিন্তু এমন এক জাতিও আছে যারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শরীরের কোন কেশ কাটা বা ফেলে দেওয়া ধর্মীয় বিধানের বিরোধী বলে মনে করে। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী কেশের হ্রাস-বৃদ্ধিতে তারা কোন হস্তক্ষেপ করতো না। নিয়মানুযায়ী কেশ পরিষ্কার না করার ফলে তাদের কেশ হতে এক বিশেষ ধরনের দুর্গন্ধ বের হয়।

হিন্দুদের মধ্যে নবজাত শিশুর কেশ খুব ধুমধাম করে মুণ্ডন করা হয়। কেউ কেউ অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে এটা স্থগিতও রাখে। এর ফলে তাদের মাথায় বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। প্রথমত শিশুর কেশ খুব নরম ও দুর্বল থাকে। কেউ এরূপ শিশুর কেশ ধরে টান দিলে তার সবগুলোই উঠে আসে।

ইয়াহুদী ধর্মের মত ইসলামী শরীয়তে জন্মের অষ্টম দিনে খত্না করানোর সাথে সাথে মাথা মুড়ানোর নির্দেশনা রয়েছে। এভাবে নবজাত শিশুর মাথা থেকে গর্ভজাত যাবতীয় নোংরা, ময়লা বস্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। এছাড়া নতুন গজানো কেশ খুব শক্ত হয়। মাথার লোমকূপগুলো উন্মুক্ত হওয়ার ফলে তাপ বের হয়ে যায়। প্রথমত শিশুর কাঁধ খুব দুর্বল ও নরম হয়। কাজেই কিছুদিনের জন্য তাকে পরনির্ভরশীল হতে হয়। মাথার কেশ মুন্ডানোর ফলে কাঁধ খুব শক্তিশালী হয়। পাহ্লোয়ান ও বীরপুরুষদের কাঁধ শক্তিশালী হওয়ার এটাই একটা কারণ যে তারা সাধারণত প্রায়ই মাথার কেশ মুড়িয়ে ফেলে।

শিশুদের নখ

স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ইসলাম নখ কর্তন করা

অপরিহর্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। তাই মাঝে মাঝে শিশুদের নখ কর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। শরীরের অন্যান্য অংশ যেমনিভাবে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, নখও তেমনিভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ময়লা জমে। শিশুরা ময়লাযুক্ত নখ সহ হাত মুখে দেয়। ফলে রোগ জীবাণু মুখে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময়ে শিশুরা বড় নখ দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল, চক্ষু ও শরীরে ক্ষত করে ফেলে। এমনকি শিশুর বড় নখের আক্রমণ থেকে তার মা-ও রক্ষা পায় না।

পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস

ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে যদি মা ভাল জ্ঞান রাখেন এবং প্রথম হতে শিশুদের ঐ বিধি অনুযায়ী লালন-পালন করেন, তাহলে কাঠামো বা ভিত্তি উত্তম হওয়ার ফলে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসে পরিণত হবে।

এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, শিশুকালে ভাল অথবা মন্দ যা অভ্যাস করানো হবে সারা জীবনেও ঐ অভ্যাস দূরীভূত হবে না। সময়মত শিশুকে দুধ পান করানো হলে তার স্বাস্থ্যের উপকার হবে। এমনকি এর দ্বারা সময়ের প্রতি তার নিষ্ঠার অভ্যাসও গড়ে উঠবে।

বিছানায় উপর পায়খানা-প্রস্রাব করা হতে শিশুকে বিরত রাখতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে পায়খানা-প্রস্রাব করানোর অভ্যাস করাতে হবে। প্রয়োজনানুযায়ী ঠাণ্ডা বা গরম পানি দ্বারা পায়খানা-প্রস্রাবের পর পরিষ্কার করতে হবে। ফলে ভবিষ্যতে সে সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং অনেক শিশুরোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। আমি নিজে ঘরে এটা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং অত্যন্ত উপকার পেয়েছি। মহানবী (স,) বলেছেন, শিশু সঠিক ও উত্তম স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে।'[১] মূলত এই হাদীসে শিশুকালীন লালন-পালনের গুরুত্বই বর্ণনা করা হয়েছে।

মাতৃদুগ্ধ

মাতৃজঠর এবং দুগ্ধপানের মধ্যে মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, দুর্বলতা অথবা অসুস্থতার ভিত্তি নিহিত। শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১।

গুরুত্বপূর্ণ হলো খাদ্য। এ ব্যাপারে উদাসীন হলে সারা জীবন এর প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হবে।

কোন কোন জীবজন্তু ছাড়া মানব শিশুরা জন্মের সময় সবচেয়ে বেশী দুর্বল হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাছাড়া জন্মের পর থেকে এই দুর্বলতা এত দীর্ঘস্থায়ী হয় যা অন্য কোন জীবজন্তুর জন্মের পর হয় না। এ দীর্ঘ সময়ে এরূপ খাদ্য দেওয়া চাই যা শিশুদের দুর্বলতা অনুযায়ী প্রকৃত পরিমিত পরিমাণে নির্ধারণ করেছে। তার খাদ্য এতো অনায়াসভোজ্য হওয়া চাই যা সে দুর্বলতা সত্ত্বেও সহজেই গ্রহণ করতে পারে; বরং এটাও বলা যায় যে, শিশুদের চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের হাতের কাছেই খাদ্য জমা রাখা প্রয়োজন।

দুর্বল ও সবলের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দুধ সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর, বলকারক এবং উপকারী, দ্রুত হজম ও বলবর্ধক হিসেবে তৈরী করেছেন। এর মধ্যে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ নেই যে, সমস্ত দুগ্ধপোষ্য জীবজন্তুর দুধে রয়েছে এদের শিশুদের লালন-পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ ও ভিটামিন। শিশুকালে মাতৃ দুগ্ধের চেয়ে বেশী উত্তম, পুষ্টিকর খাদ্য অন্য কিছু নেই। ভেড়া-বকরীর বাচ্চার জন্য গাভী বা মহিষের দুধে ঐ খাদ্যপ্রাণ থাকে না যা ভেড়া-বকরীর দুধে বিদ্যমান।

এমনিভাবে মানব শিশুর জন্য তার মায়ের দুধে যে পরিমিত পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ, শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব বিদ্যমান থাকে তা অন্য কোন দুধে, এমনকি অন্য কোন মহিলার দুগ্ধেও পাওয়া যায় না। হাজার চেষ্টা, অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা অন্য প্রাণীর দুধের সাথে পানি ও ঔষধ মিশ্রিত করা হলে মায়ের দুধের মতই হবে এ ধারণা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। যদি এটা সম্ভব হতো তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা মাতৃস্তনে দুধ সৃষ্টি করতেন, না; বরং যে সমস্ত পাখী ডিম পাড়ে, তাদের মতো মায়ের দেহ ছাড়া অন্য কোথাও খাদ্যের সংস্থান করতেন। মায়ের দেহের সাথে খাদ্যের ব্যবস্থা এটাই প্রমাণ করে যে, এ ছাড়া শিশুর জন্য উত্তম ও উপযোগী দুনিয়ার আর কোন খাদ্য নেই।

মায়ের দেহ, হাড়, গোশ্ত ও রক্ত থেকে শিশুর জন্ম। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে মায়ের দেহের অভ্যন্তরেই প্রাকৃতিক

নিয়মে রক্ত প্রক্রিয়াজাত ও পরিশোধিত হয়ে দুধে পরিবর্তিত হয়। শিশুর জন্মের পর ডাক্তারী মতে মায়ের দুধই সবচেয়ে উপকারী ও উত্তম। অন্য কোন মহিলার চেয়ে মায়ের দুধ সবচেয়ে উত্তম। অবশ্য যদি কোন রোগের কারণে মায়ের দুধ দূষিত না হয়।

দুধ সমস্ত খাদ্য থেকে উত্তম, হালকা ও মোলায়েম এবং খুব শীঘ্র এর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ কোন বস্তু দুধের নিকট রাখলে খুব শীঘ্র তাতে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যাদের ঘ্রাণশক্তি বেশী, এরূপ কোন কোন ব্যক্তি গাভী বা মহিষের দুধ পান করার পর এর ঘ্রাণ দ্বারা বলতে পারে গাভী বা মহিষ কি ঘাস খেয়েছে।

অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যবিদগণ বলেন, স্তন থেকে দুধ বের হওয়ার সাথে সাথে বাহ্যিক আবহাওয়ার ফলে তাতে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অল্প সময়ের মধ্যে এতে এক ঘন ইঞ্চিতে প্রায় ছয় লাখ জীবাণুর সৃষ্টি হয়। গরম করার ফলে এ সমস্তই ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু ঠাণ্ডা হওয়ার সাথে সাথে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি হয়।

একবার বোম্বাই বাজারে দুধ পরীক্ষা করা হলো। তাতে এমন জীবাণু পাওয়া গেলো যা তথাকার পচা ডোবার পানির মধ্যে পাওয়া যায়। এ হলো বড় বড় শহরে পাওয়া দুধের অবস্থা!

দুধের উৎকৃষ্টতা, স্বাদ ও উত্তম খাদ্য হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে বিবৃত রয়েছে। বাহ্যিক আবহাওয়ার দ্বারা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে মহানবী (স.) অবগত ছিলেন। একবার একটি খোলা পাত্রে তাঁর নিকট দুধ আনা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "একটি কাঠের টুকরা দিয়ে হলেও দুধ ঢেকে আনা হোক।"[১]

স্তন থেকে দুধ বের করার সাথে সাথে এতে বাইরের আলো-হাওয়ার প্রভাব পড়ে। তাই স্তনের ও বাইরের দুধে পার্থক্য থাকে। সুতরাং ডাক্তারী মতে ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি অনুযায়ী জানোয়ারের স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করা বেশী ফলদায়ক ও উত্তম। এতে বাইরের ধূলিকণা ও জীবাণু থেকে মুক্ত থাকা যায়। পাঞ্জাব ও অন্যান্য অঞ্চলে গাভী ও মহিষের দুধ এমনিভাবে পান করার প্রচলন আছে। এভাবে দুধ পানকারী

১. তাজরীদে বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবাহ্, হাদীস নং ৭৫৯।

সুস্থ ও সবল হয়। শারীরিক দুর্বলতা ও কোন কোন রোগের চিকিৎসা গ্রামে এভাবে দুধ পানের দ্বারা করা হয়ে থাকে। ডাক্তারী বইয়ে যক্ষ্মা রোগ মহিষের স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করার মধ্যে উপশম রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাইরের আলো-বায়ুতে পরিপূর্ণ পশুর দুধের চেয়ে মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করা মানব শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী ও বলকারক। ডাক্তারী পরীক্ষা অনুযায়ী মানুষের দুধের সাথে গাধার দুধের অনেকটা সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শিশুর অতি নিকটেই তার জন্য উত্তম ও উপাদেয় দুধের ফোয়ারা প্রবাহিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ প্রদত্ত এ উৎকৃষ্ট দান ফেলে রেখে বিনা প্রয়োজনে এর চেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্বেষণ করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আজকাল ব্যবসার উদ্দেশ্যে বেশ প্রশংসা সহকারে শিশুখাদ্য হিসেবে টিনের পাত্র ভর্তি গুঁড়া দুধ বাজারে ছাড়া হয়। বলা হয়ে থাকে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় নিয়মাবলী সামনে রেখে এটা তৈরি করা হয়েছে। সে যাই হোক না কেন, আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাইরের অবস্থা উপলব্ধি করে এর উপর কতটুকু আস্থা রাখতে পারি তা সহজেই অনুমেয়।

ইউরোপীয় ও তাদের সমাজ-সভ্যতার অনুসারী এশিয়া ও আফ্রিকার লোকেরা টাটকা বা নির্মল দুধ ও মুখ বন্ধ পাত্রের দুধের মধ্যে বিরাট পার্থক্য মনে করে। এমনিভাবে টিন ভর্তি মাছ ও ফলের প্রশংসা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে—যেখানে এগুলো সহজেই টাটকা অবস্থায় পাওয়া যায়, সেখানে পাত্র ভর্তিগুলো পসন্দ করা হয় না। এরূপ মাছ বা গোশ্ত যখন খাবার টেবিলে বা দস্তরখানে পরিবেশন করা হয় তখন কোন কোন লোকের মন এগুলো গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। এগুলোর মধ্যে এরূপ একটি দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, যা আমরা সহ্য করতে পারি না। কিন্তু এগুলো তাদের অনুভূতই হয় না। ডেনমার্ক এবং হল্যান্ডের পনিরের ডিব্বা বা পাত্রগুলো যখন খোলা হয় তখন কখনো কখনো এগুলোর মধ্যে পোকাও দেখা যায়। অথচ তারা কিন্তু এগুলো বেশ তৃপ্তির সাথেই গলাধঃকরণ করে থাকে।

ব্যবসায়িক মনোভাব নেই এরূপ একদল চিকিৎসকের মতে বন্ধ পাত্রের যে কোন খাদ্য দুধ, মাছ, গোশ্‌ত, ফল ইত্যাদির চেয়ে টাটকাগুলো বেশী উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য বেশী উপকারী। এমনকি তাঁদের মতানুযায়ী এ সমস্ত বন্ধ পাত্রের খাদ্য নানা প্রকার মারাত্মক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ্‌ প্রদত্ত খাদ্য পরিত্যাগ করা হলে শিশুর লালন-পালন ও সবলতার উপর মন্দ প্রভাব পড়ে। আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, মায়ের দুধে লালিত-পালিত শিশু যদিও মোটামুটি জীবন যাপন করে কিন্তু অন্যের দুধে লালিত পালিত শিশুর চেয়ে যক্ষ্মা ও অন্যান্য মারাত্মক রোগের শিকার তারা কম হয়ে থাকে। তাদের শরীরে বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ করার প্রচুর শক্তিও বিদ্যমান থাকে।

কোন কোন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মায়েদের মতে মাতৃদুগ্ধ পরিত্যাগ করার ফলে শিশুর স্বাস্থ্যের উপর মন্দ প্রভাব দেখা দেয়। তাছাড়া এতে আরো ক্ষতি দেখা যায়, তা হলো মায়ের সাথে তার সম্পর্ক ও তার প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পায়। মায়ের স্নেহ ও আদর তারা কম ভোগ করে থাকে। এই কথাটি আকবর ইলাহাবাদী তাঁর কবিতায় সুন্দর বর্ণনা করেছেন ঃ

ও শিক্ষা কোথায় পাবে ?
এ শিশু তো টিনের দুধই পান করে থাকে,
আর শিক্ষাও পায় সরকার থেকে।

মায়ের দুধ পরিত্যাগ করাতে মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়ে থাকে এবং সেই সাথে শিশুর স্বাস্থ্যও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

এ অবস্থায় দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য সর্বদা যে কোন মূল্যে উৎকৃষ্ট দুধ খরিদ করতে হয়। উষ্ণ প্রধান দেশে, যেখানে দুধ কয়েক ঘণ্টাও বিশুদ্ধ থাকে না সেখানে এটা আরো অধিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

প্রকৃতি মায়ের শারীরিক গঠন এমনিভাবে তৈরি করেছে যে, যখনই সে সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, তা

দু'টো অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি অংশ মায়ের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, অপর অংশ শিশুর জন্য পরিমিত পরিমাণে দুধ উৎপাদনের কাজে লাগে। তা হলে সংসারের ব্যয় বৃদ্ধি করার জন্য কেন বাইরে থেকে দুধ খরিদ করতে হবে এবং কেন প্রকৃতির সৃষ্ট দ্রব্য থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না? শিশু যাতে ক্ষুধায় বা অনাহারে না মরে তার জন্য মা ছোলা বা যে কোন শুক্‌না বস্তু খেয়েও দুধ উৎপন্ন করে। কিন্তু অন্যান্য দুধ না পাওয়ার ফলে অথবা খারাপ দুধ পাওয়ার ফলে শিশু ক্ষুধায় মারা যাবে বা অসুস্থ হয়ে পড়বে। বয়স্করা তো রোযা রাখতে পারে কিন্তু শিশুরা তিন-চার ঘণ্টাও ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম নয়। কোন কোন সময় এমনও দেখা গিয়েছে যে, উষ্ণতার কারণে দুধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং মা অজ্ঞাতসারে ঐ দুধই শিশুকে খাওয়াচ্ছে। যার ফলে শিশু রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। শীতপ্রধান দেশে প্রত্যেকবারেই শিশুকে দুধ গরম করে খাওয়াতে হয়।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে দুধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন কোন বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তার এবং আধুনিক শিক্ষিতরা থার্মোস বা রেফ্রি-জারেটরের পরামর্শ দিয়ে থাকে। কিন্তু এরা দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের জীবন-জীবিকার মাপকাঠিতে এ পরামর্শ দেয়নি। আমীর-উমারা বা শিক্ষিত ও সম্পদশালী ব্যক্তিরা তা ক্রয় করতে সক্ষম, কিন্তু যাদের রাতের আহার মেলে না তারা দেড়শত-দু'শত টাকা দিয়ে থার্মোস কিভাবে ক্রয় করবে? রেফ্রিজারেটর খরিদ করার জন্য তো কয়েক হাজার টাকার প্রয়োজন। থার্মোসের মধ্যে গরম দুধ রাখলেও তা খুব শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। হাঁ, তবে ঠাণ্ডা করে এর মধ্যে বরফ মিশ্রিত করে যদি রাখা হয় তবে কিছুটা কাজ হয়। মায়ের দুধ পান না করলে শিশুর দাঁতও দুর্বল হয়। এরূপ শিশুরা দাঁতের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং দাঁতের রোগ অন্যান্য রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মায়ের গর্ভাশয়ে ভ্রূণ পয়দা হওয়ার সাথে সাথেই শিশুর আহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে সে ভিতরেই ন'মাস পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই খাদ্য বা দুধ মায়ের দেহেরই একটি অংশ, শিশুর জন্মের পর সাথে সাথে দুধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্য তাকে দেওয়া হলে এটা তার স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় সে

অত্যন্ত হালকা ও দুর্বল হয়ে থাকে, একজন সবল ও বয়স্ক ব্যক্তির অভ্যাসগত খাদ্যের যদি পরিবর্তন করে দেওয়া হয়, তা হলে সে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সময় এ দেশের জনগণকে বাধ্য হয়েই রুটি খেতে হয়, অথচ তারা সকাল-সন্ধ্যা ভাত খেতেই অভ্যস্ত ছিল। ফলে কলেরা ও মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে লাখো মানুষ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হলো।

বর্তমান যুগে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য এক-দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। যদি এক দেশ তরি-তরকারী ও ফলমূল অন্য দেশে রপ্তানী করে তা হলে সে দেশ গোশ্‌ত ও দুধের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হয়। বর্তমানে যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ থাকে, তাহ'লে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যানবাহনের উন্নতির ফলে অতি সহজেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে পেঁছতে পারে। যদি দেশে দেশে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে তা'হলে যুদ্ধের দাবানল, অবরোধ ও প্রতিক্রিয়া এমনিভাবে দেখা দেয় যার ফলে অবরোধপূর্ণ দেশে জল-স্থল, এমনকি আকাশ পথেও কোন দ্রব্যাদি পেঁছানো সম্ভব হয় না।

গত দু'টো মহাযুদ্ধে ইউরোপীয় দেশ স্পেন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশ থেকে দুধ আমদানী করতো। জার্মানের ভয়াবহ হামলা ও অবরোধের ফলে ঐ সমস্ত দেশ কঠিন বিপদে পড়ে যায়। হাজার হাজার অসহায় মাতাকে তখন ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দনরত দুধপোষ্য শিশু কোলে এবং হাতে পাত্র নিয়ে ভয়াবহ ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির মধ্যে দুধের ডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। এরূপ বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখাও কষ্টকর!

এই বিপদ আরো বেশী মারাত্মক আকার ধারণ করে যখন দেশে মালপত্র আমদানী-রপ্তানীর বাহন রেলগাড়ী, বাস, ট্রাক ও সামুদ্রিক জাহাজ প্রভৃতির শ্রমিকরা হরতাল করে। শত্রুদের আক্রমণ বা অবরোধের ফলে বিদেশ থেকে আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। দেশে হরতালের কারণে শুধু আমদানী বন্ধ হয় না; বরং দেশের অভ্যন্তরেও জীবন-জীবিকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পেঁছানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত ছোট বড় দেশেই এরূপ হরতাল পালিত হয়েছে। লন্ডন, ফ্রান্স, নিউইয়র্ক প্রভৃতি শহরে এরূপ অবস্থায় দুধের আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে লাখ লাখ শিশু ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করেছে।

বর্তমানে বহু মারাত্মক ও ধ্বংসকারী যুদ্ধাস্ত্র তৈরী হয়েছে এবং আজকের বিশ্ব এগুলো তৈরী করেই দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গত মহাযুদ্ধে ডেনমার্ক, হল্যান্ড প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ যদি কয়েক ঘণ্টায় পরাজিত হয়ে থাকে, তবে এখন রাশিয়া ও আমেরিকার মত ভয়াবহ শক্তিও মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্মপদ্ধতি ধ্বংস ও বিশৃংখল হয়ে যাবে। না খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ডিপো নিরাপদ থাকবে, না থাকবে ডিপোর মালিক। বাকী জীবিত দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জীবিত মাতাগণ প্রাণপ্রিয় শিশুদেরকে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করতে দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবে। শিশুদের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত দুধের প্রবাহ বা উৎস বন্ধ করে দিয়ে দুঃসহ যাতনা ভোগ করবে।

ইউরোপের সামাজিক আচার-আচরণ গ্রহণকারী আফ্রিকা এবং এশিয়ার জনগণ পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ীদের সুদূর প্রসারী প্রোপাগান্ডার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রভৃতি প্রদত্ত খাদ্য ছেড়ে দিয়েছে। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কৌটার দুধ বাচ্চাদের পান করাতে শুরু করেছে এবং ইচ্ছাকৃত মাথাব্যথা ক্রয় করেছে।

নিঃসন্দেহে অতীতে সক্ষম ব্যক্তিরা কিছুদিন মায়ের দুধ শিশুদেরকে পান করানোর পর অন্য মহিলা নিযুক্ত করতো শিশুদের দুধ পান করানোর জন্য। কিন্তু অক্ষম ব্যক্তিরা সর্বদা মায়ের দুধ পান করতো। যখন শিশুর মা অসুস্থ হয়ে পড়তো বা মারা যেত, তখন অন্য মহিলার দুধ পান করানোর চেয়ে বকরী বা গাভীর দুধ পান করাতো। তবুও মায়ের দুধের পরে অন্য মহিলার দুধেরই প্রাধান্য দেওয়া হতো। এখন তো প্রথম দিন থেকেই কোন কারণ ছাড়া বিনা প্রয়োজনে কৌটার দুধ দ্বারা শুরু করা হয়।

কেউ কেউ এটাও বলে যে, দুধ পান করানোর ফলে মায়ের স্বাস্থ্যের

উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এটা কি আল্লাহ্ জানতেন না? তিনি কি মায়ের দেহের মধ্যে এ ব্যবস্থা এমনিই সৃষ্টি করেছিলেন? মানবজাতির দেহে কোন অংশ, কোন জোড়া বেকার নেই, একটা অচল হলে অন্য অংশের উপরও এর প্রভাব পড়ে। কেন কোন হিন্দু যোগী দীর্ঘদিন স্বীয় বাহু খাড়া বা সোজা রেখে তা একবারে অকর্মণ্য করে দেয়। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও শক্তির উপর পড়ে। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট দুধের এ স্রোত বন্ধ করা হলে স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব পড়বেই। যদি এটা বন্ধ করা হয়, তা হলে হয়ত তিন-চার বৎসরের জন্য মহিলাদের স্তন অটুট থাকে। এরপর অবশ্যই শিথিল হয়ে ঢলে পড়ে। যাদের একেবারে বাচ্চা হয় না, তারাও অবশেষে স্তনের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা যারা বন্ধ্যাত্ব গ্রহণ করে থাকে, অর্ধেক বয়সেই সাধারণত তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।

এটা পর্যবেক্ষণের দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, যে মহিলা বা মা স্বাভাবিক জীবন যাপন করে এবং বাচ্চাকে নিজের দুধ পান করায়, তারাই দীর্ঘ-জীবী ও স্বাস্থ্যবতী হয়।

একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা—সমস্ত কাল যাঁর জ্ঞানের অধীন এবং যিনি মানুষের উপর আগত বিপদাপদ সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনি পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "যে কোন মানুষকে তার মা জন্মের পূর্বে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করে এবং কষ্টের সাথে প্রসব করে, তাকে গর্ভ ধারণ করতে এবং দুধ পান করানোর সময় ত্রিশ মাস।"[১] অর্থাৎ যে সময় থেকে শিশু মায়ের রক্ত ও গোশ্তের দ্বারা লালিত-পালিত হ'তে থাকে এতে ত্রিশ মাস বা আড়াই বৎসর সময় ব্যয় হয়। গর্ভধারণের আট-নয় মাস বাদ দিলে প্রায় দু'বৎসর বাকী থাকে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "মায়েরা দু'বৎসর শিশুদেরকে দুধ পান করায়।"[২] এ সময়ে মাঝে মাঝে এবং এরপর পূর্ণভাবে শিশুরা অন্যান্য খাদ্য খাওয়া শুরু করে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায়, যদি কুরআনের নির্দেশিত পথে

১. সূরা আহকাফ, ২য় রুকু।
২. সূরা লুকমান, ৩য় রুকু।

চলা যায় তা হলে পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যে কোন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হ'তে পারে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত খাদ্য খেয়ে লালিত পালিত হয়ে সুস্থ ও সবল জীবন লাভ করা সম্ভব হবে।

আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়াও যে দুধ পান করানো হয়, যদি ঐ দুধ শিশুর মাকে পান করানো যায় তা'হলে এটা তার স্বাস্থ্যের উপর এর শুভ প্রতিক্রিয়া পড়বে। শিশুও বাইরের দুধের কুপ্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে।

৫

স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও দেহের যত্ন

দুগ্ধপানের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর শিশু ক্রমশ কিছুটা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। সাথে সাথে জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং দেহের যত্ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য অপরের সাহায্য ও সহযোগিতা থেকে মুক্ত হ'তে থাকে। এমনকি তখন সে পূর্ণভাবে নিজেই এর যিম্মাদার হয়ে যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক ও সচেতন ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইসলাম যে বিধান পেশ করেছে, তা নিম্নে ধারাবাহিক-ভাবে বর্ণনা করা হলো।

প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া

রাতে শীঘ্র শুয়ে পড়া এবং ভোরে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার গুরুত্ব ও উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। সকল ডাক্তার ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীই এটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে ঃ

Early to bed and early to rise
Makes a man healthy, wealthy and wise.

রাতে শীঘ্র শোয়া এবং ভোরে সকাল সকাল নিদ্রা হ'তে জাগ্রত হওয়া মানুষকে স্বাস্থ্যবান, ধনবান ও জ্ঞানবান করে।

ইসলামে প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রত্যহ নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয করা হয়েছে।[১] এর মধ্যে তিন ওয়াক্ত নামাযের সময়

১. তাজরীদে বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদ্উল আযান, হাদীস নং ৩৪৭ এবং তিরমিযী, ১ম খণ্ড, কিতাবুস সালাত, পৃষ্ঠা নং ২৪৮

দিবাভাগে কাজকর্মের মাঝেই এসে যায়। বাকী এক ওয়াক্ত রাতে শোয়ার পূর্বে এবং এক ওয়াক্ত প্রত্যুষে। রাত এবং প্রত্যুষে নামাযের বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সময় হওয়ার সাথে সাথে নামায আদায় করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইশার নামায আদায়ের পর পরই শুয়ে পড়ার আদেশ করা হয়েছে। বিনা প্রয়োজনে অধিক রাত পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বা কাজে সময় ব্যয় করা উচিত নয়[১] এবং ভোরের নামাযের জন্য সকাল সকাল উঠা উত্তম।[২]

ইশা ও ফজরের নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে মাঝে মাঝে হযরত রসূলুল্লাহ্ (স.) বলতেন, 'হে লোক সকল! আমার মন চায় তোমরা নামায পড় আর আমি জঙ্গলে গিয়ে শুকনা লাকড়ি নিয়ে আসি এবং যারা রাতে ইশার নামাযে এবং সকালে ফজর নামাযে আসে না, তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিই।"[৩] মুনাফিকদের উপর ফজর ও ইশার নামায আদায় করা কষ্টকর হয়। এই নামাযে শামিল হওয়ার জন্য হাঁটুর উপর ভর করে হলেও উপস্থিত হও। তাছাড়া হুযুর (স.) আরো বলেছেন, "ভোরে উঠো, কেননা এতে বড় সওয়াব ও উপকার রয়েছে।"[৪]

মহানবী (স.) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে তিনটি ওসীয়ত করেন। প্রথমটি হলো, 'তুমি সারা রাত জেগে ইবাদত করো তবুও ভোরবেলা জাগ্রত হয়ে অবশিষ্ট নামায পড়বে।" দ্বিতীয়টি হলো, "ভোরের নামায ঐ সময় পড়ো যখন তারার আলো অবশিষ্ট থাকে।" হুযুর (স.)-এর যুগে পর্দানশীন মহিলাগণ ভোরের নামায আদায় করার পর যখন ঘরে ফিরে আসতেন তখন তাদেরকে ভালভাবে চেনা যেতো না, কেননা তখনো অন্ধকার বাকী থাকতো।[৫]

মুদ্রণ, ইলমী প্রেস, দিল্লী; অন্যান্য সূত্রগুলো তিরমিযীর এই সংস্করণ থেকে গৃহীত।

১. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩০৭।
২. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩১৭, ৩২৪, ৩২৫ ও ৩২৬।
৩. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, আবওয়াবুস সালাত।
৪. তাজরীদ, ১ম ভাগ, হাদীস নং ৩৬৭।
৫. মিশকাত, ১ম খণ্ড।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সঠিক সময় নামায পড়ার, বিশেষ করে ইশা ও ফজরের নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করে সময়ের মূল্য এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দুনিয়ার সামনে পেশ করে মানব জাতির বড় উপকার করেছেন।

আমরা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট উপকার পেয়েছি। فالحمد لله على ذالك

জাগ্রত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত কিছু প্রাথমিক নির্দেশ

নিশ্বাস গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নাক তৈরি করেছেন। কিন্তু সজাগ থাকার সময় ভুলক্রমে মানুষ মুখ দ্বারাও নিশ্বাস গ্রহণ করে থাকে। রাতে শোবার পর শায়িত ব্যক্তির মুখ বন্ধ থাকার ফলে শুধু নাক দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা ময়লা নোংরা বস্তু নাকের ভিতরই জমে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস সুন্দরভাবে চলাচল এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকালে বিছানা থেকে উঠেই নাকের ময়লা দূর করা প্রয়োজন। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর ইসলামের নির্দেশমত একজন মানুষের কাজ হলো সে ভালভাবে নাক পরিষ্কার করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে হুযুর (স.) বলেছেন, 'বিছানা থেকে উঠে সর্বপ্রথম নাক পরিষ্কার কর। কেননা সারা রাত শয়তান এর মধ্যে ঢুকে থাকে।"[১]

'আরবী অভিধান অনুযায়ী শয়তান শুধু ঐ একটি অস্তিত্বের নামই নয় যা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে; বরং প্রত্যেকটি কষ্ট দেওয়ার বস্তু বা জীবকেই শয়তান বলা হয়। যেমনঃ যাক্কুমের চারা যা দূর থেকে ফণা ধরা সাপের মত মনে হয়। পবিত্র কুরআনে এগুলোকে 'রুউসুশ্ শায়াতিন' অর্থাৎ সাপের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অধিকন্তু শয়তানের অর্থ হলো অপবিত্র ও ক্ষতিকারক জীব। অতএব হাদীসের মর্মার্থ হলো এই যে, নাসারন্ধ্রে ময়লা ও নোংরা জমা হয়ে থাকে। দিনে মানুষ সাবধান থাকে, তাই সর্বদা নাসারন্ধ্র পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে। রাতে অচেতনতার ফলে তা পরিষ্কার করতে পারে না। এজন্য এর ভিতরে বেশী ময়লা জমে থাকে। সুতরাং ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথে

১. তাজরীদে বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবু বাদউল খাল্ক, হাদীস নং ২১৫।

তা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এর সাথে সাথে হাত দ্বারা চোখও মোছা উচিত। এর দ্বারা চোখ ভালভাবে খুলে যায় ও ঘুমের ঘোর কেটে যায়।[১]

ঘুমের ফলে মানুষের যে অচেতনতা ও অলসতার উদ্রেক হয় এ দু'টো কাজের দ্বারা তার অনেকটাই দূরীভূত হয়।

এরপর জুতা ঝেড়েমুছে পরতে হবে। কেননা হতে পারে কোন কষ্টদায়ক জীব এর ভেতর প্রবেশ করে থাকতে পারে। নাতিশীতোষ্ণ এলাকার পল্লী অঞ্চলে এ আশংকা বেশী। এমনিভাবে যদি রাতে দিনে ব্যবহারের আলাদা কাপড় থাকে, তবে এটাও ভালভাবে ঝেড়ে পরিধান করা উচিত। ঘটনাক্রমে রাতের আঁধারে কোন কষ্টদায়ক জীব এতে প্রবেশ করতে পারে।

হাত ধৌত করা ছাড়া পানির কোন পাত্রে হাত দেওয়া উচিত নয়। কেননা রাতের অচেতনে হাত কোথায় কোথায় লেগেছিল তা জানা নেই।[২]

প্রাকৃতিক প্রয়োজন

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পায়খানায় বা জঙ্গলে গিয়ে কাজ শেষ করার পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

যদিও প্রত্যেক জাতি এবং ধর্মের মধ্যে সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া যায়, কিন্তু এ সম্পর্কে ইসলাম কতগুলো বিস্তারিত পথনির্দেশ এবং নিয়মাবলী অনুসন্ধানের পরামর্শ দিয়েছে, যা অন্য কোন ধর্মে দেখা যায় না। আমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানীরা ছোট ছোট বিষয়ের উপর এত দীর্ঘ ও তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন যা পাঠ করে মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। কোন কোন লোক এগুলোর হিকমত ও দর্শন হৃদয়ঙ্গম না করার ফলে ঢিলা-কুলুখ ও ইসতিঞ্জার বিষয় নিয়ে হাসিঠাট্টা করে থাকে। কিন্তু যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করা যায় তাহলে এগুলোর

---

১. তাজরীদে বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল উযু, হাদীস নং ১৩৩।

২. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১২৭।

উপকারিতা ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাধারণ বলে প্রতীয়মান হয় কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এগুলো বাস্তব কাজকর্মের ভিত্তি হিসেবে গুরুত্ব বহন করে।

বর্তমান যুগে সভ্য দেশগুলোতে পায়খানা-প্রস্রাবের পরে কাগজ, কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহারের পদ্ধতি চালু আছে। কোন সময় তারা পানিও ব্যবহার করে। পল্লী এলাকায় লোকেরা ঢিলা, পাথর বা পানি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু ইসলাম এ কাজের জন্য পানি ব্যবহার[১] করার আবশ্যকতা ঘোষণা করে এতো উপকারী পদ্ধতির নির্দেশ করেছে যা অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। এমন কি শহরে বা পল্লী এলাকার লোকদের মধ্যেও নয়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আপন জাতির প্রতি অন্ধ আনুগত্যের পরও এ ব্যাপারে অস্বীকার করতে পারবে না যে, কোন বিজ্ঞ ও জ্ঞানীর নির্দেশ ও উপদেশ ছাড়া কারো পক্ষেই মানব জাতির কল্যাণের জন্য এরূপ পথের সন্ধান ও নির্দেশ প্রদান সম্ভব নয়।

পায়খানা-প্রস্রাবের কাজ সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ইস্তিঞ্জা করতে কেবল বাঁ হাত কাজে লাগাতে হয় এবং ডান হাত দিয়ে পানি ঢালতে হয়।[২] সর্বদা এই নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে অনেক হিকমত ও কল্যাণ রয়েছে।

প্রকৃতিই স্বয়ং দু'হাতের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি মানুষের ডান হাত বাঁ হাতের তুলনায় সবল ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। অধিকাংশ জীবজন্তুও প্রথমে ডান পা উঠিয়ে থাকে—যেমন ঘোড়া; তাই এটাকে আরবীতে 'ইয়ামীন' বা বরকতওয়ালা হাত বলা হয়। এই প্রাকৃতিক বিভাগ অনুযায়ী পানাহারের জন্য ডান হাত এবং পাক-পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য বাঁ হাত কাজে লাগাবার জন্য ইসলামের নির্দেশ রয়েছে

একজন মুসলমান ডাক্তার আমার নিকট একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "একজন অমুসলিম পায়ের গোড়ালীতে আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসে। ক্ষতস্থান ধৌত করার জন্য আমি তাকে একটি পাত্রে পানি দিলাম। সে ডান হাতে পানি নিয়ে ক্ষতস্থানে ধৌত করতে লাগলো এবং বারবার রক্তযুক্ত হাত

১. তাজরীদে বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল উযূ, হাদীস নং ১১৯।
২. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১২০।

পাত্রে রাখার ফলে পাত্রের পানি নোংরা হয়ে গেল। ঐ পানি ফেলে তাকে নতুন পানি দিয়ে বললাম, ডান হাত দিয়ে পানি ঢালুন এবং বাঁ হাতে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করুন। ক্ষতস্থান শীঘ্র পরিষ্কার হবে এবং পানিও দূষিত হবে না। তাকে বললাম, ইসলাম ডান ও বাঁ হাতের কাজ ভাগ করে এই হিকমত ও উপকারিতা রেখেছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "যখন তোমরা কাপড় পরিধান কর, গোসল কর অথবা ওযু কর, তখন ডান দিক থেকে শুরু করো।[১] অপবিত্র ও নোংরা বস্তু পরিষ্কার করা ছাড়া প্রত্যেক কাজেই ডান হাত ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পায়খানা-প্রস্রাবের পর পানি ব্যবহারের পূর্বে যদি কোন শুষ্ক কাপড়, মোটা কাগজ, ঢিলা বা পাথর দিয়ে নির্দিষ্ট স্থান মুছে নেওয়া যায় তবে এটা উত্তম। শুধু পানি ব্যবহার করার মধ্যেও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দু'টো ব্যবহার করা হলে ভালোভাবে পরিষ্কার হয় এবং এটাই উত্তম যা হুযুর (স.) পসন্দ করেছেন।[২]

হ্যাঁ, এ কাজে তিন টুকরো মোটা কাগজ বা কাপড়, তিন অথবা বেজোড় সংখ্যায় ঢিলা বা পাথর ব্যবহার করা উত্তম।[৩] এখানে উত্তমভাবে পরিষ্কারের জন্য তিনটির কথা বলা হয়েছে। এরূপ করার পর নির্দিষ্ট জায়গা পানি দ্বারা ধৌত করা হলে খুব বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা যায়। ইসলামের পরিভাষায় এটাকে 'ইস্‌তিঞ্জা' বলা হয়। ঢিলার ব্যাপারে কোন কোন নব্য শিক্ষিত মুসলমান হাসি-তামাশা করে। অথচ আমার জানা নেই, স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে এর মধ্যে ক্ষতি বা প্রতিবাদের কি আছে ?

ইসতিঞ্জা করার পর বাঁ হাত পরিষ্কার মাটির উপর ঘসে (সম্ভব হলে সাবান দ্বারা) ধৌত করা উচিত।[৪] এই পরিচ্ছন্নকরণের মধ্যে একটি শর্ত রয়েছে যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুব সাধারণ বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এ কাজ হিকমত বা কৌশলে পরিপূর্ণ।

---

১. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১২৯।
২. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১১-১২১-১৫৫।
৩. পূর্বোক্ত।
৪. মিশ্‌কাত ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩২৫।

মহানবী (স.) বলেছেন, ''পায়খানা-প্রস্রাবের পর নির্দিষ্ট স্থান হাড় বা গোবর দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত নয়, কেননা এগুলোতে জিন জাতি বাস করে।''[১]

জিন সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা ও চিন্তা বড় হাস্যকর বলে মনে হয়। কিন্তু জিনের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করলে এ নিষেধাজ্ঞার গূঢ় রহস্য প্রকাশ পায়। আরবীতে 'জিন' শব্দটি দিয়ে প্রত্যেকটি অদৃশ্য বস্তুকেই বোঝান হয়, চাই এটা কষ্টদায়ক হোক বা না হোক। কোন বিপদজনক কাজ করার লোক যেমন ঃ আকাশছোঁয়া দালান নির্মাতা, এমনকি বিড়াল, বাঘ ইত্যাদিকেও জিন বলা হয়; তেমনিভাবে এই শব্দটির দ্বারা ক্ষুদ্র বা অদৃশ্য জীবাণুকেও বোঝায়।

আমার এক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একজন আধুনিক, নব্য শিক্ষিত মুসলমান যুবক আমার নিকট এ কথা শুনে খুব অবহেলা করে ও হাসি-ঠাট্টা করে। ঘটনাক্রমে সে প্রাকৃতিক কর্ম সমাপনের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য হাড় ব্যবহার করে। এটা ব্যবহার করার পরই তার পায়খানার রাস্তায় ভীষণ জ্বালা করতে লাগলো। অবশেষে জায়গাটি খুব বেশী ফুলে গেল। কারণ হলো ঐ হাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল বিষাক্ত পিঁপড়ে ছিল। সে ঐগুলো দেখেনি এবং ঐ বিষাক্ত পিঁপড়েগুলোই তাকে দংশন করেছিল। যখন তার ব্যথা বেড়ে গেল তখন সে আমার নিকট এসে ভুল স্বীকার করল এবং অনুশোচনা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। আমি তাকে বললাম, যে সম্মানিত ব্যক্তিকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা করেছ তাঁর উপর দরুদ পড় এবং তওবা কর। অবশেষে তার ব্যথা দূর হয়ে যায়।

হাড় এবং গোবরের মধ্যে কয়েক প্রকার পোকা-মাকড় এবং বিষাক্ত কীট থাকে। সুতরাং এ দ্রব্যগুলো অপবিত্র হয়ে অন্য অপবিত্র বস্তু কিভাবে দূর করবে ?

উন্নতিশীল ও সম্পদশালী দেশে লোকেরা পায়খানা-প্রস্রাবের পর কাগজ এবং এ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার করে থাকে। মাটির ঢিলা বা পাথর

১. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১২২।

ব্যবহার করা তাদের জন্য অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু ইসলাম বিশ্বজনীন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এর বিধি-বিধান ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, শহর-পল্লী, শুষ্ক ও আর্দ্র, শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বাসিন্দাদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। দুনিয়ার অধিকাংশ দেশ অনুন্নত ও দরিদ্র। যাদের পেট পুরে খাবার জন্য রুটি মেলে না, তারা ইস্তিঞ্জার জন্য কাগজ কিভাবে খরিদ করবে? তারা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে উন্মুক্ত জঙ্গল এবং পবিত্রতার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট সহজলভ্য বস্তুই কাজে লাগাবে।

আমার অভিজ্ঞতা হলো, কাগজ কাপড় ইত্যাদির তুলনায় মাটির ঢিলা বেশী পরিষ্কারক। এরপর পানি ব্যবহার করা তো সোনায় সোহাগার মত।

পাক-পবিত্রতার জন্য পাশ্চাত্য দেশের লোকের মধ্যে বর্তমানে পানির ব্যবহার শুরু হয়েছে। নতুবা তারা এর পূর্বে শুধু কাগজ বা কাপড় দ্বারাই এ কাজ সমাধা করতো। কিন্তু পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন না করা হলে নামাযী মুসলমানদের অন্তরে বিরাট সন্দেহ ও অতৃপ্তির সৃষ্টি হয়। অতঃপর এমনি অসম্পূর্ণ পবিত্রতার সাথে গোসলের জন্য পাত্র ভর্তি পানিতে বা চৌবাচ্চাতে বসা তাদের মনে আরো বেশী সন্দেহের দোলা জাগিয়ে দেয়। তাদের দৃষ্টিতে এটা গোসল হয় না। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মুসলমানের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পরিমাপ কতো ঊর্ধ্বে!

পবিত্রতা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি যে কত উন্নত তা শুধুমাত্র একটি বিষয় দ্বারাই প্রকাশ পায়। আর তা হলো শুধু প্রস্রাব করার পরও পবিত্রতা অর্জন করা জরুরী হয়ে পড়া। প্রস্রাব করার পর প্রস্রাবের রাস্তায় ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব থেকে যায়, যা কিছুক্ষণ পর বের হয়ে অলক্ষ্যেই পোশাক বা জানুতে লেগে তা অপবিত্র করে দেয়। এই অপবিত্রতা থেকে বাঁচার জন্য দুটো উপায় গ্রহণ করা হয়। প্রথমত শুকনা মাটির ঢিলা, মোটা কাগজ, কাপড় ইত্যাদি দ্বারা প্রস্রাবের ফোঁটা শুকিয়ে নেওয়া হয়। এর পর পানি দ্বারা পরিষ্কার করা হয়, দ্বিতীয়ত,

প্রস্রাবের পর কেবল পানি দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। পানি ঢালার ফলে প্রস্রাবের রাস্তা ভিজে ভিতর থেকে নিংড়ানীটুকু বেরিয়ে আসে এবং সাথে সাথে পানি দ্বারা তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য জাতির লোকেরা প্রস্রাবের নির্গত ফোঁটা থেকে পরিত্রাণ লাভ করে না। প্রস্রাবের পর তারা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় এবং প্যান্ট, পায়জামা, ধুতি ইত্যাদি পরিহিত কাপড় দ্বারা গুপ্ত স্থান ঢেকে ফেলে। ফলে নির্গত প্রস্রাবের ফোঁটা শরীর ও কাপড়ের উপর লেগে দুর্গন্ধ ও নাপাকীর সৃষ্টি করে। কোন কোন সময় রানের উপর লেগে অন্যান্য রোগেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমি অনেক জায়গায় দেখেছি, হিন্দুরা পায়খানায় গিয়ে পানির পাত্র নীচে রেখে দেয়। ফলে প্রস্রাবের ছিঁটে-ফোঁটা ঐ পাত্রের উপর পড়তে থাকে। এরপর ঐ পানি দ্বারাই তারা শৌচ-কার্য সমাধা করে। মুসলমান এ কাজেও পরিষ্কার পানি ব্যবহার করে এবং পানির পাত্র এরূপ জায়গায় রাখে, যেখানে প্রস্রাবের ছিঁটে থেকে তা দূরে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পানি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করা হয়। তাছাড়া ওযুর পানি পায়খানায় রাখা নিষেধ।[১]

একজন নামাযী মুসলমানের দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ সামান্য পরিমাণ পায়খানা-প্রস্রাব এবং অন্যান্য নাপাকী থেকেও পবিত্র হয়ে থাকে। কেউ কেউ এত সতর্কতার সাথে কাজ করেন যে, যদি এক ফোঁটা প্রস্রাব তাঁর শরীর বা কাপড়ে লেগে যায়, তবে এটা ধুয়ে পরিষ্কার না করা পর্যন্ত তাঁর মনে শান্তি আসে না। এমনকি এ অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকা মুসলমানের বিশেষ অভ্যাসে পরিণত হয়।

হাদীসে বর্ণিত আছে, "একদা হুযুর (স.) কোন এক ব্যক্তির কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কাশ্‌ফ বা অন্তর্চক্ষু দ্বারা দেখতে পেলেন কবরে শায়িত ব্যক্তির উপর আযাব হচ্ছে। আযাব হওয়ার কারণ হলো তিনি প্রস্রাবের নির্গত ফোঁটার অপবিত্রতা থেকে ভালভাবে সতর্ক থাকতেন না। নিঃসন্দেহে মানুষের শরীর থেকে বহির্গত পায়খানা-প্রস্রাব ও অন্যান্য বস্তু সবই অপবিত্র ও নোংরা। এগুলো থেকে

১. তাজরীদে বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ১১৫।

অসতর্ক থাকলে দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ অপবিত্র করা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হতে হয়। এমনকি বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় বর্ণনা করা প্রয়োজন। কোন কোন মুসলমান প্রস্রাবের পরে দাঁড়িয়ে ঢিলা দ্বারা ইস্‌তিঞ্জা করে এবং এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করে। ফলে পথচারীরা তাদেরকে দেখতে পায়। এটা অবশ্যই অপসন্দনীয় ও লজ্জাজনক ব্যাপার—যেটা ইসলাম মোটেই সমর্থন করে না। এরূপ কার্যকলাপ দেখে আধুনিক শিক্ষিতরা স্বাস্থ্যরক্ষার ইসলামী বিধি-বিধান, তথা ঢিলা ও ইস্‌তিঞ্জার সমালোচনা করে থাকে। ইস্‌তিঞ্জার সঠিক পদ্ধতি হলো বসে বসে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢিলা বা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন হুযূর (স.)-এর অভ্যাস ছিল।[১]

প্রস্রাব-পায়খানার সাধারণ নোংরামী ও অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকার কারণ ও ক্ষতি কমবেশী সবারই জানা। যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি ও অন্যায় থেকে মানুষ বিরত না থাকে তবে ধীরে ধীরে বিরাট অন্যায় থেকে গাফিল হতে থাকে। ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নামে মাত্র থেকে যায়।

আরো একটি কারণে পবিত্রতার জন্য ইসলামী বিধি-বিধান অত্যন্ত উপকারী ও ফলদায়ক। চলাফেরা ও কাজকর্ম করার ফলে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে দুই রানের মধ্যে ঘামে ভিজে যায়। পানি দ্বারা শরীরের ঐ অংশ ধৌত করা হলে লোমকূপ খুলে যায় এবং ময়লা দূর হয়ে যায়।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নামায শুদ্ধ হয় না। তাই দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এটা বলা হয়ে থাকে যে, দুনিয়ার সবচেয়ে নোংরা ও ময়লা যে বস্তুর সাথে মানুষের প্রত্যহ কয়েকবার করে সম্পর্ক রাখতে হয় সেটা হলো নিজের প্রস্রাব-পায়খানা। এটা এরূপ নোংরা যা স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত নোংরা বস্তু থেকে বেশী মন্দ ফলাফল সৃষ্টি করেন। এটা থেকে যতটুকু বেঁচে থাকা যায় এবং বাসস্থান ও কর্মস্থল থেকে দূরে রাখা যায় ততই উত্তম ও ফলদায়ক। এর স্পর্শ মানুষের জন্য ক্ষতিকর।

১. তাজরীদে বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল উযূ, হাদীস নং ১৫০ ও মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩০৯।

কাজেই এ ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকাই শান্তি এবং স্বাস্থ্যের জন্য খুবই প্রয়োজন ও উত্তম।

কিন্তু এর ক্ষতির দিক জানা সত্ত্বেও এটা থেকে অসতর্ক ও অসাবধানতা পরিদৃষ্ট হয়। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা শরীয়তে পায়খানা প্রস্রাবের নোংরামী ও অপবিত্রতা থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশ দেয়নি। আমরা নির্ভয়ে ও দ্বিধাহীন চিত্তে এ কথা বলতে পারি যে, পৃথিবীর বুকে সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা এ সমস্ত নোংরা ও অপবিত্র বস্তু থেকে বেঁচে থাকার জন্য জরুরী নির্দেশ দিয়েছে। এর ক্ষতিকর ফলাফল থেকে নিরাপদ ও বেঁচে থাকার জন্য অতি উত্তম পথেরও সন্ধান দিয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাপনের নিয়মাবলী এবং পায়খানার নির্মাণ প্রণালীও অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে।

পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য সহজ সরল প্রাকৃতিক নিয়মাবলী মেনে চলতে দেখা যায়, যা গত শতাব্দী পর্যন্ত উন্নয়নশীল জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ দেহের সাথে অন কিছুর সাহায্য ছাড়া পায়ের উপর বসা। আজকাল ইউরোপীয় জাতি এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী লোকেরা এ নিয়ে নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে। এটাকে তারা জংলী ও অসভ্য পন্থা বলে মনে করে। কিন্তু যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তবে দেখা যাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান মতেও এটাই স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য উপকারী এবং সরল পথ। মহানবী (স.) যখন ঘরে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাপনের জন্যে যেতেন, তখন দু'টো ইটের উপর পা রেখে বসতেন।[১]

এ নিয়মে বসার ফলে দেহের সমস্ত অপ্রয়োজনীয় বস্তু সোজা পাকস্থলীর শেষপ্রান্তে উপনীত হয়। এরপর রান দ্বারাও পেটের দু'দিকে চাপ পড়ে। নিম্নাংশ খোলা থাকার কারণে এবং দেহের প্রাকৃতিক চাপের ফলে পাকস্থলীর মুখ পূর্ণভাবে খুলে যায় এবং এর স্পন্দন বেড়ে যায়, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত বস্তু বের হওয়া আরও সহজ হয় এবং দ্রুত এ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল উযূ, হাদীস নং ১৪৬।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল জাতির মধ্যে প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী এ প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন অনুসরণ করা হয়। ক্ষুদ্র পল্লী ও পাড়া গাঁয়ের লোকেরা সাধারণত জঙ্গলে চলে যায় এবং পায়খানা-প্রস্রাব সেরে অন্য জায়গায় গিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে। শহরের বাসিন্দারা নিজ বাড়ীতে বিভিন্ন প্রকার পায়খানা নির্মাণ করে, যার ভিতর সম্ভবত দু'তিনটে কমোড থাকে। এর একটা কি দুটো প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এবং অন্যটা হাত ধৌত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এগুলো এত উঁচু হয় যে, প্রস্রাব-পায়খানা বা ধৌত করার সময় দেহ বা পোশাক -পরিচ্ছদের উপর ছিঁটে পড়ে না।

কোন কোন সময় শহরের পায়খানায় একটাই কমোড এভাবে তৈরী করা হয় যে, এর নালা বা নর্দমা এমনি খোলা বা ঢালু করা হয় যার ফলে ময়লা সহজভাবে ভেসে নীচে নোংরা নর্দমায় চলে যায়। যখন এটার উপর বসে হাত ধৌত করা হয় তখন ঐ পানির দ্বারা কমোড ও নালা আরো বেশী পরিচ্ছন্ন হয়।

উপরে উল্লিখিত পন্থা গ্রহণ করে একটু সতর্কতার সাথে কাজ করলে দেহ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ যে কোন প্রকার ময়লা ও নোংরা বস্তু থেকে নিরাপদ থাকতে পারে এবং দেহের নির্দিষ্ট জায়গাও পূর্ণভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে যায়। পায়খানা-প্রস্রাবের পর মানুষ একটু আরাম বোধ করে। এরপর পবিত্রতা অর্জন করে নিজেকে হালকা মনে করে।

পায়খানা-প্রস্রাবের সময় লজ্জা-শরমের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। পায়খানা-প্রস্রাবকারী ব্যক্তির অন্যের সম্মুখে উলঙ্গ না হওয়া উচিত। জঙ্গলে, কোন গর্তের মধ্যে বা গাছের ও ঝোপের আড়ালে অন্যের দৃষ্টির বাইরে বসবে। পায়খানায় বসলেও পর্দা করে বসতে হবে, হুযুর (স.)-এর এটাই নিয়ম ছিল।[১]

যদি পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কেউ দেখে ফেলে তা হলে পূর্ণভাবে মল ত্যাগ করা যায় না, যা কোন কোন সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

একবার আমি পাটনার এক সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। সেখানে এক মাদ্রাজী হিন্দু প্রতিনিধিও ছিল। সম্মেলনস্থলের নিকটই কতগুলি

১. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল উযূ, হাদীস নং ২৩২।

পায়খানা ছিল। আমার নিকট এটা খুব আশ্চর্য লাগলো যে, ঐ মাদ্রাজী মলত্যাগের সময় সম্মেলনে উত্থাপিত কর্মসূচীর উপর উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিতে লাগলো। কিন্তু মহানবী (স.) বলেছেন, "পায়খানায় যে উলঙ্গ অবস্থায় কথাবার্তা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দারুণ অসন্তুষ্ট হন।"[১]

অতীতকালের চাল-চলন ছেড়ে আধুনিক যুগে পায়খানার জন্য কমোড, পাট ও ফ্লাশের প্রচলন চলছে। নব্য আফ্রিকা ও এশিয়ার লোকেরা এটা পসন্দ করে থাকে। এগুলো গোসলখানায় রাখা বা তৈরী হয়। বাহ্যিক দিক দিয়ে এগুলো খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হয়। গোসলখানা এবং পায়খানা এক জায়গায় হওয়ার অনেক কুফল রয়েছে। এখানে নতুন ধরনের পায়খানা সম্পর্কে কিছু বলবো।

কমোডের উপর মানুষ এমনি ভর দিয়ে বসে যেমন কুরসী বা চেয়ারের উপর আরামে বসে। পীড়িত ব্যক্তির জন্য এভাবে বসা আরামদায়ক ও উপকারী। কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির দেহে এটা অধিক আলস্যের উদ্রেক করে। এভাবে বসলে দেহে আরাম বোধ হয়। যার ফলে নাড়ীভুঁড়ির মধ্যে স্থিরতা থাকে। তাই মলদ্বার ভালভাবে উন্মুক্ত হয় না। রানের চাপ পেট ও নাড়ীভুঁড়ির উপর পড়ে না। ফলে অপ্রয়োজনীয় বস্তু পূর্ণভাবে বের হয় না। এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতার দিক থেকেও এ পদ্ধতি অপসন্দনীয়। যারা নিজ দেহ বা পোশাক-পরিচ্ছদে সামান্য পরিমাণ মলমূত্র লাগা অপসন্দ করে, তারা কাঠ বা ধাতুর তৈরী ঢাকনা, যার উপর সর্বদা ময়লা পতিত হয় এরূপ বস্তুর উপর বসা কিভাবে পসন্দ করবে? এটা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলেও সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

কমোড কয়েক প্রকার, যেমন, (ক) স্থায়ী, (খ) স্থানান্তরযোগ্য। প্রথমোক্তটি শহরে ঐ স্থানে ব্যবহার করে যেখানে নোংরা ও ময়লার নর্দমার সাথে পানি প্রবাহিত হওয়ার সুব্যবস্থা থাকে অথবা বাড়ীর মালিক নিজ খরচে এ ব্যবস্থা করে নেয়।

---

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩২১।

স্থায়ী কমোডের দেয়ালের কিছু উপরে পানির হাউজের সাথে সংযোগ থাকে। কমোডের উপর একটি শিকল লটকানো থাকে। যখন শিকল টান দেওয়া হয় তখন হাউজ থেকে খুব জোরে পানি আসতে থাকে এবং সমস্ত ময়লা কমোডের নীচ দিয়ে বের করে নোংরা নর্দমাতে গিয়ে পতিত হয়। হাউজ এভাবে তৈরী যে, একবার পানি বের হওয়ার সাথে সাথে আবার তা ভরে যায় এবং মধ্যে প্রায় দশ-বারো সের পানি থাকে।

এরূপ কমোড যদি প্রত্যহ দশ-বারোজন লোক ব্যবহার করে তা হলে কত মণ পানির প্রয়োজন হয়? শুষ্ক অঞ্চলে, যেখানে পান করার জন্য পানি অতি কষ্টে পাওয়া যায় সেখানে এ ব্যবস্থা করা কিভাবে সম্ভব? যদি কোন শহরে লোক বা সম্পদশালী ব্যক্তি এরূপ ব্যবস্থা করে, তা হলে এর দরুন ঐ এলাকার জনগণের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু পানির অপচয় হবে এটি একটি পরিতাপের বিষয়।

এরূপ কমোডের উপর বসে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। অন্য জায়গায় বসতেই হয়, ফলে পানি অতিরিক্ত খরচ হয়। দেহের নির্দিষ্ট জায়গা পরিষ্কার করার জন্য মোটা কাগজ ব্যবহার করতে হয়। কাপড় তুলা বা ঢিলা ব্যবহার করা যায় না। কেননা এগুলো কমোডে পতিত হলে এর নীচের সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে যায়।

এ ধরনের কমোডের অনেকগুলো ক্ষতিকর দিক আছে। এগুলো তৈরী করতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়। এগুলো মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে। এরপর ব্যবহারের জন্য কিছু কাগজ ক্রয় করতেই হয়। যদি কোন কারণে এটার নীচের সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ হয়ে যায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত অভিজ্ঞ কারিগর মিস্ত্রী দ্বারা পরিষ্কার করানো না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজই চলে না। হাউজে যদি কোন কারণবশত পানি না থাকে এবং কমোডে পানি না আসে তা হলে কমোড ময়লায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, ফলে ঘর দুর্গন্ধে ভরে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার অস্থায়ী কমোড–যা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যায় এবং সেটার অংশ-বিশেষ খুলে পরিষ্কার করতে হয়। এটাও তেমন ফলদায়ক নয়। একবার ব্যবহার করা হলে তা পরিষ্কার

না করা পর্যন্ত দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায় না। তাই ঘরে হয়ত অতিরিক্ত কমোড রাখতে হয় অথবা ব্যবহার করার পর পর ধোয়ার ব্যবস্থা করতেও বেশ টাকার প্রয়োজন।

আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশে স্থায়ী কমোডের প্রচলন দেখা যায়। এগুলোতে পায়ের উপর ভর করে বসা যায় কিন্তু এগুলোর উপর পানির হাউজ থাকে এবং উপরে বসেই পানি ব্যবহার করা হয়। যদিও প্রথমোক্ত কমোডের চেয়ে পরিষ্কারের দিক দিয়ে এগুলো কিছুটা ভাল কিন্তু এটা তৈরী করতেও বেশ পয়সা ব্যয় করতে হয়, পানিরও অপচয় হয়। হাউজ, নর্দমা ও সুড়ঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা প্রবাহিত পানি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

আমরা এ কথা বলি না যে, ইসলামে কমোড ফ্লাশ বা পাট ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এ বর্ণনার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামী বিধান শুধু এটাই চায় যে, যে কোন বিধান পালন করা হোক না কেন, তাতে যেন বেশী করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা যায় এবং এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে না হয়।

পশ্চিম আফ্রিকার গানা অঞ্চলের ইংরেজী 'গিনি টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক পিনফোর্ড ১৯৫৮ সালের ৭ই মার্চের সংখ্যায় এক প্রবন্ধে বলেন, 'ইসলামের বিধি-বিধান খুবই সুন্দর ও সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এর মধ্যে মলমূত্র ত্যাগের পর কাগজের পরিবর্তে পানি ব্যবহার করার মত একটি নোংরা ও নিকৃষ্ট নিয়ম রয়েছে। মিঃ পিনফোর্ড ইসলামের উপর বিভিন্ন প্রকার সমালোচনা ও প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজের সংস্কৃতি জাহির করার চেষ্টা করেছেন। আর ইসলামকে নীচু ও অসভ্য লোকের ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন।

উপরে উল্লিখিত প্রশ্নাবলী ও সমালোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের নিকট এর কোন মূল্য নেই। ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তিম লগ্নে ইসলামের উপর এ ধরনের অযৌক্তিক আক্রমণের কোন মূল্যায়ন হতে পারে না।

আফ্রিকারই লিপস্ নামক শহরের সি. এম. এস. গ্রামার স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মিঃ জি. ই. ইভান্স বি. এস. সি, (লণ্ডন) তাঁর

লিখিত ট্রপিকেল হাইজিন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'মল ত্যাগের পর কাগজের পরিবর্তে পানির ব্যবহার অতি উত্তম। ইউরোপের যে সমস্ত বাসিন্দা প্রাচ্যদেশে গিয়ে বাস করে, তারা সাধারণত পানি ব্যবহারেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। যারা এটায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাদের অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য পানি বা কাগজ ব্যবহারের পর সাবান এবং পানি দ্বারা হাত পরিষ্কার করা প্রয়োজন।'

ইসলামী বিধান অনুযায়ী পানি ব্যবহারের উপকারিতা ও গুরুত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও মিঃ ইভান্স এ দিকটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি যে, কাগজ ব্যবহারের পর যদি পানি ব্যবহার করা না হয় তাহলে মলত্যাগের স্থান পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয় না।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কাগজ ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করা ব্যতীত একজন মুসলমানের জন্য পানির টবে বসে গোসল করা অপসন্দনীয় ও অসম্ভব। কেননা এমন কি প্রস্রাব করার পরও পানি ব্যবহার করা তাদের অন্যতম অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, পরিষ্কার কাপড় বা কাগজ দ্বারা মলত্যাগের স্থান পরিষ্কার করার পরও কিছু ময়লা থেকেই যায়, যা পানি দ্বারা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করতে হয়। এটাও সর্বজনস্বীকৃত যে, দুনিয়ার অন্য কোন বস্তুই পানির চেয়ে বেশী সহজলভ্য ও ক্রিয়াশীল নেই।

মহানবী (স.) প্রস্রাব সম্পর্কে আরো নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "যখন তোমরা প্রস্রাব করার ইচ্ছা করো, তখন একটি ভালো জায়গা খোঁজ কর।[১] এরূপ জায়গা হওয়া চাই, যেখান থেকে প্রস্রাবের ছিটে কাপড় বা শরীরে পতিত না হয়। এরূপ নোংরা জায়গা হওয়া অনুচিত, যাতে কোন রোগে আক্রান্ত করে। এরূপ জায়গাও অনুচিত যেখান থেকে প্রস্রাব প্রবাহিত হয়ে নিজের দিকে ফিরে আসে।"

তিনি আরো বলেছেন, "দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা অনুচিত।[২] কেননা এর মধ্যে কতগুলো ক্ষতিকর দিক আছে। এটা ইতর বিশেষের কাজ। দ্বিতীয়ত,

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩১০।
২. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, কিতাবুত তাহারাত।

পোশাক এবং দেহের মধ্যে প্রস্রাবের ছিঁটে-পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয়ত, ইসলামের দৃষ্টিতে যে পবিত্রতা অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য ও প্রয়োজন বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করায় সম্ভব নয়। কিন্তু যদি এরূপ ঢিলা বা স্তূপ হয় যেখানে ছিঁটে ছড়ায় না, প্রয়োজনবশত সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যায়।"[১]

হুযূর (স.) আরো বলেছেন, "কোন ছিদ্র বা সুড়ঙ্গের ভিতর প্রস্রাব করা অনুচিত।[২] কারণ কোন কোন সময় ছিদ্রের ভিতর বিষাক্ত জীব থাকে। প্রস্রাব ভিতরে প্রবেশ করার ফলে এগুলো বেরিয়ে আসে এবং প্রস্রাবকারীকে দংশন করার আশংকাও থাকে।"

স্বাস্থ্যের উপরও ইস্তিঞ্জা করার উত্তম প্রভাব পড়ে। অবিবাহিত যুবকগণ প্রায়ই স্বপ্নদোষের শিকার হয়। কেউ কেউ অতিরিক্ত স্বপ্নদোষের ফলে স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলে। এক যুবক হুযূর (স.)-এর নিকট এই ব্যাধির অভিযোগ পেশ করলে হুযূর (স.) বললেন, "শয়ন করার পূর্বে নিজ পুরুষাঙ্গ ধৌত করে নিও।" তিনি নিজে উযূ করে নিদ্রা যেতেন।

যারা রাতে প্রস্রাব করা ছাড়া নিদ্রা যায় তাদের স্বপ্নদোষের সম্ভাবনা বেশী থাকে। ইস্তিঞ্জা করার সাথে প্রস্রাবও এসে যায়। এ দুটো কাজ স্বপ্নদোষ থেকে বাঁচার জন্য উত্তম রক্ষাকবচ। কেননা প্রস্রাবের ফলে মূত্রনালী শূন্য হয়ে যায় এবং পানির দ্বারা রগ বা শিরা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। প্রস্রাব পায়খানার সময় বন্ধ করা বা থামিয়ে দেওয়া স্বাস্থ্যের উপর খুব ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন গ্রাম্য ও জংলী লোক একবার মদীনায় এলো এবং মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করতে শুরু করল। সাহাবা কিরাম চীৎকার করতে লাগলেন। হুযূর (স.) তাঁদেরকে নিষেধ করে বললেন, "তাকে শেষ করতে দাও।" তারপর পানির ডোল চাইলেন এবং ময়লা পরিষ্কার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।[৩]

---

১. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৫৮।

২. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩১৯।

৩. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪০৮।

ওযূ বা হাত, মুখ ইত্যাদি ধোয়া

ভোরে মলমূত্র ত্যাগের পর পাক পবিত্র হয়ে ফজরের নামায আদায় করার জন্য পরিষ্কার পানি দ্বারা হাত, মুখ ও পা ইত্যাদি ধৌত করা হয়। এটাকেই উযূ বলা হয়।[১] ওযূর অর্থ পবিত্রতা ও সৌন্দর্য।

প্রত্যেক ধর্মের ইবাদতের জন্য দেহ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পাক-পবিত্রতা অর্জনের জন্য কোন ধর্মই নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ঘোষণা করেনি; বরং প্রত্যেক 'ইবাদতকারীর ইচ্ছার উপর এটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে এর জন্য বিস্তারিত বিধান রয়েছে—যা ছাড়া পবিত্রতা অর্জন করা যায় না এবং পবিত্রতা ছাড়া কোন 'ইবাদতই সঠিক হয় না।[২]

'ইবাদতের জন্য প্রথম প্রয়োজন পবিত্রতা বা ইস্তিঞ্জা। দ্বিতীয়ত ওযূ।[৩] এমনকি দেহ ও পোশাকের বাহ্যিক পবিত্রতাও ইসলামী 'ইবাদতের প্রধান শর্ত। তবে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐ বিধি-বিধান অত্যন্ত সহজ ও সরল। যদি কোন কারণবশত এই বিধান পালন না করা যায়, তা হলে 'ইবাদতে কোন প্রকার ক্ষতি হবে না; বরং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম-নির্দেশিত কোন বিধান পালন না করে উপকৃত না হওয়াই ইসলামের বিরুদ্ধ ও অপসন্দনীয়; যেমন রুগ্ন অবস্থায়। যখন পানির ব্যবহার রোগীর বা পীড়িত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর, শিলা-বৃষ্টি এবং কঠিন শীতের সময় যদি গরম পানির ব্যবস্থা না হয় অথবা বালুকাময় উষ্ণ স্থানে বা ভ্রমণের সময় যেখানে পান করার পানি পাওয়া দুষ্কর, এরূপ জায়গায় পানি দ্বারা ওযূ ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য বারবার পানির খোঁজ করা বোকামী এবং ইসলামী বিধানের পরিপন্থী। ইসলাম কোন মানুষের উপর তার ক্ষমতার বাইরে বোঝা বা আইন প্রয়োগ করে না। এরূপ অবস্থায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার নির্দেশ রয়েছে।

---

১. মিশকাত. ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৪৪।

২. ওযূর বর্ণনা পবিত্র কুরআন সমস্ত ও ফিকাহ্‌র কিতাবে করা হয়েছে এবং এর উপর আমলও করা হচ্ছে।

৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ওযূ, হাদীস নং ১৩৬।

এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, নিদ্রা বা কাজ-কর্মের পর গোসল করা অথবা পানির স্বল্পতা বা শীতের প্রচণ্ডতার কারণে শুধু হাত, পা, মুখ ইত্যাদি ধৌত করলে অলসতা দূর হয়ে যায়। বিশেষত উষ্ণ অঞ্চলে কঠিন পরিশ্রমকারী শ্রমিকদের জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, ইবাদতের জন্য মানসিক অবস্থা শান্ত ও সুস্থ হওয়া চাই।

এটাও বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। নামায আদায় করার জন্য যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেভাবে ধৌত করার বিধান রয়েছে এবং যে সময় পর্যন্ত এ ওযূ কার্যকরী থাকে—এ বিধানগুলোর উপর যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে স্বাস্থ্যবিধির দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যাবে এগুলো এত ফলদায়ক ও কার্যকরী বিধান, যার কোন তুলনাই হতে পারে না। এ কারণেই ফিকাহ্‌বিদগণ যে সমস্ত বিষয় সাধারণ বলে মনে হয়, সেগুলোর উপরও বিরাট বিরাট কিতাব লিখেছেন।

পবিত্র কুরআনে সংক্ষিপ্তভাবে ওযূর উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, 'নামাযের জন্য মুখ, কনুই পর্যন্ত উভয় হাত, টাখনু পর্যন্ত উভয় পা ধৌত কর এবং মাথা মোসেহ কর।'[১] সামান্য মতভেদের সাথে সমস্ত কিতাব, হাদীস এবং ফিকাহর ভিতর এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আছে। এখানে ঐ মতভেদের উপর আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা এখানে স্বাস্থ্যরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব।

হাত ধোয়া

ইসলামী শিক্ষানুযায়ী প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে হয়।[২] ওযূর শুরুতেই প্রথম ডান হাতে পানি ঢালতে হয় এবং কব্জি পর্যন্ত হাত ধৌত করতে হয়। একবার পানি ঢেলে ভাল করে হাত রগড়াতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পানি ঢেলে ভাল করে ময়লা পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু উভয় হাত রগড়ানোর সময় হাতের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পরের ভিতর প্রবেশ

---

১. সূরা মায়িদা, ২য় রুকূ।

২. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল উযূ, হাদীস নং ১৬৭।

করিয়ে খুব করে রগড়ানো উত্তম। এটাকে খেলাল করা[১] বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার পরিশ্রমের কাজ করার ফলে যাদের হাত প্রায়ই ময়লাযুক্ত হয়ে যায়, তাদের জন্য এভাবে হাত ধৌত করা অত্যন্ত উপকারী। পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও হাতের অঙ্গুলিগুলো পরস্পর রগড়ালে অবশ ও ক্লান্তি হতে আরামবোধ হয়। যেরূপে শরীরের অন্যান্য ক্লান্ত অংশ রগড়ালে আরামবোধ হয়।

ওযূ করার সময় ওযূর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করা কর্তব্য। এমনকি যদি আংটি পরা থাকে তবে এটা নাড়াচাড়া করে ভিতরের অংশ ধৌত করতে হয়।[২] যদি উত্তমরূপে ধৌত করা না হয় তবে পানির স্পর্শে ময়লা গলে যায় কিন্তু পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর আবার তা জমে যায়।

মুখ, গলদেশ এবং দাঁতের পরিচ্ছন্নতা

হাত ধৌত করার পর কুল্লি করতে হয়। মিসওয়াক বা ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে হয়। দাঁত, চোয়াল, তালু এবং গলদেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে এবং এগুলোর উপকারিতাও অস্বীকার করা যাবে না। যদি কোন কারণবশত ওযূর সময় মিসওয়াক বা ব্রাশ করা না যায় তা হলে ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতে হয় এবং তিনবার কুল্লি করতে হয়।

নাকের পরিচ্ছন্নতা

এরপর আঁজলা দ্বারা নাকে পানি নিক্ষেপ করতে হয় এবং বাঁ হাতের আঙ্গুল নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে উত্তমরূপে ময়লা বের করে পরিষ্কার করতে হয়। সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো নাকে পানি নিয়ে উপরের দিকে নিশ্বাস টানতে হয়। তা হলে নাকের সুড়ঙ্গ পথে ময়লা অতি সহজেই বের হয়ে আসে। এভাবে তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়।

সর্দি থেকে বাঁচার জন্য গলা এবং নাক পরিষ্কার ও বিভিন্ন প্রকার রোগ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আজকাল চিকিৎসকরা বেশী দামী ঔষধের ব্যবস্থা

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৬৭।

২. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ওযূ, হাদীস নং ১২৯ এবং মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৮৭।

দিয়ে থাকেন, যা দরিদ্র লোকের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব। কিন্তু মহানবী (স.) আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে গলা, নাক, মুখ ইত্যাদি পরিষ্কারের জন্য এবং এগুলোর বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচার জন্য এরূপ ফলদায়ক ও সহজ পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, যা প্রত্যহ পাঁচবার প্রত্যেক ধনী-দরিদ্র ব্যক্তি কিছু খরচ না করেই গ্রহণ করতে পারে। অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেছে যে, এ পদ্ধতি আধুনিক যুগের অন্যান্য পদ্ধতি থেকে বেশী ফলদায়ক ও উপকারী।

চোখের পরিচ্ছন্নতা

নাক পরিষ্কার করার পর উভয় হাত দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডল এবং চোখ খুলে এমনভাবে পানি ছিঁটিয়ে দিতে হয় যেন চোখের ভিতরে পৌঁছে। চোখ, থুতনি, গলার সম্মুখভাগ, মাথার চুল পর্যন্ত কপাল এবং কানের লতি পর্যন্ত উত্তমরূপে রগড়াতে হয়। অতঃপর দু'বার পানি দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করতে হয়। দাঁড়ি থাকলে খেলাল করতে হয়।[১]

প্রত্যহ পাঁচ-ছ'বার এভাবে চোখ ধৌত করা এবং পরিষ্কার-করা চক্ষু-রোগের জন্য উত্তম ফলদায়ক। শৈশবকালের একটি ঘটনা মনে পড়ে। এক-জন কর্মকার একদিন কথা প্রসঙ্গে বলল, "কাঁচি শান দেওয়ার সময় একদিন হঠাৎ লোহার সামান্য অংশ চোখের ভিতর ঢুকে গেল। খুব কষ্ট হতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও বের করা গেল না। অবশেষে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ায় তিনি সেটা বের করে দিলেন। তিনি এটাও পরামর্শ দিলেন যে, "যখন কোন কাজ শেষ হয়, তখন চোখ খুলে তাতে পানির ছিঁটে দেবে। এতে সমস্ত ধূলিবালি ও ময়লা গলে বের হয়ে যাবে।" ঐ সমস্ত থেকে চোখ পরিষ্কারের এই সহজ পদ্ধতি আমার ভাল লেগেছে। আমি এর দ্বারা অত্যন্ত উপকার পেয়েছি।

কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া

মুখমণ্ডল ধৌত করার পর ভিজা হাতে কনুইয়ের কিছু উপর পর্যন্ত প্রথম ডান হাত, তারপর বাঁ হাত ধৌত করতে হয়। কাজকর্মের মধ্যে

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড।

সাধারণত কনুই পর্যন্ত ধূলিবালি লেগে থাকে। এইজন্য কনুই পর্যন্ত ধৌত করার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিন-তিনবার পানি ঢেলে হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করতে হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, কেন প্রথমেই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা হয় না? একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, এখানে একটি সুন্দর হিকমত বা কৌশল রয়েছে এবং এটা পূর্ণভাবে পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যই বলা হয়েছে। মুখ, নাক, চোখ ইত্যাদি ধৌত করার ফলে ময়লা স্বাভাবিকভাবে কনুই পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে। যদি প্রথমেই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা হয় তাহলে মুখমণ্ডল ধৌত করার পর পানি কনুইর দিকে এসে পুনরায় নোংরা করে ফেলবে। সুতরাং উত্তমরূপে পরিষ্কার করার জন্য দ্বিতীয়বার ধৌত করতে হবে, যার ফলে পানি এবং সময় অপচয় হবে। এছাড়া কষ্টও বেশী হবে।

মাথা মোসেহ করা

এরপর উভয় হাতে পানি নিয়ে হাতের সামনের অংশ দিয়ে কপালের প্রথম ভাগ থেকে শুরু করে মাথার অর্ধাংশ মুছতে হয়। এটাকেই 'মোসেহ' বলা হয়। অতঃপর শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা কানের ছিদ্র পরিষ্কার করতে হয় এবং কানের ভিতর অঙ্গুলি ফেরাতে হয়। এরপর বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের বাইরে দিয়ে ফেরাতে হয়। এরপর হাত উল্টা করে গর্দানের উভয় দিকে ফেরাতে হয়।

এ সমস্ত কাজ হিকমতে পরিপূর্ণ এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ফলদায়ক। এটাও ক্লান্তি বা নিদ্রা হতে জাগ্রত ব্যক্তির অলসতা দূর করার উত্তম উপায়। আমার নিজস্ব একটি অভিজ্ঞতা আছে। এক সময়ে আমার সাঁতার কাটার খুব শখ ছিল। পানির মধ্যে দীর্ঘ সময় থাকলে মাথায় ব্যথা শুরু হয়ে যেত। দিল্লীতে একজন শিক্ষক পরামর্শ দিলেন পানিতে নেমে কিছুক্ষণ পরপর সাঁতার কাটিও।

প্রকৃতপক্ষে যখন দেহের নিম্নাংশ ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন তাপ মাথার

দিকে উঠতে থাকে। দ্বিতীয়ত নিম্নাংশ উষ্ণতা হারিয়ে ফেলে এবং মাথার অবস্থা আরো বেশী গরম হয়। এই বিভিন্নতার ফলে মাথার ব্যথা শুরু হয়। ওযুর সময় সর্বশেষে পা ধৌত করতে হয়। এইজন্য যদি মাথা ভিজিয়ে নেওয়া হয় তা হলে ভাল হয়।

কোন সরু বস্তু দিয়ে কানের ছিদ্র পরিষ্কার করতে চিকিৎসকরা নিষেধ করে থাকেন। কেননা এর ফলে কানের পাতলা পর্দা ফেটে যাওয়ার আশংকা থাকে। তাঁরা বলেন, কানের ময়লা প্রাকৃতিক নিয়মেই ছিদ্রের মুখ পর্যন্ত এসে যায়, যা হাতের অঙ্গুলি দ্বারা কোন ক্ষতি ছাড়াই সহজে বের করা যায়। ওযু করার সময় ভিজা অঙ্গুলি প্রত্যহ পাঁচ-ছ'বার কানের ছিদ্রে ফেরালে তাতে কান ময়লা থাকে না।[১]

গর্দান মোসেহ করার উপকারিতা হলো এর ঠান্ডার কারণে অলসতা, বিশেষ করে ভোরে যে নিদ্রার মাত্রা বেড়ে যায়, তা দূর করা যায়।

পা ধোয়া

গর্দান মোসেহ করার পর ডান হাতে পানি ঢেলে বাঁ হাতে প্রথমে ডান পা এরপর বাঁ পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করতে হয় এবং পা-এর অঙ্গুলির মধ্যে বাঁ হাতের অঙ্গুলির দ্বারা রগড়াতে হয়। তিনবার পানি ঢেলে এগুলো ভালভাবে ধৌত করতে হয়। হাত-পায়ের অঙ্গুলি খেলাল করার জন্য হুযুর (স.) জোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি হাত-পায়ের আঙ্গুল পানির দ্বারা খেলাল করবে না দোযখের আগুন দ্বারা তাকে খেলাল করানো হবে।"[২] ব্যাপার হলো, যদি উপর থেকে পানি ঢালা হয় এবং আঙ্গুলের ভিতর পরিষ্কার করা না হয়, তবে ঐ অংশে আরো বেশী ময়লা হয়ে যায়। আঙ্গুলের মধ্যে ময়লা জমে চর্মরোগ ও চুলকানী বেড়ে যায়। তখন কোন কোন সময় অঙ্গুলি গলে বা পচেও যায়। তখন এটা দোযখের জ্বালা হয়ে দাঁড়ায়।

---

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৬৪।

২. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, আবওয়াবে তাহারাত, পৃষ্ঠা নং ৭।

হ্যাঁ, যদি ভোরে ওযূ করে মোজা পরিধান করে এবং তা ফাটা না হয়, তাহলে সারাদিন পরিধান করার পর যখন অন্য নামায পড়ার জন্য ওযূ প্রয়োজন হয় তখন এটা খোলার দরকার নেই। শুধু হাত ভিজিয়ে এর উপর মোসেহ করলেই চলে।[১]

পা ধৌত করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ধুলাবালি দূর করা। মোজা ইত্যাদি ঐ সমস্ত থেকে পা-কে মুক্ত রাখে। মোজার উপর মোসেহ করা পা ধৌত করার একটি নিয়ম হিসেবে রাখা হয়েছে—যেন মানুষ এটা ভুলে না যায়।

উপরিউল্লিখিত নিয়মে যদি প্রত্যহ পাঁচবার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা হয়, তাহলে পাঁচবার গোসলের মতই হয়ে যায়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এ পদ্ধতি খুবই সহজ এবং খরচহীন। শিশুরাও এটা সহজেই শিখতে পারে। নামাযীরা তো এটা কোন কষ্টই মনে করে না।

ওযূর মধ্যে সতর্কতা

ওযূ করার সময় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব উত্তমরূপে ধৌত করতে হবে যেন ওযূর পর কোন অঙ্গই শুষ্ক না থাকে। এমনকি আংটি পরা থাকলেও এর নীচে ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে। হাত-পায়ের অঙ্গুলি খেলাল করা এবং গোড়ালী ধৌত করা প্রয়োজন। বলা হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ-ভাবে ওযূ করো। পূর্ণাঙ্গভাবে ওযূ করার অর্থ হলো পূর্ণ পরিষ্কার করে, শুধু পানি প্রবাহিত করানো নয়।[২] এ সতর্কতার উদ্দেশ্য হলো সামান্য অবহেলা বিরাট অবহেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়। ওযূ পর করার কিছু খেলেও ওযূ ভঙ্গ হয় না, এজন্যে শুধু কুল্লি করাই

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০০ ও ২০৪।

২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল উযূ, হাদীস নং ২০০ ও ২০৪।

যথেষ্ট।[১] পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচ্ছন্নতাই এর উদ্দেশ্য। নদীর কিনারে বসে ওযূ করা হলেও যতটুকু সম্ভব ওযূ ও গোসলে পানি কম খরচ করতে হয়।[২] পানির স্বল্পতার দরুন দু'বার এমনকি একবার ধৌত করলেও চলবে।[৩] হুযূর (স.) ওযূ সম্পর্কে বলেছেন, "উত্তমরূপে ওযূ কর, কারণ এতে তোমার হায়াত বৃদ্ধি পাবে।"

ওযূর নিয়মাবলী ও উপকারিতার বিষয়টি চিন্তা করলে দেখা যাবে, যদি সঠিকভাবে এবং নিয়মানুযায়ী ওযূ করা হয় তাহলে স্বাস্থ্যের উপর এর কত সুন্দর প্রভাব পড়ে! অধিকন্তু সুন্দর স্বাস্থ্যই দীর্ঘ জীবন লাভের একমাত্র উপায়।

একটি অমূল্য সম্পদের অপচয়

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট নিয়ামত বা সম্পদের মধ্যে পানি এমন একটি দান বা নিয়ামত যে, এর চেয়ে শীঘ্র পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার মত এবং সহজলভ্য দুনিয়াতে অন্য কোন বস্তু নেই। কিন্তু সৃষ্টির সেরা মানুষই এর সবচেয়ে বেশী অনাদর করে এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খরচ এমনকি অপচয়ও করে থাকে। ইউরোপের অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যহ এক ব্যক্তির জন্য গোসল, ধোয়ামোছা এবং পান করার জন্য কমপক্ষে পঁচিশ গ্যালন অর্থাৎ প্রায় তিন মণ পানির প্রয়োজন। এশিয়া ও আফ্রিকার বিজ্ঞানীরা কোন চিন্তা ছাড়াই তাঁদের সাথে একই ধ্বনিতে সুর মিলিয়েছেন। পাশ্চাত্যদেশে পানির প্রবাহের কারণে তাঁরা এ অনুমান করে থাকেন। কিন্তু শুষ্ক এলাকায় পানির সংগ্রহ যে কত কষ্টকর, তার প্রতি এঁরা বেখেয়াল। গোসল বা ধৌত করা দূরের কথা, কোন কোন দেশে পান করার জন্য বহুদূর থেকে মাথায় করে পানি সরবরাহ করতে হয় অথবা ভারবাহী পশু দ্বারা বহন করে আনতে হয়। কোন কোন সময় সপ্তাহ, এমনকি মাস পর্যন্ত তাদের গোসল করা ও ধৌত

১. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল উযূ, হাদীস নং ১৬৫ ও ১৪৪।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল উযূ, হাদীস নং ১৯৯ ও কিতাবুল গুসল, হাদীস নং ২৪৭-২৪৮।
৩. ঐ, হাদীস নং ১৫৮, ১৫৯ ও ১৬০।

করা ভাগ্যে জোটে না। এরপর পৃথিবীর যে সমস্ত এলাকায় পানির পরিমাণ বেশী এবং সহজলভ্য, সেখানেও কোন কোন সময় পানির তীব্র সংকট দেখা-দেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় পানির স্বল্পতা ও আধিক্যের ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য কতটুকু পানির প্রয়োজন, তা কোন মযহাব বা ধর্ম অথবা কোন স্বাস্থ্যবিদ বলেন নি। কিন্তু ইসলাম এই দৃষ্টিকোণ থেকেও মানুষকে সঠিক নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং পানির স্বল্পতার সময় সবচেয়ে কম পানি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবার ধৌত করার পরিবর্তে দু'বার' এমনকি একবার ধুলেই চলে, ওযূ ও গোসলে পানির অপচয় করা থেকেও নিষেধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লণ্ডন ও অন্যান্য বড় বড় শহরে পানি সরবরাহের কেন্দ্রগুলোতে যখন বোমা হামলার আশংকা দেখা দেয়, তখন পানিও রেশনে দেওয়া হতো। ইংরেজরা যে সিঙ্গাপুর নিয়ে গৌরব করে এবং যে শহরের চতুর্দিকে সমুদ্র বেষ্টিত, তাও ঐ একই সংকটের সম্মুখীন হয়। এদিক দিয়ে পানি সরবরাহের স্থান ও কেন্দ্র জাপানীরা অধিকার করে নেয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রণে ভঙ্গ দেয়।

কলিকাতা দুনিয়ার অত্যন্ত উন্নত ও উর্বর এলাকায় অবস্থিত এবং সেখানে মাটির কয়েক ফুট নীচেই পানি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ ও তাদের মিত্রদের পূর্বাঞ্চলের ঘাঁটি ছিল এটা। এ শহর ও শহরতলীতে নয় লাখ সৈন্য তাঁবু ফেলেছিল। ফলে শহরের বাসিন্দা পঁয়তাল্লিশ লাখ পর্যন্ত পৌঁছল। পানি সরবরাহের যে সমস্ত কেন্দ্র প্রথমে শহরে পানি সরবরাহের জন্য যথেষ্ট ছিল, এখন বাসিন্দাদের সংখ্যাধিক্যের ফলে পানি সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটল। আমি ঐ সময় এক হোটেলে অবস্থান করছিলাম। প্রত্যহ সৈন্যদের চাহিদা মেটানোর পর শহরের অন্যান্য জনগণের জন্য পানি সরবরাহ করা হতো। মানুষ সকাল ৭-৮ টা পর্যন্ত গরমের জন্য হৈ চৈ করতে থাকে। ফ্লাশ ময়লায় পূর্ণ হয়ে যেত। হাত-মুখ ধোয়া তো দূরের কথা, সকালে পান করার মত পানিও মিলত না।

কিন্তু ইউরোপীয় এবং তাদের সভ্যতার ধারক-বাহকেরা, হয় তারা নদী-মাতৃক দেশে বাস করুক বা উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলে বাস করুক, যেখানে পান

করার জন্য বহু কষ্টে পানি সরবরাহ করতে হয়, সেখানেও তারা পানির অপচয় করে। পানির অপচয়ের মাধ্যমে তারা অন্যান্য লোকের উপর জুলুম করে থাকে।

তাদের হাত-মুখ ধৌত করা ও গোসল করার পদ্ধতি হলো বেশী বেশী পানি অপচয় করে। এটা পাক-পবিত্রতার জন্য ইসলামী নিয়ম ও স্বাস্থ্যবিধির বহির্ভূত। একটা খোলা পাত্রে তিন-চার সের পানি নিয়ে সাবান দ্বারা এর উপরই মুখ ধৌত করে এবং তোয়ালে দ্বারা পরিষ্কার করে। কুল্লি করা, নাকে পানি দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, এভাবে মুখ ধৌত করার জন্য এক ব্যক্তির ছয়-সাত সের পানির প্রয়োজন হয়।

এরা টবের উপর বসে গোসল করে। গোসলের সময় টবে পাঁচ-ছয় ঘড়া পানি ঢেলে নেয়। পাবিত্রতা ও ইস্তিন্জা করা ছাড়াই টবে বসে সাবান মেখে দু'তিনবার ঐ পানিতে গড়াগড়ি দিয়ে থাকে অথবা শরীরে পানি ঢেলে দেয়। পরে বাইরে এসে তোয়ালে দ্বারা দেহ পরিষ্কার করে নেয়। কোন সময় প্রথমে একবার পানি ফেলে দিয়ে দ্বিতীয়বার পানি ভর্তি করা হয় এবং এর উপর বসে শরীর ধৌত করা হয়। পবিত্রতা অর্জন না করার ফলে শরীরের ময়লা ও নোংরা বস্তু পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয় না। সাবানের কার্যকারিতা টবের পানিতেই থেকে যায়। এর পর কাপড় ও পাত্র ধোয়া এবং পানি পান করা ইত্যাদির জন্য এক ব্যক্তির প্রায় প্রত্যহ পঁচিশ গ্যালন পানির প্রয়োজন হয়।

কিন্তু গোসল করার ইসলামী বিধান হলো সবচেয়ে কম পানি খরচ করে উত্তমরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা। বস্তুত ইউরোপীয়দের পানির পরিমাণের এক-পঞ্চমাংশ দ্বারাই উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান ছাড়াই একটি পরিবারের জন্য এতটুকু পানি যথেষ্ট, যা একজন ইউরোপীয়ের জন্য প্রত্যহ প্রয়োজন হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার অনুপম নিয়মাবলী

ইসলামী বিধান অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জনের পর কতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রতিক্রিয়া বাকী থাকে বা কতক্ষণ পর্যন্ত ওযু বাকী থাকে, তা নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

মলমূত্র ত্যাগের রাস্তা দিয়ে যখন কিছু বের হয় অথবা বমি আসে, তখন ওযু ভেঙ্গে যায়। কিন্তু বায়ু নিষ্কাশিত হলে বা শরীরের কোন অংশ থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হলে শুধু ওযু ভঙ্গ হয়। এজন্যে ইসতিন্জা করার প্রয়োজন হয় না।

মলমূত্র সামান্য পরিমাণে বের হলেও ইসতিন্জা এবং ওযু করতে হয়। আবার স্বপ্নদোষ বা নারীস্পর্শের কারণে অথবা হায়েয বা নিফাসের রক্ত বের হলে ইসতিন্জা ও ওযুর সাথে গোসলও ওয়াজিব হয়।[১]

এখানে ওযু ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে দ্বিতীয়বার ওযু করার হিকমত ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, মলমূত্র ত্যাগের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে এবং বমি—যা কিছু প্রকৃতপক্ষে নাপাক ও নোংরা—বের হলে ওযু ভেঙ্গে যায়। অতঃপর শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার জন্য সংশিষ্ট অঙ্গ এবং হাত-মুখ ধৌত করার প্রয়োজন হয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রত্যেক ধর্মেই ইবাদতের জন্য শরীর ও পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার নির্দেশ আছে। কিন্তু ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মেই এরূপ বিস্তারিত বর্ণনা ও জোর নির্দেশ দেওয়া হয়নি; যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলো একটু কষ্টকর মনে হয়।

বাস্তবিক পক্ষে সামান্য পরিমাণ অপবিত্র ও নোংরা বস্তু থেকে অসাবধানতা ক্রমশ বেশী পরিমাণ নোংরা বস্তু ও নাপাক হতেও বেপরওয়া করে দেয়। এ কারণেই ইসলামী বিধানমতে এক ফোঁটা প্রস্রাব বা সামান্য পরিমাণ পায়খানা শরীর এবং পোশাক-পরিচ্ছদ অপবিত্র করার জন্য যথেষ্ট। স্বাস্থ্যরক্ষার এটাই অমূল্য বিধান।

অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ে, বিশেষ করে ইউরোপের দেশসমূহের গির্জাগুলোতে অত্যন্ত মূল্যবান পোশাক পরিধান করে এবং সুগন্ধযুক্ত আতর ব্যবহার করে জাঁকজমকপূর্ণ চেয়ারে অনেককে বসতে দেখা যায়।

---

১. এ মাস'আলা সম্পর্কে সমস্ত কিতাব, হাদীস এবং ফিকাহর কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ সমস্ত মাস'আলা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে।

তাদের রসাত্মক গানের সুরে আপনাকে আত্মহারা করে ফেলবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সুগন্ধের সাথে দুর্গন্ধের মিশ্রণে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে সংস্কৃতিমনা লোকের মাঝেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

উপস্থিত প্রায় সকলেই এ অপসন্দনীয় কাজটি করে থাকে এবং মনে মনে ভাবে, সে ছাড়া আর কেউ হয়ত এরূপ করেনি এবং তার পার্শ্বে উপবেশনকারী এ কাজটি টেরও পায়নি। ইউরোপের বাসিন্দারা ঢেকুর তোলায় অত্যন্ত অপমানবোধ করে কিন্তু দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের মত বায়ু বের হওয়া অপসন্দ করে না। এ কারণেই রবিবার দিন তারা বেশী পরিমাণে গির্জায় গিয়ে এ কাজ করতে থাকে। কোন কোন উপাসনাকারী এ অসহনীয় অবস্থা দেখে শীঘ্র করে বাইরে আসার চেষ্টা করে।

পক্ষান্তরে গ্রামে ঘাস-পাতার ছাউনী দিয়ে তৈরী কোন কাঁচা মসজিদে উপস্থিত হলে দেখা যাবে অধিকাংশ গ্রামের দরিদ্র লোকই পুরাতন কাপড় পরিধান করে নামায পড়ে কিন্তু সেখানে এ ধরনের কোন অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। যদি সামর্থ্য থাকে তবে খুশবু ব্যবহার করার জন্য নামাযীদের প্রতি নির্দেশ আছে। একজনে সুগন্ধি ব্যবহার করলে সারা মসজিদই ঘ্রাণে ভরপুর হয়ে যায়।

হুযুর (স.) বলেছেন, 'হদ্‌সে আসগর' অর্থাৎ বায়ু বের হলে এর দুর্গন্ধ দ্বারা মসজিদে নামাযীদের কষ্ট হয়।[১] একটি সাধারণ নির্দেশ দিয়ে মহানবী (স.) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন!

মলমূত্র থেকে সতর্ক থাকা ছাড়াও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা সম্পর্কে এ ক্ষুদ্রতম নির্দেশকে মুসলিম বিশ্ব এরূপভাবে পালন করে, যা দেখে হতভম্ব হতে হয়। একজন মুসলমান শিশুও এর গুরুত্ব বোঝে এবং এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। নিয়মিত নামাযীদের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই বায়ু বের হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস গড়ে উঠে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণের এটা একটা অদ্ভুত নিয়ম।

---

১. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ৪৬৩।

শীতকালে নামাযীরা প্রায়ই এক ওযূ দ্বারা দু'তিন ওয়াক্ত নামায আদায় করে থাকেন। আমার এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি দেড়টা-দুটোর পর দ্বিপ্রহরে ওযূ করে প্রায়ই চার ওয়াক্তের নামায রাত আট-নয়টা পর্যন্ত সময়ে আদায় করতেন।

বাহ্যত এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে এটা যথেষ্ট উপকারী ও ফলদায়ক। মুসলমানদের মধ্যে এর অনুসরণের প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, 'ইবাদত এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও পার্থিব জগতের কোন অনুষ্ঠানে বায়ু বের হওয়াকে অপমান বোধ করে থাকে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামী বিধান অন্যান্য বিধান থেকে পৃথক। জনসভায় লোকের ভীড়ের কারণে প্রথমেই কিছুটা আবহাওয়া দূষিত হয়ে থাকে। বায়ু বের হওয়ার ফলে তা আরো বেশী দূষিত হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, পাশ্চাত্যের লোকেরা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে এত জ্ঞান অর্জন করা সত্ত্বেও এই সাধারণ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। কোন্ মুখে ইসলামের শত্রুরা এটা বলে থাকে যে, মহানবী (স.) ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের থেকে সব কিছুই শিখেছিলেন - এটাও কি তাদের নীতি ?

হীনমন্যতাবোধের একটি ঘটনা

এক মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-জনকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইউরোপীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং ডাক্তারদের পরামর্শে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন ভাষায় সিনেমা দেখাবার জন্য স্লাইড তৈরী করল। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রত্যহ কতবার ও কিভাবে হাত-মুখ ধৌত করতে হয়, তা শেখানো।

আফসোসের বিষয়, নির্মল পানি প্রবাহিত নদীর কিনারায় পেছন ফিরে বসে নিজের অজ্ঞতা ও অমনোযোগিতার ফলে হাতে পেয়ালা নিয়ে তৃষ্ণার্তের মত এমন এক ব্যক্তির নিকট পানি ভিক্ষা চায়, যার নিকট মাত্র এক মশক (পাত্র) দূষিত পানি মজুদ আছে।

একজন মুসলমান শিশুও এ সম্পর্কে জ্ঞাত আছে যে, নামাযের জন্য প্রত্যহ পাঁচবার কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা ছাড়াও ঐ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গও

ধৌত করতে হয়, যা বাইরের ধুলাবালি দ্বারা ময়লাযুক্ত হয়। এর সাথে গলা, নাক, কান এবং চোখও ধৌত করতে হয়।

এছাড়া মুসলিম সমাজের সাধারণ অশিক্ষিত মহিলারাও আহারের পর এবং মলমূত্র ত্যাগের পর শিশুদেরকে হাত ধৌত করা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। দরিদ্র লোকেরা প্রত্যহ কমপক্ষে দু'বার এবং ধনী লোকেরা চারবার তা করে থাকে। এভাবে নামাযী মুসলমান প্রত্যহ পনের-বিশবার হাত ধৌত করে থাকে, যার জন্য সে কোন অসুবিধা মনে করে না।

ইসলামী সমাজের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার চেয়ে উত্তম কি নিয়মাবলী মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ পেলেন যা জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন মনে করলেন? ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বিমুখতার ফলেই তাঁরা এ রূপ চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। এছাড়া এটা উচ্চ পদে আসীন নব্য শিক্ষিত মুসলমানদের জ্ঞানের অপ্রতুলতারই ফলশ্রুতি।

মুসলিম রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠানের উচিত ছিল হাত-মুখ ইত্যাদি ধৌত করার ইসলামী নিয়মাবলীর স্লাইড তৈরী করে পাশ্চাত্য দেশে স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যাপারে এর উপকারিতা বর্ণনা করা এবং ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

দাঁতের যত্ন

বিভিন্ন ধর্মে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলী দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই, এমন কি দাঁতের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিতও নেই। হিন্দু সমাজ মুসলমানদের দেখে মিসওয়াক বা দাঁতন ব্যবহার শুরু করে, এখন এটা তাঁদের প্রাত্যহিক অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য বলে তারা মনে করে। এমনকি তারা এখন দাঁতের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে মুসলমানদের চেয়েও অগ্রগামী।

ইউরোপীয় জাতি কিছুকাল পূর্বে দাঁতের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কিছুই জানত না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এর উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে

তাদের ধারণা জন্মে। অতঃপর ধীরে ধীরে দাঁতের যত্ন এবং দাঁত সংযোজন তাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তারগণ এর উপর অনেক বই লিখেছেন। বিভিন্ন আরোগ্য নিকেতন, স্কুল ও কলেজ খোলা হয়েছে যেখানে দন্তরোগের চিকিৎসা করা হয় এবং এগুলো রক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে স্কুল-কলেজের ছাত্র ও সেনাবাহিনী লোকদের দাঁত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিদর্শন করানো অত্যন্ত প্রয়োজন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দাঁতের পরিচ্ছন্নতা ও ব্রাশ করার পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক বই প্রকাশ করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকার দাঁতের মাজন বিক্রি হচ্ছে। দাঁত, মাড়ি এবং গলার রোগ সম্পর্কে গবেষণা চলছে। এর নিরোধের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হচ্ছে।

বর্তমানে ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে দাঁতের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এতদ্‌সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মাজন, ব্রাশ ইত্যাদি অধিক প্রসার লাভ করেছে। এমনকি ব্রাশের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, শক্ত-নরম ইত্যাদি মানব দেহে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এরও খতিয়ান করে নিয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে মাজন ব্রাশ সবচেয়ে কার্যকরী এবং উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়ায় তৈরীর জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা চলছে। সারা বিশ্বে প্রতি বৎসর লাখ লাখ টাকার ব্রাশ ও মাজন বিক্রি হচ্ছে। এমন কোন পত্রিকা নেই যাতে এগুলোর বিজ্ঞপ্তি না থাকে। এখন তো আমেরিকায় বিদ্যুতের ব্রাশ ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মকালে জাপানে দাঁতের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। এতে আলোচনা ও বক্তৃতা ছাড়া রাজধানী টোকিওর ১৫০ টি স্কুল এবং ১৭ টি কিণ্ডারগার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এতে দাঁত পরিষ্কার করার কোন্‌টা উত্তম পন্থা, তা দেখানো হয়। ঐ শিশুদের হাতে একটি করে ব্রাশ ছিল।

দন্তরোগের ফলে মুখ, মাড়ি এবং গলায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এমনকি মানব দেহের প্রধান অঙ্গ পাকস্থলীতেও এর প্রভাব দেখা দেয়। ফলে বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হতে হয়। অনেক সময় দাঁতের অসুবিধার ফলে ভীষণ কষ্টদায়ক পীড়ার সৃষ্টি হয়।

অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশীয় চিকিৎসাবিদ দাবি করে থাকেন যে, দাঁতের যত্ন এবং পরিচ্ছন্নতার বর্তমান পদ্ধতি তাঁদের চেষ্টা ও গবেষণার

ফল। এটা মানব জাতির সেবা ও নিজেদের বিরাট কৃতিত্ব বলে তারা দাবি করে। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে যখন ইউরোপের জনগণ অভদ্র ও অনুন্নত জাতি হিসেবে গণ্য হতো তখন আরব মরুভূমিতে আল্লাহ্‌র একজন প্রিয় বান্দা আবির্ভূত হলেন। তিনি এর উপকারিতা এবং মানব জাতির স্বাস্থ্যের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিজেও এর উপর পূর্ণ আমল করে মানব সমাজে বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় তারা ইসলামের সাথে শত্রুতা তোষণ করে এটা মেনে নিতে রাযী নয়; বরং এটা তাদের গবেষণার ফল বলে দাবি করতে সর্বদা আগ্রহী। এটা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

মহানবী (স.) কয়েকটি বাক্যের দ্বারা দাঁতের যত্ন ও মুখের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন, "তোমাদের মুখমণ্ডল পরিষ্কার রাখো।" এত সাধারণ একটা নিয়ম—যার মধ্যে দাঁতের মাড়ি, গলা ইত্যাদি গণ্য। অতঃপর তিনি বলেছেন, "আমার উম্মতের উপর যদি এটা কষ্ট না হতো তা হলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মিসওয়াক করা ফরয করে দিতাম।"[১] তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, 'আল্লাহ্‌তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে মিসওয়াক করার এত তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে, মনে হতো এটা ফরয করে দেওয়া হবে।"[২] তিনি আরো বলেছেন, "বেশী বেশী মিসওয়াক করো।"

হুযুর (স.) নিজেই এটার উপর কঠোর আমল করতেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিতেন। তাঁর অনুসারীরা এখনো এটা পালন করে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওযুর সময়, এমনকি শেষরাতে যখন হুযুর (স.) তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ওযু করতেন তখনও মিসওয়াক

---

১. তাজরীদে বুখারী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৬০ এবং মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৩৯।

২. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, বাবুত তাহারাত, পৃষ্ঠা নং ৭।

৩. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৪৮।

করতেন।[১] ভ্রমণের সময় এবং বাড়িতে তাঁর বালিশের নীচে সর্বদা মিসওয়াক থাকত।[২] মিসওয়াক ব্যবহারে তিনি এরূপ অভ্যস্ত ছিলেন যে, ইন্তিকালের পূর্বে যখন তিনি অসুস্থতার ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তখন এক সাহাবী হযরত আবদুর রহমান বিন আবুবকর মিসওয়াক হাতে হুযুর (স.)-এর খিদমতে হাযির হলেন। তিনি মিসওয়াকটির প্রতি গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) উপলব্ধি করলেন যে, তিনি মিসওয়াক ব্যবহার করতে চাচ্ছেন, তাই আবদুর রহমান থেকে নিয়ে মিসওয়াকটি দাঁত দ্বারা নরম করলেন। হুযুর (স.) মিসওয়াক নিয়ে এমনিভাবে ব্যবহার করলেন যেমন সুস্থ অবস্থায় করতেন।[৩]

সর্বদা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তাহাজ্জুদের সময় মিসওয়াক ব্যবহারের ফলেই হুযুর (স.)-এর শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর দাঁত খুব শক্ত, নিরাপদ এবং মুক্তার মত উজ্জ্বল ছিল। ওহুদ যুদ্ধে যে দন্ত মুবারক ভেঙ্গে গিয়েছিল এছাড়া তাঁর আর কোন দাঁত পড়েনি।

এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, তাঁর অনুসারীরা দাঁতের পরিচ্ছন্নতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই হাদীস ও ফিকাহ্‌র কিতাবে মিসওয়াক সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় প্রণীত হয়েছে।

দাঁত পরিষ্কার করার জন্য হুযুর (স.) যে পন্থা অবলম্বন করতেন তা বর্তমান যুগের নিয়মাবলীর চেয়ে উত্তম ও কম ব্যয়বহুল। তিনি জাল গাছের মূলের মিসওয়াক দিয়ে দাঁতের বাইরে, ভিতরের মাড়ি, তালু, জিহ্‌বা এবং কণ্ঠনালী পরিষ্কার করতেন। কণ্ঠনালীতে মিসওয়াক করার সময় তিনি উহ উহ করতেন। মনে হতো তিনি বমি করবেন।[৪] হুযুর (স.) দাঁতের উপরে-নীচে মিসওয়াক করতেন। ফলে দাঁতের গোড়ালী মাড়ি এবং দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাদ্যদ্রব্য বের হয়ে যেত।

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৪১।
২. আবু দাউদ।
৩. তাজরীদে বুখারী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫২৬।
৪. সহীহ্‌ বুখারী, কিতাবুল উযু, হাদীস নং ২৪১।

এটাই ইসলামী ফিকাহ গ্রন্থে লিখা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের ডাক্তার-গণ দাবি করেন, ব্রাশ দ্বারা দাঁতের উপরে, নীচে ও ভিতরে পরিচ্ছন্ন করার নিয়মাবলী তাঁদের আবিষ্কারের ফল!

এই একটি কার্যের দ্বারা দাঁতের মাড়ি, তালু, জিহ্বা ও গলদেশ পরিষ্কার হয় বরং এমন কি গলদেশে রাতে জমাকৃত কাশি, কফ ইত্যাদিও বের হয়। নাকের ময়লা সহজেই বের হয়ে আসে। যখন গলদেশে মিসওয়াক করা হয় তখন চোখ থেকে পানি বের হয়, ফলে চোখের ময়লাও নরম হয়ে যায়। যখন মুখমণ্ডলে পানি দেওয়া হয় এবং ঐ পানি চোখে প্রবেশ করে, তখন পানির সঙ্গে মিশে চোখের ময়লাও বের হয়ে আসে। ওযুর সময় যখন উঃ উঃ করা হয় তখন পাকস্থলীর উপর চাপ পড়ে। ফলে এগুলো এক প্রকার ব্যায়ামের কাজ করে।

এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, গলদেশে মিসওয়াক করার উত্তম সময় হলো ভোরবেলা। কেননা এ সময় পাকস্থলী শূন্য থাকে। দিনের অন্য সময় যখন পাকস্থলীতে খাদ্য থাকে, কাজেই তখন গলদেশে মিস-ওয়াক করলে বমি হওয়ার আশংকা থাকে।

ওযুর বর্ণনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হাত-মুখ ধৌত করা এবং মিসওয়াক করার ইসলামী বিধানে দাঁত, মুখ, গলা এবং চোখের বিভিন্ন রোগের উত্তম প্রতিষেধক। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, দন্তরোগে পাকস্থলীতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যার ফলে বেশ কিছু রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। তাহলে এটাও সঠিক যে, নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহারে দাঁত, মুখ, গলা, নাক এবং চোখের রোগ ছাড়াও অন্যান্য রোগ থেকে বেঁচে থাকার মোক্ষম উপায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্রাশ করা এবং মাজন ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। তবে ব্রাশের লোম কিছুটা শক্ত হওয়ার ফলে গলদেশে ব্রাশ করলে যখম সৃষ্টি হতে পারে এবং মাজনের কিছু অংশ ভিতরে প্রবেশ করে। কোন কোন মাজন এরূপ আছে যা পাকস্থলীর জন্য খুবই ক্ষতিকর। ব্রাশ দ্বারা যদিও দাঁত পরিষ্কার হয় কিন্তু এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর লোমগুলো ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এরপর এটা ব্যবহারের ফলে দাঁত দুর্বল হয়ে যায়।

অধিকন্তু এ বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত যে, অনুন্নত এলাকার জনগণ, বিশেষত গ্রামে বসবাসকারী লোকের পক্ষে ব্রাশ বা টুথপেস্ট ক্রয় করা কষ্টসাধ্য। তাই এটা সর্বস্তরের লোকই গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। বিভিন্ন প্রকার গাছের ডাল বা মাথা মিসওয়াকের জন্য তাদের সহজেই মিলে যা শহরবাসীদের খুব কষ্টেই হস্তগত হয়। সুতরাং তারা ব্রাশ বা মাজন বাধ্য হয়ে খরিদ করে। অবশ্য এগুলো খরিদ করার ক্ষমতা তাদের আছেও।

অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমরা এটা বলতে পারি যে, ব্রাশ এবং মাজনের চেয়ে কোন কোন গাছের ডাল বা শিকড় দাঁতের জন্য বেশী উপকারী ও কার্যকর। যদি শহরের লোকেরা সাধারণভাবে এর ব্যবহার শুরু করে তাহলে শহরে এ সবের আমদানী বেড়ে যাবে। হিন্দুস্থানের বড় বড় শহর, দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যেহেতু জনগণ গাছের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করতে অভ্যস্ত, তাই কোন কোন দরিদ্র লোক প্রত্যহ জঙ্গল থেকে বিভিন্ন গাছের ডাল কেটে শহরে নিয়ে এসে বিক্রি করে। এটা অনেকে জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু এমন গাছ আছে যেগুলোর কাঁচা ডাল বা বাকল অথবা মূল আঁশমুক্ত হয়। যেমন নিম গাছ বা বাবলা গাছ, প্রভৃতি গাছের ডাল কিছুক্ষণ চিবালে আঁশমুক্ত হয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে জালের মূল সবচেয়ে উপকারী ও কার্যকর। এটা কাঁচা বা শুকনা হোক সর্বাবস্থায় খুব নরম হয়। সাধারণত এটা শুকিয়ে ব্যবহার করা হয়। তাই শহরেও এটা সহজেই আমদানী করা যায়। যে সমস্ত দেশে এর প্রচলন খুব বেশী, সেখানে বাজারেও এগুলো পাওয়া যায়। দাঁতে ব্যথা হলে জালের পাতা পানিতে গরম করে ঐ পানি দিয়ে কুল্লি করা হয়।

যে গাছের পাতায় এত উপকারিতা, এর মূল কত বেশী উপকারী হবে তা সহজেই অনুমেয়। উপকারিতার দিক দিয়ে দ্বিতীয় হলো বাবলা গাছের কাঁচা ডাল, তবে এটা খুব সহজে মেলে না। বিশেষ করে শহরে পাওয়া তো খুবই কঠিন। এটার আঁশ খুব শক্ত। এর রস বা লালা পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে তা শোষণ করে নেয়। বাবলা গাছের মিসওয়াক দ্বারা আমি নিজেই উপকৃত হয়েছি। এটা সর্বদা ব্যবহার করার ফলে নড়াদাঁতও শক্ত হয়।

তাছাড়া উপরিউল্লিখিত যে কোন গাছের তৈরী মিসওয়াক ব্রাশ বা মাজনের চেয়ে অনেক দিক থেকে উপকারী। দাঁতের প্রাকৃতিক সৃষ্টি এবং মাড়ির গোলাকার হওয়ার ফলে ব্রাশের পশম দাঁতের বাইরে মোটামুটি কাজ করে কিন্তু ভিতরের দিকে জিহ্বার গোড়া ও গলদেশে তেমন কাজ করে না। কেউ কেউ জিহ্বা পরিষ্কার করার জন্য ধাতু অথবা অন্য কিছুর তৈরী পাতলা পাতি ব্যবহার করে। বস্তুত বর্তমান যুগে দাঁত পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশ, মাজন, পাতি প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। এগুলোতে খরচও বেশী পড়ে অথচ দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই এগুলো খরিদ করতে অক্ষম।

পক্ষান্তরে সামান্য খরচ বা বিনা খরচেই কোন গাছের ডাল বা গোড়া দিয়ে সহজেই দাঁত, মাড়ি, তালু, জিহ্বা ও গলদেশ পরিষ্কার করা যায়। এরূপ মিসওয়াকের নরম আঁশ দাঁতের গোলাকার চক্রের ভিতর ও বাইরের ফাঁকে সহজেই ঢোকে। জিহ্বার গোড়া এবং গলদেশের ভিতর পূর্ণভাবে পরিচ্ছন্ন করে। এতে কোন অসুবিধাই হয় না। তাছাড়া এ ধরনের মিসওয়াকের ভিতর প্রকৃতির সৃষ্ট গুণাবলী থাকাতে মাজনের কাজও হয়।

বর্তমান যুগের সভ্য ও উন্নত জাতির মধ্যে দাঁত রক্ষার জন্য কিরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয় নিম্নের একটা ঘটনা দ্বারা তা উপলব্ধি করা যাবেঃ

বৃটেনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক রিপোর্টে বলা হয় যে, স্বাস্থ্য বিভাগের অধীন দন্ত চিকিৎসকেরা গত ১৯৫৭ সালে মানুষের এক কোটি পনর লাখ দাঁত উত্তোলন করে। পঞ্চাশ লাখ দাঁত বসানোর ব্যবস্থা করে। সাড়ে তের লাখ দাঁতের সীট আমদানী করা হয়। তেত্রিশ লাখ মানুষের মাড়ির চিকিৎসা করা হয়।

বৃটেনের স্বাস্থ্য বিভাগ এ ব্যাপারে গত বৎসর আটান্ন কোটি পঞ্চাশ লাখ পাউন্ড ব্যয় করে, যা ১৯৫৬ সালের সারা দেশের উৎপন্নের চেয়ে পাঁচ কোটি পাউন্ড বেশী ছিল।[১]

বর্তমান আন্তর্জাতিক ও সরকারীভাবে মুদ্রার মূল্য অনুযায়ী এটা প্রায় নয় কোটি টাকার পরিমাণ হয় এবং শুধু দাঁত তুলে ফেলা, সংযোজন

১. বার্তা সংস্থা 'স্টার'; ২৬ আগস্ট, ১৯৫৮। মূল গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৬২ খৃ. —অনুবাদক।

করা এবং মাড়ির চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য বৃটেন প্রতি বছর প্রায় ৩২ কোটি টাকা সরকারীভাবে খরচ করে। বিত্তবান লোকেরা যা খরচ করে, তা এর বাইরে। এর সাথে বিভিন্ন প্রকার মাজন ও ব্রাশ ক্রয় করে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে।

এই একটি মাত্র উদাহরণের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় যে, পাশ্চাত্যের লোকেরা দাঁতের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি কত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রতি বৎসর সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ ব্যাপারে লাখো কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। কিন্তু এত প্রচুর অর্থ ব্যয় করা বিত্তশালী লোকদের দ্বারাই সম্ভব। অনুন্নত ও দরিদ্র জনগণের দ্বারা এটা কখনই সম্ভব নয়; বরং তারা ঐ সহজ ও কম ব্যয়ের পন্থা গ্রহণ করতে পারে যা মহানবী (স.) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে বিশ্বের বুকে জনগণের সামনে পেশ করেছেন। পাশ্চাত্যের আধুনিক পদ্ধতির চেয়ে এটা অনেক বেশী ফলপ্রসূ। দেখা যায়, আরবের নজদবাসী জনগণের দাঁত খুব সুন্দর ও শক্ত। কারণ তারা নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহার করে।

১৯৬০ সনের ১৯শে আগস্ট তারিখের এক খবরে জানা যায়, সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র দাঁতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ব্যাপকভাবে প্রচলন করার জন্য ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে ব্রাশ ও মাজন বিতরণ করার ব্যবস্থা করছে। কেননা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে দাঁতের পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই এ উদ্দেশ্যে আটাশ হাজার ডলার পৃথক বাজেট করা হয়েছে। প্রথম ছাত্রদের মধ্যে, অতঃপর জনগণের মাঝে এর প্রচলন করা হবে।"

এটা পড়ে আমাদের অত্যন্ত অনুতাপ হলো, কেননা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এ পদ্ধতি আমরা আরবদের থেকে শিখেছি। আজ আবার ইউরোপবাসীদের কাছ থেকে শিখেছি। অথচ নিজের পদ্ধতি ভুলে আজ লাখো লাখো টাকা খরচ করছি। প্রবাদ আছে, "ঘরে গঙ্গা প্রবাহিত, আর তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।" ইসলাম কত সহজ ও কম ব্যয়ের পদ্ধতি শিখিয়েছে!

এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, দাঁত যত ভালো, নিরোগ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, মানুষ ততই বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। মহানবী (স.) প্রত্যহ পাঁচবার এমনকি ছয় সাতবারও মিসওয়াক করতেন এবং এর জন্য নির্দেশ দিতেন। যদি পাঁচ ওয়াক্ত দু'তিন মিনিট করে ব্যয় করা হয়

তাহলে দশ-পনের মিনিট হয়ে যায়। কিন্তু একবারে এ কাজে এত সময় ব্যয় করা বেশ কষ্টকর কিন্তু বিভিন্ন সময়ে স্বল্পক্ষণের জন্য এটা করায় তেমন অসুবিধা হয় না। বিশেষত একবারে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মিসওয়াক বা ব্রাশ করা হলে মাড়ি ক্ষত হয়ে যায়।

কিন্তু ইসলামের এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে সবচেয়ে উপকার হলো এই যে, মানুষ দিনে যতবার পানাহার করে, ততবার বা এর বেশী মিসওয়াক দ্বারা স্বল্প সময়ের জন্য দাঁত পরিষ্কার করে তবে কখনো দাঁত নষ্ট হতে পারে না। কখনো কোন খাদ্যের টুকরো দাঁতের ফাঁকে বা মাটিতে আটকে থাকতে পারে না। ঐ পদ্ধতি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কত উপকারী ও স্বাস্থ্যসম্মত।

ইসলামী ফিকাহ গ্রন্থে মিসওয়াক ও এর ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ—এটা ব্যবহারের পদ্ধতি সবই বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এটা বর্ণনা করেছি যে, দাঁতের উপরে-নীচে মিসওয়াক করতে হবে। তাহলে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আঁশ পেঁাছে খাদ্যের ক্ষুদ্রাংশ বের করবে এবং মুখ পূর্ণভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

মিসওয়াক ধরার নিয়ম হলো, আঁশের দিকে সামান্য ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং এর নিকটবর্তী তিন অঙ্গুলি দিয়ে দাবিয়ে পঞ্চম অঙ্গুলি এর পেছনে রাখতে হবে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী মিসওয়াক কমপক্ষে দৈর্ঘ্যে ছয়-সাত ইঞ্চি হওয়া উচিত। এ পদ্ধতি দাঁতের পরিচ্ছন্নতার জন্য অত্যন্ত উপকারী।

নিয়মানুযায়ী প্রত্যহ মিসওয়াক ব্যবহারকারী লোকের দাঁত খুব কম রোগাক্রান্ত হয়। তুলনামূলকভাবে ব্রাশ এবং মাজন ব্যবহারকারীর চেয়ে গাছের তাজা ডাল, বাকল বা মূল মিসওয়াক হিসেবে ব্যবহারকারীর দাঁত বেশী শক্ত, উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে থাকে।

দাঁতের পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস শিশুকাল থেকেই করা উচিত। একবার দাঁতের মধ্যে খাদ্যের অংশ জমা হলে এটা ধীরে ধীরে বাড়তে ও মজবুত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এভাবে থাকলে পাথরের মত শক্ত হয়ে যায় এবং বহু কষ্টেই তা ফেলানো সম্ভব হয়। শহরের লোকেরা দন্তবিদদের

দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করে, কিন্তু দরিদ্র দেশের লোকের দ্বারা এটা সম্ভব হয় না। এছাড়া দন্তবিদদের দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করানোর পর যদি পূর্ণভাবে পরিষ্কার না হয় তা হলে দ্বিতীয়বার দাঁতে খাদ্য জমতে থাকে।

ইসলামী বিধানে ছয়-সাত বৎসর বয়সেই শিশুকে নামায পড়ার জন্য আদেশ দিতে হয়। যখন দশ বৎসর হয় তখন নামায পড়ার জন্য বাধ্য করার নির্দেশ আছে। নামায পড়ার জন্য সে শিশুই হোক না কেন, ওযু করা এবং এর শর্তাবলী পালন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে শিশু কালে শারীরিক পরিচ্ছন্নতার সাথে দাঁত পরিষ্কারের অভ্যাস করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে।

চোখের যত্ন

এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওযুর সময় চোখ খুলে মুখমণ্ডলে পানি ছিঁটিয়ে দিতে হয়। চোখ পরিষ্কার রাখা এবং চক্ষু রোগের জন্য এটা উত্তম প্রতিষেধক। তাছাড়া মহানবী (স.) চোখের যত্নের জন্য একটি অত্যন্ত ফলদায়ক ও কার্যকর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "যখন শুতে যাও তখন সুরমা লাগাও।"[১] তিনি আরো বলেছেন, "আসমাদ সুরমা ব্যবহার করো, কেননা এর দ্বারা লোম তৈরী হয় এবং চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়।"[২] হুযুর (স.)-এর এ অভ্যাস ছিল। ফলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর চোখের জ্যোতির পরিবর্তন হয়নি। এরূপ অনেক বয়োবৃদ্ধ লোক দেখা যায়, যারা হুযুর (স.)-এর মূল্যবান বাণী অনুসরণ করে নিজের দৃষ্টিশক্তি অক্ষুন্ন রেখেছে। সত্তর-আশি বৎসরের বৃদ্ধ বাতির আলোতে লেখাপড়া এমনকি সেলাইর কাজ পর্যন্ত করতে পারে।

রাতে সুরমা ব্যবহারের উপকারিতা হলো সারা দিনের ধুলাবালি সুরমা লাগানোর ফলে চোখের ভেতর থেকে পানির সাথে বের হয়ে আসে। সকালে চোখ ধৌত করা হলে মুখমণ্ডলে সুরমার কোন চিহ্নই

১. শামায়েল তিরমিযী, পৃষ্ঠা ৫।
২. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৫৮০।

থাকে না। যারা লেখাপড়া করে বা সূক্ষ্ম কাজ করে, তাদের সুরমা ব্যবহার করা অত্যন্ত প্রয়োজন। নিয়মিত ব্যবহারের ফলে চোখের যন্ত্রণা ও ক্ষীণদৃষ্টি দূর হয়ে যায়।

বর্তমানে ইউরোপীয় সভ্যতায় সুরমা ব্যবহারের প্রচলন খুবই কম। আল্লাহ্ প্রদত্ত দৃষ্টিশক্তির মধ্যে যখন কোন ক্ষীণতা দেখা দেয় তখন মানুষের তৈরী চশমা দ্বারা এটা দূর করার চেষ্টা করে, কিন্তু সহজ, কম খরচ ও উত্তম পন্থা গ্রহণ করে না।

জাতিসংঘের (UNO) প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোর (UNESCO) পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, পৃথিবীতে আশি লাখ অন্ধ আছে। এর মধ্যে ৮০% এশিয়া এবং আফ্রিকার মধ্যে পাওয়া যায়। চোখের যত্নের ব্যাপারে অমনোযোগিতাও এ দুমহাদেশে সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

ব্যায়াম

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হযরত রসূলে করীম (স.)-কে মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে ব্যায়াম অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে। যদি রসূলে করীম (স.) এ সম্পর্কে কোন আদর্শ পেশ না করতেন, তাহলে তিনি অনুসরণ ও অনুকরণের জন্য উত্তম আদর্শ হতে পারতেন না।

অন্যান্য মযহাব ও জাতির মধ্যে আল্লাহ্ভীরু এবং বুযুর্গদের সম্পর্কে ধারণা হলো, যাঁদেব মানব সমাজের এই দিকের সাথে কোন সম্পর্কই নেই সাধারণত তাঁদের পার্থিব দুনিয়া-বিমুখ হয়ে কঠোর ধ্যান ও সাধনায় লিপ্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধুলা ইত্যাদি—যা শরীরের প্রয়োজনানুযায়ী শক্তি সৃষ্টি করে—এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা বুযুর্গদের রীতি মনে করেন না। বরং এটা হতে বিরত থাকাই শ্রেয় মনে করেন তাঁরা।

মহানবী (স.) জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমনি আদর্শ স্থাপন করেছেন তেমনি শারীরিক ব্যায়ামে নিজে অংশগ্রহণ করে আদর্শ রেখে গিয়েছেন। বাস্তব কার্যের মাধ্যমে এই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেছেন যে, ধর্মের অনুসারী লোকেরা এ সমস্ত থেকে দূরে থাকে।

হুযুর (স.) সাহাবাদের সাথে তীর চালনা করতেন।[১] কোন কোন খেলায় স্বয়ং উপস্থিত হতেন। কোন সময় আপন স্ত্রীদের সাথে দৌড়াতেন। মসজিদে নববীতে হাবশীগণ সামরিক কসরত প্রদর্শনী করত—যা হুযুর (স) স্বয়ং পরিদর্শন করতেন এবং পর্দার আড়ালে থেকে নবী নন্দীনিগণও দেখতেন। এতে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, শারীরিক ব্যায়ামে মহিলাদের অংশগ্রহণ করা তিনি পসন্দ করতেন।[২]

ঘোড়ায় চড়া হুযুর (স.)-এর অত্যন্ত শখ ছিল এবং তিনি ঘোড়দৌড়ে খুব দক্ষ ছিলেন।[৩] যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। বড় বড় যুদ্ধ তিনি নিজেই পরিচালনা করতেন। ঘোড়া এবং উটের দৌড়ের ব্যবস্থা তিনি করতেন। ঘোড়দৌড় অত্যন্ত সুশৃংখল ও বিশেষ ব্যবস্থায় করা হতো।[৪] হুযুর (স.)-এর বিভিন্ন অস্ত্র এবং আরোহণের উট ও ঘোড়ার বিভিন্ন নাম ছিল।[৫] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, হুযুর (স.) এ সমস্ত ব্যাপারে কতটুকু আগ্রহী ছিলেন।

মহিলাদের ব্যায়ামের ব্যাপারে বলা যায় যে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার—যারা চাকর বাকর-রাখার ক্ষমতা রাখে না, তাদের ঘরের যাবতীয় কাজ মহিলারাই করে থাকে। এ কাজের দ্বারা অবশ্যই বিরাট ব্যায়ামের কাজ হয়। কোন কোন ডাক্তারের অভিজ্ঞতা হলো, এ ধরনের মহিলাদের অস্বাভাবিক মৃত্যু কম হয় এবং এদের বয়স তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ হয়।

হুযুর (স.) যখন রাষ্ট্রনায়ক বা ক্ষমতার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন তখনও আযওয়াজে মুতাহ্হারাত বা নবী-নন্দীনিগণ সংসারের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করতেন। তাঁদের কোন চাকরাণী ছিল না। অনেক সময় হুযুর (স.) স্বহস্তে তাঁদের কাজে সহযোগিতা করতেন। এমনকি প্রাচুর্যের সময় যখন প্রচুর ধন-সম্পদ, দাস-দাসী মদীনায় আসতে লাগল তখন হুযুর

---

১. তাজরীদে বুখারী, ২য় খন্ড, হাদীস নং ২৪৩।
২. তাজরীদ, ১ম খন্ড. হাদীস নং ২৬৪।
৩. নাসায়ী, বাবে হুববুল যাইল, পৃষ্ঠা ৫৩৭।
৪. তাজরীদ, ১ম খন্ড, হাদীস নং ২৬৪।
৫. দারেকুতনী, মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী।

(স.)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) একজন দাসীর জন্য আবেদন করলেন কিন্তু মহানবী (স.) তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত ফাতিমা (রা.) ঘরের যাবতীয় কাজ নিজেই করতেন।

বাস্তবিক পক্ষে মহিলারা যদি ঘরের কাজ ও ছেলেমেয়েদের লালন-পালনের কাজে নিয়োজিত থাকে তাহলে তাদের অন্য ব্যায়ামের সময় মেলে না বা তার প্রয়োজনও হয় না।

ইউরোপীয় মহিলাদের ভোগ-বিলাসের জন্য অথবা অর্থোপার্জনের জন্য পারিবারিক জীবন থেকে বিমুখতার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তা ঐ দেশের রাজনৈতিক ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের জন্য এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইসলামী শরীয়তের পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকর। জামা'আতে নামায আদায় করার জন্য পাঁচবার মসজিদে যাতায়াত এবং নামাযের সমস্ত বিধান সঠিকভাবে পালনে দেহের মধ্যে সুস্থতা আনয়ন করে। যারা অলসতার দরুন নামায আদায় করে না, পবিত্র কুরআনে তাদের কুৎসা বর্ণনা করা হয়েছে।[১] মহানবী (স.) বলেছেন, মুনাফিকদের জন্য ফজর ও ইশার নামায আদায় করা কঠিন।[২] কেননা এ দুটো নামাযই অলসতা দূর করার মোক্ষম উপায়।

নামাযে দেহকে নড়াচড়া করতে হয় এবং এই নড়াচড়ার মাধ্যমে দেহের অনেক উপকার হয়। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে শুধু ফরয এবং সুন্নতের মধ্যে সত্তর-আশি সিজদা, পঁয়তাল্লিশ-চল্লিশ রুকু, পঁয়তাল্লিশ-চল্লিশ কিয়াম, এবং সমসংখ্যক কা'দা বা বসা আছে। যদি এই সমস্ত নামায এক সময় আদায় করা হয়, যেমন কোন কোন মযহাবে রাত-দিনে ইবাদত করার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা আছে তাহলে এটা খুব উত্তম ব্যায়াম হয়ে যায়। এর ফলে সুস্থ ব্যক্তিও পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। দুর্বল ব্যক্তির জন্য এটা

---

১. সূরা মাউন, রুকু ১।

২. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৭২।

হয়ে পড়ে অত্যন্ত কষ্টদায়ক। কিন্তু ইসলামে এরূপ ইবাদত নিষিদ্ধ যার দ্বারা মানুষ ক্লান্ত ও অসমর্থ হয়ে পড়ে।[১] এ কারণেই মানুষের শক্তি ও ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রেখে পার্থিব কাজের বিবেচনা করে নামায পাঁচ ওয়াক্তে বিভক্ত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ফিকাহর কিতাবে শিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সীমার ভিতর এ কাজও ইসলাম পসন্দ করেছে। স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শিকার অত্যন্ত ফলপ্রদ। যে বনী ইসরাইল জাতি শত শত বৎসর পর্যন্ত ফিরাউন বাদশাহের অধীনে শাসিত ও উৎপীড়িত হচ্ছিল, তারা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত জঙ্গলে বাস করায় এবং শিকারে কাটিয়ে দেওয়ার ফলে এরূপ যোগ্যতা অর্জন করে যে, এরাই একদিন ফিলিস্তিন বিজয় করে। আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা বলতে পারি যে, শিকার দ্বারা স্বাস্থ্য নেহাত উত্তম থাকে।

গোসল

আল্লাহ্‌তা'আলা ইসলামী বিধানের মধ্যে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় সহজ ও সরলতা প্রয়োগ করে এর মূল্য ও কৃতিত্ব বর্ধিত করেছেন। হযরত মূসা (আ.)-এর প্রবর্তিত য়াহুদী ধর্মের বিধানে গোসল সম্পর্কে বিধান রয়েছে এবং কঠিন শর্ত আরোপ করা সত্ত্বেও এর নিয়মাবলী সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্মে বিভিন্ন নদী, ঝিল ও সমুদ্রে গোসল করার প্রশংসা ও উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও গোসলের নিয়মাবলীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। কোন কোন ধর্মে পরিচ্ছন্নতা এবং গোসল হতে বিরত থাকাকে সাধুতা মনে করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও লেখক লর্ড বার্টান্ড রাসেল তাঁর 'বিবাহ ও চরিত্র' (Marriage & Character) নামক গ্রন্থের ৪০৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'গির্জাবাসী পাদ্রীরা গোসলের এইজন্য কুৎসা বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা দেহের আকর্ষণ শক্তি বেড়ে যায়। সেন্ট পল বলেন, "দেহ এবং পোশাকের পরিচ্ছন্নতার অর্থ হলো আত্মাকে ময়লামুক্ত করা, মাথায় জন্মানো কীটকে আল্লাহতা'আলা মুক্তা নাম দিয়েছেন এবং এগুলো দ্বারা আচ্ছাদিত পবিত্র মানুষের পৃথক সম্মান আছে মনে করা হয়।"

৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৩২ এবং তাজরীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১১।

গোসল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতার বিস্তারিত নির্দেশ ও নিয়মাবলী ইসলাম স্বাস্থ্যরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে খুব সহজ ও সরলভাবে বর্ণনা করেছে।

ইসলামী বিধানে বিভিন্ন অবস্থায় গোসল করার নির্দেশ রয়েছে। (ক) শরীর থেকে কিছু বের হলে গোসল ফরয বা অত্যন্ত জরুরী হয়ে যায়। যেমন; স্বপ্নদোষ বা সহবাসের পর অথবা হায়েয ও নিফাস বন্ধ হওয়ার পর। (খ) কোন নির্দিষ্ট সময়ে গোসল করা সুন্নত বলা হয়েছে। যেমন; জুম'আ বা দু'ঈদের দিন অথবা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর। (গ) গরম বা পরিচ্ছন্নতার জন্যে গোসল করা নিজের ইচ্ছাধীন।

গোসলের প্রাথমিক শর্ত হলো ঃ

১. পানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। কোন পাত্রে পানি নিয়ে অথবা ঝর্ণা, নদী, সমুদ্রে বা ঝিলে গোসল করা যায়।

২. গোসল করার সময় পানি বেশী খরচ বা অপচয় করা যাবে না।

৩. যদি পাত্রে পানি নিয়ে গোসল করতে হয় তাহলে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শরীরে যে পানি ঢালা হয় তা কিম্বা পানির ছিঁটা ঐ পাত্রে না পড়ে।

৪. মানুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা নাজায়েয এবং পর্দার আড়ালে গোসল করা সমীচীন।[১]

গোসলের পদ্ধতি[২] স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার নিয়মাবলীর মতই সহজ। যদি পাত্রে পানি নিয়ে গোসল করতে হয় তাহলে এর মধ্যে হাত দেওয়ার পূর্বে তা ধৌত করতে হয়। অতঃপর প্রয়োজন হলে ডান হাতে পানি ঢেলে বাঁ হাতে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এবং শরীরে কোথাও ময়লা থাকলে তা সাবান দিয়ে অথবা শুধু পানি দিয়েই ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর বাঁ হাত ধৌত করে নিয়মানুযায়ী মিসওয়াক এবং ওযু করতে হবে। হ্যাঁ, গোসলের জন্য ওযু করার সময়ে পা ধৌত করার

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪০১।

২. হাদীস ও ফিকাহর সমস্ত কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

প্রয়োজন নেই। গোসলের পর সর্বশেষে পা ধুয়ে নিতে হয়। কেননা গোসলের সময় শরীরের ময়লা, সাবান ইত্যাদি গড়িয়ে পায়ের দিকে যায়। যদি প্রথমেই পা ধুতে হয় তবে সর্বশেষে আবার তা ধুতে হবে।

গোসলের পূর্বে ওযূ করা হলে প্রায় অর্ধ গোসলের মত মনে হয়। ওযূ করার পর সামান্য পানি নিয়ে মাথায় ঢালতে হয় এবং অঙ্গুলি দ্বারা চুলের গোড়া ভাল করে ভিজাতে হয়।[১] এটা যেন চুলে শ্যাম্পু বা খেলাল করার একটি সহজ সরল পদ্ধতি। এর উপকারিতা আজকাল মানুষ খুব ভালভাবেই বোঝে। মাথার চুল সাবান দ্বারা পরিষ্কার বা ব্রাশ করা হলে গোড়া শক্ত ও উজ্জ্বল হয়। ধুলাবালি মাথা থেকে দূরীভূত হয়। শ্যাম্পু ব্যবহারের এটাই উদ্দেশ্য।

পূর্বেও বলা হয়েছে যে, দেহের নীচের অংশ ঠান্ডা করার পূর্বে মাথা ভিজিয়ে ঠান্ডা করা অত্যন্ত ফলদায়ক। এভাবে গোসল করলে দেহ এবং মাথা ও মগজের তাপের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

মাথার চুলে পানি ঢালার পর প্রথমে দেহের ডান দিকে, পরে বাঁ দিকে পানি ঢেলে কচলাতে হয় এবং ময়লা নরম করতে হয়। এরপর সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালতে হয় এবং যেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে গোসল করা হয়েছে সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে পা ধুয়ে গোসল শেষ করতে হয়।

গোসলের এ পদ্ধতির মধ্যে একটি হিকমত বা কৌশল রয়েছে। কোন নিয়ম ছাড়া হঠাৎ শরীরে পানি ঢালা হলে—বিশেষ করে যখন মানুষ ক্লান্ত বা উষ্ণতার ফলে ঘামে ভিজে যায়, তখন একবারে পানি ঢালা হলে হঠাৎ উষ্ণতা বা তাপ কমে যায়। কিন্তু প্রথম পবিত্রতা, এরপর ওযূ তারপর মাথায় পানি ঢেলে চুলে খেলাল করা হলে শরীরের উষ্ণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনেক গোসলখানায় বিভিন্ন স্তর বা জায়গা তৈরী করা হয়। এ পদ্ধতি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। এ নিয়মে গোসল করার আরো একটি উপকারিতা আছে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে ওযূ করার পর সামান্য পরিমাণ পানি

---

১. মিশকাত, ১ম খন্ড, হাদীস নং ৪০০।

শরীরে ঢালা হলে বেশ ঠান্ডা অনুভূত হয়। কিন্তু ওযু ছাড়া প্রচুর পানি ঢাললেই এরূপ উপলব্ধি হয়ে থাকে। ওযু করে গোসল করলে লোমকূপের গোড়ায় পানি পৌঁছে। অধিকন্তু ওযু ছাড়া গোসল করা হলে মনে হয় পূর্ণভাবে দেহের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়নি।

হুযুর (স.) কোন কোন সময় পানিতে সুগন্ধি মিশিয়ে গোসল করতেন।[১] এ নিয়ম মনের আনন্দ ও স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী। বর্তমানে সঙ্গতিপন্ন লোকদের মধ্যে এর যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ ফিকাহ গ্রন্থে গোসলের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং নিজেরা বাস্তবে তা কার্যের দ্বারা দেখিয়েছেন যে, কিভাবে সহজে বেশী পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা যায়। সুতরাং গোসলখানায় বেসিন, পানির ফোয়ারা বা পানির ট্যাপ ইত্যাদি বিভিন্ন শহরে মুসলমানেরা প্রচলন করেছে। তুর্কীদের গোসল পদ্ধতি ইউরোপীয়রা মুসলমানদের থেকে শিখেছে। বর্তমান, সভ্য জগতে এ পদ্ধতি উৎকৃষ্ট ফ্যাশন বলে মনে করা হয়। এদিক দিয়ে মুসলমানেরা পৃথিবীতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

এতদসত্ত্বে আজও পাশ্চাত্যের লোকেরা গোসল ও পবিত্রতার ইসলামী বিধান পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা পবিত্রতা অর্জন ছাড়াই টবের পানিতে শরীর ডুবিয়ে গোসল করে। এর ফলে প্রচুর পানির অপচয় হয় কিন্তু পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় না। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও গোসলের ইসলামী পদ্ধতি এবং মাথাওয়ালা লোটা বা বদনা দ্বারা পরিমাণ মত পানি ব্যবহারে সবচেয়ে বেশী পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ করা যায়।

পাশ্চাত্যের নিয়মানুযায়ী স্নানাগার ও পায়খানা এক স্থানে হওয়া স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার নীতি বিরুদ্ধ। যেখানে মলত্যাগ বা প্রস্রাব করা হয় সেখানে যতই পরিষ্কার করা হোক বা কীটনাশক ঔষধ ছিটানো হোক না কেন, দুর্গন্ধ অবশ্যই থাকবে। যারা এ ধরনের স্নানাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাদের ঘ্রাণশক্তি এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের কাছে দুর্গন্ধ কম অনুভূত হয়। এ ধরনের স্নানাগারে প্রবেশ করার সাথে সাথেই দুর্গন্ধে আমাদের পক্ষে তা অসহনীয় হয়ে উঠে।

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল গুসল, হাদীস নং ২৫৪।

পরিচ্ছন্নতার জন্যই গোসল করা হয়। সত্যিকার অর্থে পরিচ্ছন্নতা স্নানাগার হ'তে অপবিত্র ও দুর্গন্ধ দূর করেই অর্জন করা যায়। নতুবা গোসলের প্রকৃত উদ্দেশ্যই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ কারণেই মহানবী (স.) স্নানাগারে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।[১] মুসলিম সমাজ স্নানাগার ও পায়খানা এক কামরায় তৈরী করা ক্ষতিকর ও অপসন্দনীয় বলে মনে করে।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে। তা হলো—বিশেষ ধর্মীয় ইবাদত হায়েয ও নিফাস শেষ হওয়ার পর বা রোগমুক্তির পর গোসলের উপকারিতা এবং উদ্দেশ্য সর্বজনবিদিত। কিন্তু স্বপ্নদোষ বা সহবাসের ফলে শরীরের একটি অংশ অপবিত্র ও নোংরা হওয়ায় গোসল ওয়াজিব হওয়া অর্থহীন বলে মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে সহবাস হোক বা স্বপ্নদোষ হোক, এর ফলে দেহের মধ্যে একটু দুর্বলতা দেখা দেয়। যদিও শারীরিক সুস্থতা বা যৌবনের শক্তিতে তা ধরা না পড়ে। তাই ডাক্তারগণ মত দিয়েছেন যে, গোসলের দ্বারা ঐ দুর্বলতা দূর হয়ে যায় এবং পূর্ণ শক্তি ফিরে আসে।

প্রত্যেক মুসলমান নামাযে অলসতা করলেও এরূপ গোসলের আহ্‌কাম খুব কঠিনভাবে পালন করে থাকে। স্বপ্নদোষ বা সহবাসের পর গোসল করা তাদের অপরিহার্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

ইউরোপীয় জাতি—যারা খৃস্টানদের দ্বারা বেশী প্রভাবিত, তাদের বর্তমান সভ্যতা এ ধর্মীয় বিধান ও মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত। ধর্মীয় চিন্তায় বা বিধর্মীর চিন্তায় হোক, তারা অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে কিছুই জ্ঞাত নয়। সাধারণ পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কোন নিয়মাবলী ছাড়াই তাদের গোসল সম্পন্ন হয়। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট বিধান নেই।

হিন্দু সমাজে সহবাসের পূর্বে গোসল করার প্রচলন আছে— এটা একটা উত্তম পন্থা। কেননা গোসল করার ফলে মানব দেহের উপর একটা প্রশান্তি নেমে আসে এবং আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তবে সহবাসের পর পূর্ণ সুস্থতার জন্যে গোসল করা প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্যে হিন্দু

১. তিরমিযী. আবওয়াবে 'তাহারাত, পৃ. ৫।

ধর্মে কোন কঠোর নিয়মাবলী নেই। য়াহুদী ধর্মে অপবিত্রতা সম্পর্কে কঠোর নিয়মাবলী রয়েছে। কিন্তু গোসল কিভাবে এবং কিরূপ পানি দিয়ে করতে হয়, এবংবিধ অন্য কোন বিস্তারিত বিবরণও তাওরাতে নেই। সহবাস, স্বপ্নদোষ বা মেহরোগের ফলে বীর্য নির্গত হওয়ার একই হুকুম তাওরাতে দেওয়া আছে যে, এ রূপ ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র থাকে। এমনকি কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে সে স্পর্শ করলে তাও সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে। এরূপ অপবিত্র ব্যক্তির সন্ধ্যাবেলায় গোসল করতে হবে এবং শরীরের পোশাক-পরিচ্ছদও ধৌত করতে হবে। সে যে পাত্র স্পর্শ করেছে, তাও ধৌত করতে হবে। যদি পাত্রটি মাটির তৈরী হয়, তবে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। কোন কোন অবস্থায় বুলবুল বা কবুতরও ইবাদতখানায় কুরবানী করতে হয়।[১]

পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও গোসলের ইসলামী বিধান কত সুন্দর ও সহজ। একজন স্বল্প আয় তথা সর্বনিম্ন আয়ের সাধারণ লোকও তা নির্বিঘ্নে আমল করতে পারে। অপবিত্রতার সময় যদিও নামায এবং অন্যান্য ইবাদত নিষিদ্ধ, কিন্তু ঐ ব্যক্তি পশু যবেহ করতে পারে তার তৈরী বা রান্নাকৃত গোশত, তার দ্বারা স্পর্শকৃত কোন বস্তু বা মানুষ অপবিত্র হয় না। এমনকি তার গোসলের পানির ছিঁটে কারো উপর পতিত হলে সেও অপবিত্র হয় না।[২]

হুযুর (স.) গোসলের পর তেল দিয়ে চুল আঁচড়াতেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। ফলে তিনি যে গলি দিয়ে যেতেন তার চারদিকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ত। তাঁর সামনে উপবেশনকারীদের মস্তিষ্ক সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যেত। তিনি পোশাক ও শরীরে এত সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, ঘামের আকারে তা বেরিয়ে আসত। উম্মুল মুমিনীনদেরও এ অভ্যাস ছিল।

হুযুর (স.) প্রায়ই বলতেন, "পুরুষদের এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করা চাই যার ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু রং দেখা না যায়। আর মহিলাদের এরূপ খুশবু ব্যবহার করা চাই যার ঘ্রাণ ছড়িয়ে না পড়ে, কিন্তু রং দেখা যায়।[৩]

১. আহ্বার পৃ. ১৫।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল গুসল, বাব ৯, হাদীস নং ২৫৭ এবং কিতাবুল হায়েয, বাব ৭, হাদীস নং ২৯৭।
৩. শামায়েলে তিরমিযী, পৃ. নং ১৫।

একদিন মসজিদে নববীতে কিছু লোকজন জমা হলো। ব্যবসায়ীরা ময়লা কাপড় নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের ঘামের গন্ধে মসজিদ দুর্গন্ধময় হয়ে গেল। হুযুর (স.) বললেন, "গোসল করে এলে ভালো হতো।"[১] ঐদিন থেকে জুম'আর দিন গোসল করা শরীয়তের হুকুমরূপে গণ্য হলো। হুযুর (স.) হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে তিনটি ওসীয়ত করেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল জুম'আর দিন গোসল করার নির্দেশ।

একদিন হুযুর (স.) বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ময়লা এবং এলোমেলো ও অবিন্যস্ত চুল পসন্দ করেন না"[২] যদি চুল পরিষ্কার এবং আঁচড়ানো না হয় তাহলে শীঘ্রই ঝরে পড়ে যায়। চুল ভালভাবে পরিষ্কার করা এবং সুন্দরভাবে পরিচর্যা করা মানুষের মন ও মস্তিষ্কের উপর বেশ প্রভাব সৃষ্টি করে।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, যদিও গোসলের ইসলামী বিধান অত্যন্ত সহজ কিন্তু এর বিস্তারিত শর্তাবলী ও রীতিনীতি পালন করতে খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন। বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত লোকদের দ্বারা এত সময় ব্যয় করা সম্ভব নয়।

এর উত্তরে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে গোসলের পদ্ধতি বর্ণনায় খুব বেশী হলেও বাস্তবে তেমন সময়ের প্রয়োজন হয় না। পূর্ণাঙ্গভাবে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য আট-দশ মিনিট ব্যয় করাও যথেষ্ট।

---

১. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৬১, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯।

২. ان الله يبغض الوسخ والشعث

৬

ওযু এবং গোসল সম্পর্কে নির্দেশাবলীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পবিত্রতা, ওযু এবং গোসলের ইসলামী বিধানের উপর একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এটা স্বীকার করতে হয় যে, স্বাস্থ্যরক্ষা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য এর চেয়ে উত্তম ও অদ্বিতীয় কোন পন্থা নেই।

প্রস্রাব ও মলত্যাগের পর প্রত্যেকবারেই পানি দ্বারা পরিষ্কার করত পবিত্রতা লাভ করা, প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যে হাত-মুখ ধৌত করা, আহারের পূর্বে ও পরে হাত ধোয়া, কুল্লি করা, দাঁত পরিষ্কার করা কত সুন্দর পরিচ্ছন্নতার উপায়! বিশেষত উষ্ণ মণ্ডলীয় দেশে এরূপ পানি ব্যবহার করা সজীবতা ও স্ফূর্তি আনয়ন করে।

ওযু করার সময় দেহের সংশ্লিষ্ট অংশের মধ্যে তিনবার পানি ঢালা হয়। এমনিভাবে দিনের বিভিন্ন সময়ে হাত কনুই পর্যন্ত, পা টাখনু পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি ও কপালের চুলের গোড়া পর্যন্ত পনরবার ধৌত করা হয়। প্রত্যেকবারেই চোখে স্বচ্ছ পানির ছিঁটে দেওয়া হয়। নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। দিনে কমপক্ষে একবার দাঁত মিসওয়াক করা ছাড়াও পনেরবার কুল্লী করা হয়। কয়েকবার অঙ্গুলি দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা হয়। পাঁচবার কানের ছিদ্র এবং বাইরের অংশ পরিষ্কার করা হয়। এর সাথে পাঁচবার মাথাও মোসেহ করা হয়।

গোসলের পূর্বের ওযূও যদি গণনা করা হয় তবে এ সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। এরপর আহারের পূর্বে হাত ধৌত করা, কুল্লী করা, দাঁত পরিষ্কার করা ইসলামী বিধানের অন্যতম কর্তব্য। সাধারণত উচ্চবিত্তরা দৈনিক চারবার এবং নিম্নবিত্তরা দৈনিক দু'বার আহার গ্রহণ করে থাকে। এভাবে হাতের উপর কমপক্ষে বারোবার পানি ঢালা হয় এবং ছয়বার কুল্লী করা হয়।

এটাও চিন্তার বিষয় যে, যদি একই সময় এ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা ও পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হতো, তা হলে এটা পালন বিরাট কষ্টকর ও বোঝা হয়ে যেত। কিন্তু এটা বিভিন্ন সময়ে ভাগ করে দেওয়ায় এত বুদ্ধিমত্তার কাজ হয়েছে যে, তা পালন করতে কোনরূপ বোঝা মনে হয় না; বরং পার্থিব কাজে নিমগ্ন ও পরিশ্রান্ত লোকেরা এ নিয়মে হাত-মুখ ইত্যাদি ধৌত করে সজীবতা লাভ করে এবং ক্লান্তি দূর করে।

যদি শিল্প-কারখানায় এ পদ্ধতি চালু করা যায় তাহলে শুধু শ্রমিকদেরই উপকার হবে না বরং মিল-কারখানার মলিকগণও উপকৃত হবে। শ্রমিকদের ক্লান্তি ও অলসতা যত বেশী দূর হবে, ততই তারা আরো বেশী কাজ করতে পারবে। ফলে সামগ্রিকভাবে কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

আহারের পূর্বে হাত ধৌত করা পরিচ্ছন্নতার এক অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা খানার মধ্যে এক প্রকার তৃপ্তি আনয়ন করে। আহারের পর ভালোভাবে হাত ধৌত করা, কুল্লী করা, দাঁত পরিষ্কার করা ও খেলাল করা পাকস্থলীর উপর খাদ্যের চাপ কমিয়ে দেয়। বিভিন্ন রোগ হতে মুক্ত থাকা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য এর চেয়ে উত্তম, সহজ ও কম খরচের পদ্ধতি আর কি হতে পারে?

ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের একদল তাদের জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কিন্তু উপরিউল্লিখিত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, তারা জ্ঞানের সংকীর্ণতার ফলেই স্বাস্থ্যরক্ষার উত্তম বিধান ত্যাগ করেছে।

অন্য আর একদল যদিও ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কিন্তু নামায ছেড়ে দিয়ে ইসলামী বিধানের একটি উত্তম ও কার্যকর ব্যবস্থাকেই ত্যাগ করেছে।

মহিলাদের প্রকৃতিগত বিপত্তি

আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.)-এর বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ এক বিপত্তি স্থির করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মাসেই এদেরকে এর শিকার হতে হয়। এমনিভাবে নিফাসও একটি প্রাকৃতিক বিপত্তি যে, জীবনে কয়েকবার এর সম্মুখীন হতে হয়। বস্তুত এ সমস্ত বিপত্তি স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার সাথে সম্পর্কিত। তাই ইসলামের দৃষ্টি-কোণ থেকে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথমোক্ত বিপত্তির নাম হলো হায়েয, এর সময়সীমা এবং নিফাসের সময়-সীমা সম্পর্কে বিভিন্ন মযহাবে বিভিন্ন মতবিরোধ রয়েছে। এছাড়া ইসতিহাজা নামক রোগ আছে। মহিলারা অসুস্থতা বা দুর্বলতার কারণে এতে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

পৃথিবীর অধিকাংশ সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে এ প্রাকৃতিক বিপত্তির সময় মহিলাদের অবস্থা করুণ হয়ে উঠে। এ সময় তারা অপবিত্র বলে গণ্য হয়। সুতরাং তারা ধর্মীয় বা দুনিয়ার যে কোন অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকে। এ সময় তারা নিজেরা অপবিত্র থাকে এবং যে বস্তু তারা স্পর্শ করে তাও অপবিত্র হয়ে যায়। বস্তুত তারা এ সময় ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। একজন মহিলা বা বালিকা যা লজ্জায় প্রকাশ করে না তা ঘরের ছোট-বড় সকলের নিকটই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

রক্ত প্রবাহিত হওয়ার ফলে মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপরও এর বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর সাথে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা এবং তাদেরকে বয়কট করে চলা তাদের মানসিকতাকে আরো অস্থির করে তোলে। হিন্দু ও অগ্নিপূজকরা তাদের নারীদের প্রতি এ ধরনের ব্যবহার করে থাকে। কোন কোন হিন্দু সমাজে এটাও প্রচলন আছে যে, যখন কোন ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন ঐ ঘরের রান্না করা খাদ্য অন্য কোন লোক গ্রহণ করে না বা খায় না। য়াহুদীরাও এ ব্যাপারে সীমা বেঁধে দিয়েছে।

তাওরাত গ্রন্থের বারো ও পনের অধ্যায়ের নির্দেশ এখানে উল্লেখযোগ্য। এদের পুত্র সন্তানের জন্ম হলে চল্লিশ এবং কন্যা সন্তান হলে আশিদিন প্রসূতি-সময় পালন করা হতো। গোসল ও পবিত্রতা অর্জনের সাথে সাথে সক্ষম ব্যক্তির জন্য এক বৎসরের একটি ভেড়া ও একটি কবুতর যদি সক্ষম না হয় তবে দু'টো কবুতর বা দু'টো বুলবুল কুরবানী করা অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য করা হতো। দ্বিতীয় আরো একটি নির্দেশ ছিল এই যে, ছেলের জন্মের পর সাতদিন এবং মেয়ের জন্মের পর চৌদ্দদিন অপবিত্র থাকবে, যেরূপ হায়েযের সময় থাকে এর সাথে অপবিত্রতার প্রতিক্রিয়াও বাকী থাকবে।

হায়েযের সময় তাওরাত কিতাবের নির্দেশ হলো সাতদিন পর্যন্ত ঐ মহিলা এরূপ অপবিত্র থাকবে যে, যে কেউ তাকে স্পর্শ করবে, সেও সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে। যে বিছানায় ঐ মহিলা শয়ন করবে বা বসবে সেটাও অপবিত্র হয়ে যাবে। যে কেউ তার বিছানা স্পর্শ করবে সে তার বিছানা বা বসার স্থানে ছোঁয়া লাগে তাহলে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে।

ইসতিহাজা হলো অসুস্থতার কারণে একটি রগ থেকে প্রবাহিত রক্ত। এর সম্পর্কেও ঐ একই হুকুম প্রযোজ্য। এমনকি এর সাথে আরো কঠোরতা প্রয়োগ করা হয়েছে যে, এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও সে অপবিত্র থাকবে। অতঃপর পবিত্র হওয়ার জন্য তাকে প্রথম দু'টো ঘুঘু অথবা দুটো কবুতর উৎসর্গ করতে হবে!

মহিলাদের এ বিপত্তি যেন এরূপ অপবিত্রতা ও নোংরামি সৃষ্টি করে যা শেষ পর্যন্ত কুষ্ঠ, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করে এবং বিদ্যুৎগতিতে এক দেহ হতে অন্যদেহে সংক্রামিত হয়!

অতঃপর এটা যখন অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশে তখন তাতে এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না হয়।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের এ প্রাকৃতিক বিপত্তি ও অপবিত্রতা কখনো সংক্রামিত হয় না। এটা শুধু সংশ্লিষ্ট মহিলার সাথে

সম্পৃক্ত।[১] এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট মহিলাকে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে বিভিন্ন ধর্মীয় কার্য থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাকে অন্যান্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মহানবী (স.) পূর্ববর্তী সমস্ত বাধা-বিপত্তি ভেঙ্গে দিয়ে অপবিত্রতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত করুণাই করেছেন।

পবিত্র কুরআনে মাসিক ঋতুকে ক্ষতিকর বিপত্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[২] এ সময় সহবাস থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[৩] কেননা এরূপ করা স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী নারী-পুরুষ উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ সহবাসের দরুন যদি সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে এর স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এছাড়া শারীরিক দুর্বলতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের উপর আরো কিছু বিধি-বিধান আরোপ করা হয়েছে।

হজ্জ সংক্রান্ত কতকগুলি পালনীয় কাজ অথবা 'ইবাদত' আছে যেমন-কা'বা শরীফ তওয়াফ ইত্যাদি। নামায ও রোযার চেয়েও যা এক প্রকারের রিয়াযত (সাধনা) ও মুজাহিদা (কঠোর পরিশ্রম) ঋতুবতী মহিলারা এগুলো থেকে পরিত্রাণ পেয়ে থাকে। মসজিদে যাওয়া এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, এমনকি স্পর্শ করাও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলার ঘর এবং পবিত্র কুরআনের সম্মানেই এ আদেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে এ সময় তাদের কাছে বসা, তাদের রান্না করা খাদ্য খাওয়া নিষেধ নয়। নামায, রোযা ছাড়া হজ্জের অন্যান্য ইবাদতে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারে। সমবেত দোয়া এবং মঙ্গলজনক কজে অংশ গ্রহণ করতে পারে; কুরবানী করতে পারে। এ অবস্থায় যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে তবে নিয়মানুযায়ী জানাযা পড়ে কাফন-দাফন করা যায়

বস্তুত ইসলামী বিধান অনুযায়ী ঋতুর সময় মহিলাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা সিদ্ধ রাখা হয়নি, যার ফলে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়।

১. বুখারী ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে হায়েয সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

২. সূরা বাকারা ঃ ২৮ রুকূ।

৩. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ২২৬, ২২৮।

তাদের স্বাভাবিক লজ্জা-শরমের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। মুসলমান পরিবারে এর খবর ছোট-বড় সবাই নয়, বরং ঋতুবতী মহিলার মা অথবা প্রাপ্ত বয়স্কা বোন জানতে পারে। বিবাহিতা মহিলাদের স্বামীও জানতে পারে।

ইসলামী বিধান মতে নিফাসের হুকুম চল্লিশ দিন থাকে। ছেলে বা মেয়ে জন্মের পর চল্লিশ দিন এ বিধান বলবত থাকে। তবে এর পূর্বে রক্ত বন্ধ হলে শরীয়তের সমস্ত বিধান তাকে পালন করতে হবে। ইসলামী বিধানে ইসতিহাজাকে রোগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে হায়েযের হুকুম থেকে এটা পৃথক করা হয়েছে। তাওরাতের বিধানের মত একে অপবিত্র বলা হয়নি। এ রোগে আক্রান্ত মহিলা সমস্ত 'ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। হ্যাঁ, তবে প্রত্যেক নামায ও ইবাদতের পূর্বে ওযূ করতে হবে।

প্রত্যেক মহিলার মাসিক ঋতু নির্ধারিত সময়ে হয়ে থাকে। সুতরাং ইসতিহাজার সময় পূর্বের হিসাব অনুযায়ী হায়েযের নির্ধারিত দিন বাদ দিয়ে গোসল করে মহিলারা পবিত্র হয়ে যাবে এবং ইবাদত করবে।

মাসিক ঋতু ও নিফাসের পর গোসল করা অবশ্য কর্তব্য। সম্ভব হলে তুলার সুগন্ধি লাগিয়ে ব্যবহার করা যায়। এটা স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জন্যে খুবই উত্তম। গোসলের পর মাথার চুল আঁচড়ানো এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা অতি উত্তম।[১]

য়াহুদী ধর্মের মত ইসলামে কোন মহিলাকে তার অপবিত্রতার জন্যে কোন 'ইবাদতখানায় গিয়ে কাফফারা বা কুরবানী দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

১. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৯২; মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৯।

৭

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পানির বিকল্প

আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র মা'বুদ। আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলী আছে। অন্যান্য ধর্মে দেখা যায় তারা মিথ্যা উপাস্যকে পূজা করার জন্য কঠোর নিয়মাবলী আরোপ করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে শারীরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে অক্ষম অধিকাংশ লোক তাদের ধর্মীয় উপাসনাদি করা থেকে বঞ্চিত হয়।

হিন্দুদের সবচেয়ে বড় পূজা 'হাওয়ানে' স্বর্ণের পাত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করে, য়াহুদীদের হাইকল খৃস্টানদের গির্জায় পূজা-অর্চনা ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। পক্ষান্তরে একজন মুসলমান অতি সহজ ও সরলভাবে তাদের ইবাদত করতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় মসজিদ তৈরী হতে পারে। এমনকি বাসস্থানেও ইবাদত করার বিধান রয়েছে। দেড়-দু'সের পানি দিয়ে পবিত্রতা লাভের পর অতি সরলভাবে নামায আদায় করতে পারে। সুতরাং মুসলমানদের ইবাদতের জন্যে সোনা-রূপার পাত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করা বা বেশী মূল্যবান সুগন্ধি যেমন—লোবান, জাফরান ব্যবহার করার চিন্তাও করা যেতে পারে না।

এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা লাভের জন্যে সবচেয়ে সহজলভ্য এবং দ্রুত কার্যকর একমাত্র পানিই। তবে

মাটিও নোংরা এবং অপবিত্র বস্তু দূর করতে সাহায্য করে। মাটির ভেতর কোন নোংরা বস্তু পুঁতে রাখা হলে কয়েকদিন পর তা মাটির সংস্পর্শে এসে মিশে এর প্রতিক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত ময়লা ও নোংরা দূর করার মাধ্যমেই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা যায়।

মহানবী (স.) এক বাণীতে ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জমি বা মাটি আমার জন্যে মসজিদ হিসেবে তৈরী করেছেন। —এ বাণীতে তিনি মাটিকে 'তুহর' বলেছেন। আরবী ভাষায় তুহর বলা হয় যা স্বয়ং পবিত্র এবং অন্য বস্তুকেও পবিত্র করার ক্ষমতা রাখে।

ইসলামের বিধান সার্বজনীন। তাই বিধানগুলো এরূপ হওয়া উচিত, যা মানবজাতির জন্যে পালন করা খুব সহজ ও উপকারী হয়। ওযু সম্পর্কে এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি পাওয়া যায় কিন্তু অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়, তখন মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সিদ্ধ হবে। তথাপি কোন অবস্থাতেই ইবাদত ত্যাগ করা যাবে না। বিশেষ অক্ষমতার ফলে গোসলের প্রয়োজন হলেও এ পদ্ধতি গ্রহণ জায়েয রাখা হয়েছে।

হুযূর (স.) এর জনৈক সাহাবীর গোসল করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোন কারণে বা পানি না পাওয়ার ফলে বাইরে উন্মুক্ত ভূমিতে গড়াগড়ি দিলেন এবং এ কথা ভাবলেন যে, যেমনিভাবে পানি সমস্ত শরীরে ঢালতে হয়, তেমনি মাটিও সারাদেহে মিশতে হবে। হুযূর (স.) যখন জানতে পারলেন তখন তাঁকে ডেকে বললেন, "এমনিভাবে তায়াম্মুম করো। মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ার প্রয়োজন নেই।"[১]

তায়াম্মুমের নিয়মাবলী খুবই সরল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাটির ঢেলা বা বালি মিশ্রিত কোন বস্তুর উপর হাত স্পর্শ করে ঐ হাত দ্বারা মুখ-মন্ডল মুছতে হবে। এরপর কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মুছতে হবে। এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনে صعيد (ছায়িদান) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ পবিত্র মাটি।[২]

---

১. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল তায়াম্মুম, হাদীস নং ৩৩০।

২. সূরা নিসা, রুকু ৪, সূরা মায়িদা, রুকূ ৬।

কত সহজ ও সরল নিয়মাবলী! পানিহীন বিস্তীর্ণ মাঠের বাসিন্দা অথবা শীতপ্রধান অঞ্চলের একজন রুগ্ন ব্যক্তি তার দেহে কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ছাড়াই সে এ পদ্ধতি দ্বারা উপকৃত হতে পারে। কোন এক ভ্রমণে জনৈক সাহাবী আহত হন। সঙ্গীরা তাকে ওযুর পানি ব্যবহারের কথা বললেন। কিন্তু তিনি গোসল করে ফেলেন। ফলে রোগ বেড়ে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মহানবী (স.) এ ঘটনা জেনে খুব অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, "এ অবস্থায় তায়াম্মুম করে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে এর উপর মুছে বাকী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেই হতো।"[১]

তায়াম্মুম কতক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকে এটা জানা আবশ্যক। যে কারণে তায়াম্মুম করা হয় অর্থাৎ পানি যখন পাওয়া যাবে তখন নিয়মানুযায়ী গোসল, ওযু ইত্যাদি করতে হয় ঐ কারণে তায়াম্মুম শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় কথা হলো, যে যে কারণে গোসল বা ওযু পুনরায় করতে হয় ঐ কারণে তায়াম্মুমও শেষ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়-বার করে নিতে হয়।

তায়াম্মুমের উপকারিতা ও অন্যান্য দিক বাদ দিলেও ওযুর মত এর মধ্যে বায়ু নিষ্কাশন হওয়া থেকে সাবধানতা অবলম্বন, ইবাদতের জায়গা এবং জনসমাগমের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার একটি উত্তম কৌশল।

লোম ও নখ

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা বিভিন্ন বস্তু কাজে লাগিয়ে থাকে। যে কোন জীব-জন্তুর লোম, পাখা, নখ, চামড়া, খুর বা থাবা প্রয়োজনানুযায়ী প্রাকৃতিক নিয়মেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বা ঝরে যায়। আবার নতুনভাবে গজায়। কিন্তু মানব জাতির জন্যে আল্লাহ্ ভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন। লোম এবং নখ তাদেরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তবে মানুষেরই আবিষ্কৃত যন্ত্র দিয়ে তা মাঝে মাঝে কেটে ফেলতে হয়। যদি মানুষের

---

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৮০।

লোম এবং নখ বাড়তেই থাকে এবং কর্তন করা না হয় তাহলে তাদের আকৃতি এরূপ অদ্ভুত আকার ধারণ করবে যে, মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টকর হয়ে পড়বে।

এরপর মানব জাতির সৃষ্টি এভাবে করা হয়েছে যে, কোন ময়লা বা নোংরা বস্তু একবার দেহ থেকে বের হয়ে আবার দেহে প্রবেশ করলে অথবা দেহের সাথে মিশে থাকলে এটা স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য এটা কোন অসুবিধার কারণ নয়।

কোন কোন জাতি এবং সন্ন্যাসব্রত পালনকারী লোক দেহের সর্ব-প্রকারের লোম এবং হাত ও পায়ের নখ কর্তন করা বা মুড়িয়ে ফেলা ধর্মত নিষিদ্ধ বলে মনে করে। তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই এগুলো বাড়তে থাকে। মধ্যযুগে ইউরোপের খৃস্টান পাদ্রিগণ লোম এবং নখ কর্তন না করা, গোসল করা ও উত্তম আহার থেকে বেঁচে থাকা পুণ্যের কাজ মনে করত। জনসাধারণের নিকট তাদের সিদ্ধিলাভের মাপকাঠি ছিল স্বাস্থ্যরক্ষার বিরোধী কাজ দীর্ঘস্থায়ীভাবে অনুশীলন করা। যে যত লোম না কাটবে, গোসল না করবে, পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত না করবে, সে-ই সবচেয়ে বেশী পুণ্যবান ও সিদ্ধ পুরুষ বলে পরিগণিত হতো।

ইসলামের বিধান উপরিউল্লিখিত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তার মাথায় লোম থাকে, যেগুলো পরিষ্কার বা কর্তন করা সম্পর্কে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। বালেগ বা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের বগল ও নাভীর নীচে লোম গজিয়ে থাকে। পুরুষের দাড়িও গজায়। মহিলাদের মাথার চুল ব্যতীত এ সমস্ত লোম না কেটে প্রাকৃতিক নিয়মে বাড়তে দেওয়া ইসলাম পসন্দ করে না। সঠিক নিয়মানুযায়ী এগুলো কর্তন করা বা মুড়িয়ে ফেলা অত্যন্ত জরুরী বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

জুম'আ ও দুই ঈদের দিন পুরুষের চুল কাটা, পুরুষ ও মহিলা গোসল করে চুল পরিষ্কার এবং আঁচড়ানো, তৈল এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরী বলা হয়েছে।[১] পুরুষের গোঁফ বা ঠোঁটের উপরের

১. তাজরীদে বুখারী, কিতাবুল জুম'আ, হাদীস নং ৪৫৮ ও ৪৬১।

লোম এতটা ছোট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে এগুলো মুখের ভিতর এসে না পড়ে। এই লোম বেশী দীর্ঘ হলে নাক এবং মুখের ময়লা মিশে নোংরা হয়ে যায়। ফলে মুখের ভেতর ময়লা ঢোকে। এটা স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বিরোধী।

বগল এবং নাভীর নীচের লোম মুড়িয়ে ফেলার কঠোর নির্দেশের উপকারিতা আছে। মানুষের রান এবং বাজু বা বাহু সবচেয়ে বেশী নড়াচড়া করে। এ নড়াচড়ার চাপ ঐ স্থানে সবচেয়ে বেশী পড়ে, যেখানে পা শরীরের সাথে যুক্ত হয়েছে। এ সমস্ত সংযুক্ত স্থানে বালেগ হওয়ার সাথে সাথে লোম গজাতে থাকে। শরীরের এ অংশ সর্বদা কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে। বেশী নড়াচড়ার ফলে—বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই সংযুক্ত অংশে খুব ঘাম বের হয় এবং লোমের সাথে জমে খুব দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। যদি এ সমস্ত লোম না কাটা হয় তবে সেখানে খোস-পাঁচড়া ও ফোঁড়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগ হওয়ার আশংকা থাকে। যদি এগুলো অনেক বড় হয়ে যায় তখন এগুলোতে উকুন সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন রোগ হওয়ারও আশংকা থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন মুসলমান ডাক্তার বলেন, ইউরোপীয় এবং অন্যান্য অমুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে গুপ্ত স্থানের লোম পরিষ্কার করার কোন প্রচলন নেই। অধিকাংশ সময় যুদ্ধে রত থাকার ফলে সৈন্যেরা পরিচ্ছন্নতার দিকে বেশী দৃষ্টি রাখতে পারে না। অপরিচ্ছন্নতার প্রতিক্রিয়া দেহের গুপ্ত স্থানেই বেশী করে পড়ে। ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে গুপ্তস্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ঐ ডাক্তার বলেন, গুপ্ত স্থানের লোম না কেটে প্রাকৃতিক নিয়মে বাড়তে দেওয়া যৌন শক্তির উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ইসলামে মাথার চুল এবং দাড়ি আঁচড়ানো ও পরিপাটি করে রাখা অত্যন্ত ভালো[১] বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এগুলো এলোমেলো ও নোংরা করে রাখা অপসন্দনীয় বলা হয়েছে। যেহেতু স্বাস্থ্যের উপরও এর প্রতিক্রিয়া পড়ে।

---

১. মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০৮৫।

স্বাস্থ্যরক্ষার এ সমস্ত নিয়ম-কানুন অন্য কোন ধর্মীয় বিধানে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্যের লোকেরাও এর কোন গুরুত্ব দেয় না। গত দুইটি মহাযুদ্ধে যখন বিভিন্ন জাতির লোকের মাঝে একত্রে উঠাবসা হলো এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে তারা জ্ঞাত হল তখন অনেকেই তা গ্রহণ করল।

পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে গুপ্ত স্থান সম্পর্কিত রোগের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে অথবা মাটির আকৃতি তৈরী করা হয়েছে এগুলো তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি অমনোযোগিতার লক্ষণ বলে মনে হয়। বর্তমানে তো মাজন এবং দাঁতের ব্রাশ, টুথপেস্ট ইত্যাদির সাথে চুল পরিষ্কারের বিভিন্ন ঔষধ সম্পর্কে খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেখা যায়।

প্রত্যেক মানুষই আপন চেহারা এবং চুল সুন্দর পরিপাটি করে রাখার চেষ্টা করে। কেননা সর্বপ্রথম এগুলোর উপরই মানুষের দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু সমস্ত গোপন লোম নিয়মিত পরিষ্কার করা না হলে স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, এগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। মহানবী (স.) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এ সমস্ত লোম বা চুলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে যে জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন, তা অন্য কোন ধর্মের নেতা বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী আজও দিতে পারেনি। এর দ্বারা উপলব্ধি করা যায় যে, মহানবী (স.) কত সুদূরপ্রসারী গুণী, জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি দুগ্ধপোষ্য শিশুর নখ বেড়ে যায়, তাহলে কোন কোন সময় ঐ হাতের দ্বারা আপন আপন চেহারা বা মুখমণ্ডল যখম করে থাকে। কেননা শিশুরা বেশী হাত-পা নড়াচড়া করে থাকে। মানবদেহে নখের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও বিষাক্ত অন্য কোন বস্তু নেই। নখ দ্বারা শরীর চুলকানো ডাক্তারগণ কঠোরভাবে নিষেধ করে থাকেন। নখের যখম কোন কোন সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। পাশ্চাত্যের লোকেরা নখের ক্ষতিকর কার্যাবলী জেনেও এর থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে না। নখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্যে বাজারে বিভিন্ন প্রকার রেত পাওয়া যায়। ইউরোপীয় মহিলা এবং তাদের

সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুসারী এশিয়া ও আফ্রিকায় মহিলারা নখ পরিষ্কার ও রঙীন করার জন্যে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান নেইল পালিশ ব্যবহার করে থাকে। নখ কেটে লম্বা ও ধারালো করে রাখে। ফলে এগুলো বিড়ালের থাবার চেয়ে বেশী ধারালো হয়ে থাকে। এভাবে তারা হাতের নখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে গিয়ে পায়ের নখের প্রতি আদৌ যত্নবান হয় না।

ইসলামী বিধান অনুযায়ী জুম'আ ও দুই ঈদের দিন চুলের সাথে সাথে হাত-পায়ের নখ কাটার নির্দেশ রয়েছে। নখের ময়লা এবং বিষ থেকে বাঁচার জন্যে গোল করে নখ কাটা উত্তম।

নখের মত বগলের লোমও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রাকৃতিক নিয়মে এগুলো বাড়তে দেওয়া স্বাস্থ্য ও পবিত্রতার সম্পূর্ণ বিরোধী। মাঝে মাঝে মুড়িয়ে দেওয়া একজন মুসলমানের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়। এমনকি তাদের হাত-পায়ের নখ বৃদ্ধি পেলে মনের উপর এক প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যখন এগুলো কেটে ফেলে বা পরিষ্কাব করে ফেলে, তখন নিজকে হালকা এবং পরিচ্ছন্ন মনে হয়।

ইউরোপীয় জাতি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে খুব ছিমছাম মনে হয়-যার উপর তারা গৌরব করে থাকে। প্রত্যহ দু'একবার দাড়ি এবং গোঁফ এমনিভাবে পরিষ্কার করে যে, মনে হয় চামড়াও কেটে ফেলবে। এ চামড়া নরম এবং পরিষ্কার রাখার জন্যে কয়েক প্রকার সুগন্ধি ক্রিমও ব্যবহার করে। কিন্তু নখ এবং গুপ্ত স্থানের লোম না কেটে প্রাকৃতিক নিয়মে বাড়তে দেয়। এটা কিরূপ বুদ্ধিমানের কাজ বুঝে আসে না।;

আমরা ভেবে হতভম্ব হয়ে যাই যে, ইউরোপের জ্ঞানীদের এর উপর কেন ঘৃণা জন্মে না? প্রকৃতপক্ষে এরা এভাবে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। যেভাবে তারা মলমূত্র ত্যাগের পর পানি দ্বারা পরিচ্ছন্ন না হয়ে টবের পানিতে নেমে গোসল করে অথবা প্যাকেট করা খাদ্য খেয়ে এবং গন্ধ নিয়ে অভ্যস্ত হয়েছে।

এটা বলা ঠিক নয় যে, লজ্জাস্থান এবং বগলের লোমের ক্ষতি সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই অন্যান্য জাতির

চেয়ে খৃস্টানরা মুসলমানদের সাথে বেশী সম্পৃক্ত ছিল। কখনো এ সম্পর্ক শত্রু হিসেবে আবার কখনো মিত্র হিসেবে বজায় ছিল। এদের মধ্যে জ্ঞানীরা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু নখ ও লোম সম্পর্কে এ কার্যকর এবং স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কিছু কারণ রয়েছে।

ইসলামের উন্নতির যুগে খৃস্টানরা জাহিলিয়তের সংস্কারে আবদ্ধ ছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক পথের সন্ধানের জন্যে পাদ্রীদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকত। পাদ্রীদের সাথে বিমুখ হয়ে থাকা ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার নামান্তর ছিল পাদ্রীরা ইসলাম ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষপূর্ণ ও ভুল ব্যাখ্যা করত যে, সন্ধি এবং বন্ধুত্বের সময় তাদের অন্তরে এক প্রকার হিংসা বিরাজ করত। মুসলমানদের যে কোন আচার-অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করা ধর্মীয় নিষেধজ্ঞা মনে করা হত। পাদ্রীরা মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠানের উল্টা কাজ করে নিজেদের আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করত এবং খৃস্টানদেরকে ইসলামের সার্বজনীন নীতি ও সৌন্দর্য গ্রহণ করা থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করত।

মুসলমানরা যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত ও হালাল খাদ্য খেত তখন পাদ্রীরা ময়লা ও কদর্যভাবে থাকত এবং নোংরা খাদ্য খেত। যদি মুসলমানরা প্রত্যহ গোসল করত তা হলে পাদ্রীরা সারাজীবন গোসল করত না। মাঝে মাঝে মুসলমানরা নখ ও লোম কর্তন করলে তারা এগুলো না কেটে প্রাকৃতিক নিয়মে ছেড়ে দিত। মোটকথা, পাদ্রীরা সবদিক দিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করত। ফলে খৃস্টানরা তাদের পদাংক অনুসরণ করত।

এখন সমাজ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছে। যাদের উপর তারা রাজত্ব করত আজ তাদের প্রজা হয়েছে। সুতরাং শত বছরের সৃষ্ট বিদ্বেষের সাথে শাসকদের অধীনস্থ করার নেশা প্রভৃতি খৃস্টানদেরকে ইসলামী বিধান গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

আল্লাহতা'আলা মানুষ ছাড়া প্রত্যেক জীব-জন্তুর দেহ এমনিভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা কঠিন আবহাওয়ার মুকাবিলা করতে পারে। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ্ জ্ঞান দিয়েছেন এবং তাদের নিজের তৈরী আসবাব দিয়ে উপকারিতা লাভ করা এবং এগুলো দিয়ে উন্নতি করার সুযোগ দিয়েছেন। মানুষ প্রথম বৃক্ষের পাতা দিয়ে শরীর ঢাকত এবং গর্তের মধ্যে বাস করত। কিন্তু এখন আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকার পোশাক পরিধান করে এবং জাঁকজমকপূর্ণ দালানে বাস করে ক্রমেই উন্নতি করে চলছে। মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সৌন্দর্য বর্ধনে এখন পোশাক-পরিচ্ছদ একটি অদ্বিতীয় শিল্পে পরিণত হয়েছে।

অন্যান্য ধর্মীয় বিধানে ও কৃষ্টিতে যদিও পোশাক-পরিচ্ছদকে দেহের সৌন্দর্য ও হিফাজতের উপায় হিসেবে গণ্য করা হয় কিন্তু পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কোন সঠিক নিয়মাবলী এসব ধর্মে নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম উপরিউক্ত দু'টো ছাড়া গুপ্ত স্থান সতর ঢেকে রাখা পোশাকের দ্বিতীয় উপকারিতা বলে ঘোষণা করেছে।[১] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, "যখন মসজিদে (নামাযের জন্য) যাও, সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করে যাও।"[২] অর্থাৎ পরিষ্কার-পোশাক পরে ইবাদত কর। কেননা ইসলামে জামা'আত বা সম্মিলিতভাবে ইবাদত করার বিধান রয়েছে। তাই যে কোন জামা'আতে উত্তম ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে যাওয়াই উত্তম। যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার জন্য এ নীতি অবলম্বন করে তার পোশাক কখনো ময়লা বা নোংরা হতে পারে না।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, "বান্দার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোকে কে হারাম বা নাজায়েয বলতে পারে?[৩] ক্ষমতা অনুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করা এবং সুন্দর হয়ে থাকা আল্লাহ্ পসন্দ করেন। এতে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে থাকে।

---

১. সূরা 'আরাফ, রুকূ ৩।
২. ঐ।
৩. সূরা আরাফ, রুকূ ৪।

পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কিন্তু মখমল বা অন্যান্য মূল্যবান পোশাকও অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন হলে সৌন্দর্য বৃদ্ধির পরিবর্তে আরো বেশী খারাপ দেখায়। অন্য লোকের দৃষ্টিতে সে হেয় প্রতিপন্ন হয় পুরাতন বা ছেঁড়া পোশাকও পরিচ্ছন্ন হলে মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং পোশাক পরিধানের আনন্দ অনুভব করে থাকে।

মহানবী (স.) কৃত্রিমতা ও বাহ্যিক জৌলুস অপসন্দ করতেন। কিন্তু কোন কোন সময় খুব মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন।[১] উপঢৌকন হিসেবে বিভিন্ন রাজা-বাদশার প্রেরিত মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করতেন। অবশ্য এর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। অন্যান্য ধর্মের সন্ন্যাসব্রত পালনকারীরা উত্তম খাদ্য, এমনকি উত্তম পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান থেকেও বিরত থাকে। সন্ন্যাসব্রত পালন করা এবং অভুক্ত থেকে আত্মকে কষ্ট দেওয়া ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ। তাই হুযুর (স.) নিজের বাস্তব জীবনের কার্যাবলীর দ্বারা উত্তম আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন।

মহানবী (স.) অধিকাংশ সময় সাদা রঙের পোশাক-পরিধান করতেন। তা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সমুজ্জ্বল হতো। কোন কোন সময় তিনি রঙীন ও ডোরাদার পোশাকও পরিধান করতেন। তবে সাদা রঙ তাঁর বেশী পসন্দ ছিল। মৃত ব্যক্তির কাফনের জন্যেও সাদা রঙ পসন্দ করতেন। সাদা রঙের কাপড়ে সামান্য একটু দাগ লাগলেই তা সহজে দেখা যায়।

হুযুর (স.) পুরুষের জন্য লাল রঙ অপসন্দ করতেন। একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) লাল রঙের পোশাক পরিধান করে হুযুর (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হুযুর (স.) বললেন, "এটা কিরূপ পোশাক?" হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) গিয়ে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। মহানবী (স.) শুনে বললেন, "না পুড়ে কোন মহিলাকে দিলেই হতো।"[২] অর্থাৎ মহিলাদের লাল রঙ ব্যবহার জায়েয আছে।

একদিন হুযুর (স.) ময়লা পোশাক পরিধানকারী এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন, "তার কি এতটুকু ক্ষমতা নেই যে, পোশাক পরিষ্কার করে।"[৩]

---

১. আবু দাউদ, কিতাবুল্লিবাস বাবে লুবসুস সাউফ ওয়াশ্‌শিরি।
২. আবু দাউদ, বাবে ফিল হুমরা।
৩. মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৪০৮৫।

অন্য আর এক ব্যক্তি ময়লা বস্ত্র পরিধান করে হুযুর (স.)-এর নিকট হাযির হলে হুযুর (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, "উত্তম ও পরিষ্কার পোশাক পরিধানের ক্ষমতা আছে কি?" লোকটি বললো, "জি হ্যাঁ।" হুযুর (স.) বললেন, 'আল্লাহ্ যে নিয়ামত দান করেছেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা প্রকাশ করা চাই।'[১]

মহানবী (স.) পোশাক-পরিচ্ছদে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। জুম'আ ও ঈদের দিন ক্ষৌরকাজ করা, গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য। কিন্তু পুরুষের জন্যে রেশমের বস্ত্র পরিধান করা নিষিদ্ধ।[২] এ ধরনের পোশাক পরিধান করা হলে পুরুষের শৌর্য-বীর্যের পরিবর্তে নারীদের স্বভাবগত দুর্বলতা প্রকাশ পায়। হ্যাঁ, খারেশ (চুলকানি) জাতীয় কোন রোগের কারণে রেশমের বস্ত্র-পরিধান করা যায়।

লুঙ্গী, পায়জামা,[৩] সালওয়ার ইত্যাদি পায়ের গোড়ালীর নীচে পর্যন্ত পরিধান করা ঠিক নয়। এতে তাকাব্বরী এবং অহংকার ছাড়াও পোশাক খুব শীঘ্র ময়লা হয়ে যায়। এ ধরনের পোশাক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার বিরোধী। অনেক সময় এরূপ পোশাকে লেগে যাওয়া ময়লা বা নোংরা বস্তু মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং কাপড়ও অল্পদিনের মধ্যে ফেটে যায়।

আমাদের দেশে কোনো কোনো এলাকার মানুষ এতো বড় লম্বা চওড়া লুঙ্গি পরে যে, চলার সময় তা মাটি সংপটিয়ে চলে। ফলে দৌড় দেবার প্রয়োজন হলে দেখা যায় হাত দিয়ে টেনে ধরে তবে দৌড়োচ্ছে নতুবা চিৎপটাং হতে হতো।

নামাযের প্রারম্ভেই একটি দোয়া আছে, 'হে আল্লাহ্! তুমি আমার গুনাহ এমনি পরিষ্কার করে দাও, যেরূপ সাদা কাপড় ধুলাবালি ও ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়।' মোটকথা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক আত্মিক জীবনের জন্যেও অতি প্রয়োজন বলে স্বীকার করা হয়েছে।

পাত্র

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সুমিষ্ট ও নির্মল পানীয় দ্রব্য এবং

---

১. মিশকাত, হাদীস নং ৪১১৩।
২. তাজরীদে বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ৮০২।
৩. সূরা ওয়াকিয়া ঃ রুকু ২, সূরা যুখরুফ রুকু ৭, সূরা গাশিয়া ঃ রুকু ১।

স্বর্ণ-রৌপ্য চাকচিক্যময় পাত্রের কথা উল্লেখ আছে।[১] যদিও এগুলো পরকালের সাথে সম্পর্কিত, তথাপি এখানে পাত্রের পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ পাওয়া যায়।

ইসলাম জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যেমনভাবে সহজ-সরল পথের শিক্ষা দেয়, তেমনি পাত্র সম্পর্কে সহজ পন্থার নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে আহার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২] কেননা এতে মনে গৌরব ও অহংকার আসতে পারে।

পাত্র পরিষ্কার করা সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশ রয়েছে। কোন পাত্রে কুকুরে মুখ দিয়ে এটা একবার বালি দিয়ে ঘসে সাতবার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে।[৩] এমনিভাবে অপবিত্র জীব-জন্তু কোন পাত্রে মুখ দিলে প্রয়োজনানুযায়ী ধৌত করতে হবে।

মহানবী (স) এরূপ পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন যেগুলো শরাব, মদ্য ইত্যাদি পান করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। তিনি এটাও বলেছেন যে, এরূপ পাত্র কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম কোনটাই করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এ নির্দেশের মধ্যে অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাথে মুসলমানদের পানীয় (মদ্য, শরাব) দ্রব্যাদি হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাড়ীঘর ও ইবাদতখানা

জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা যেমনিভাবে মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন, তেমনি আরামে বসবাস করা এবং কঠোর আবহাওয়া থেকে বেঁচে থাকার আসবাব-পত্র সংগ্রহের বোধশক্তিও দান করেছেন। মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষা বসবাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমান যুগে মানুষ বিশ্রামাগার এবং বাসস্থান নির্মাণের ব্যাপারে দ্রুতগতিতে উন্নতি করে চলছে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে বাসস্থান সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

---

১. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩।
২. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫২৯।
৩. তিরমিযী, ২য় খণ্ড, আবওয়াবিল আশরিবাহ।

ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাতদখানা খুব প্রশস্ত ও সুন্দর হওয়া দরকার। পবিত্র কুরআনে প্রশস্ত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত বালাখানার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মহানবী (স.) মসজিদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

অধিকাংশ ধর্মেই বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান মসজিদ, মন্দির বা গির্জাতেই হয়ে থাকে। এ সময় প্রচুর লোকের সমাগম হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি অনুযায়ী এ সমস্ত মন্দির বা গির্জা তৈরী করা হয় না। পক্ষান্তরে ইসলাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য প্রশস্ত ও খোলা মসজিদের কথা বলেছে এবং সাপ্তাহিক জুম'আর নামায শহরের বড় মসজিদে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। তাছাড়া বাৎসরিক দুই ঈদের নামায শহরের খোলা মাঠে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। এরপর সবচেয়ে বিরাট ইসলামী সমাবেশ হলো হজ্জ, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লাখো মানুষ পবিত্র মক্কা নগরীতে জমা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কিত সমস্ত অনুষ্ঠান খোলা মাঠেই হয়ে থাকে। সেখানে সংকীর্ণতা বা দম বন্ধ হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ইসলামী 'ইবাদতখানা আরো একটি দিক দিয়ে বিশেষত্ব রাখে, যা অন্যান্য ধর্মের ইবাদতখানায় পাওয়া যায় না। ওযু করা বা পবিত্রতা অর্জন করা ইসলামী ইবাদতের জন্য এত প্রয়োজন যে, সেটা ছাড়া নামাযই হয় না। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মসজিদে ওযু ও গোসলখানা এবং পায়খানা ও প্রস্রাবখানার সুবন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে, যাতে প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তিই জামা'আতের পূর্বে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং পবিত্রতা অর্জন করে নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারে।

পোশাকের পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, "যখন তোমরা কোন মসজিদে যাও, তখন সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে যাও।" এ সম্পর্কিত অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "হে মানব জাতি! যে কোন ইবাদতখানায় তোমরা সজ্জিত হয়ে যাও। পানাহার করো কিন্তু অপচয় করো না। কেননা আল্লাহ্ সীমাতিক্রমকারীকে পসন্দ করেন না।"[১]

১. সূরা আ'রাফ, রুকূ ৩।

এখানে একটি মাত্র আদেশ দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, মসজিদ —জামে মসজিদ, ঈদগাহ, হজ্জের স্থান প্রভৃতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখার নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আয়াতে যে 'জীনত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, এর মধ্যে শরীর, পোশাক বা ইবাদতখানার পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতি উত্তম পোশাকেও যদি সামান্যতম নোংরা বস্তু লেগে থাকে তা পরিধানকারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না কিন্তু পুরাতন ও ছেঁড়া কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে এটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ইবাদতখানায় সুগন্ধি ছড়িয়ে দেওয়া এবং 'ইবাদতকারীদের শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদে সুগন্ধি ব্যবহার করে আসা উত্তম।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, মসজিদ বা 'ইবাদতকারীদের সৌন্দর্য এবং পানাহারের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে? এখানে উভয়ের বর্ণনা একই স্থানে হওয়ার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, পানাহারে সীমাতিক্রমের বর্ণনা দ্বারা অতি সূক্ষ্মতার সাথে মসজিদের প্রকৃতি ও পূর্ণ পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ রয়েছে।

ইসলামী বিধানে হালাল ও পবিত্র খাদ্যের জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উত্তম খাদ্যও অধিক পরিমাণে ভোজন করলে বদহজমের আশংকা থাকে। ফলে পেটে অস্বাভাবিক বায়ুর সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ধরনের লোক মসজিদে প্রবেশ করলে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয় এবং সমবেত মুসল্লীদের খুব কষ্ট হয়।[১]

মসজিদের পরিচ্ছন্নতার জন্য হুযূর (স.) কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। একদিন তিনি মসজিদের দেয়ালে থুথু দেখে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হলেন এবং কাঠের টুকরা দ্বারা তিনি নিজ হাতেই পরিষ্কার করলেন। এরপর কাপড়ের একটি টুকরা নিয়ে বললেন, "এভাবে থুথু ফেলতে হয়। অর্থাৎ কাপড়ে এমনিভাবেই থুথু ফেলা উচিত যেভাবে আজকাল রুমালে ফেলা হয়। এরপর কেউ ঐ স্থানে সুগন্ধি ছড়িয়ে দিলেন. তখন হুযূর (স.) খুব খুশী হলেন।"[২] একজন সাহাবী নামাযের মধ্যেই

১. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ওযূ, হাদীস নং ১৩৬।
২. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ৩৯৫—৪০৫।

থুথু ফেললেন। হুযুর (স.) বললেন, "এ ব্যক্তি যেন আর নামায না পড়ায়।"[১] অধিকাংশ সময় তিনি বলতেন, "মসজিদের দেয়াল, ফরাস, সিঁড়ি ইত্যাদিতে থুথু ফেলা উচিত নয়।"[২]

জুম'আর দিন অঙ্গারধানিকা বা সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালানোর নির্দেশ দিতেন। তাই আগরবাতি বা কর্পুর জ্বালানো হতো।[৩]

একজন বৃদ্ধ হাবশী মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। তিনি ইন্তিকাল করলেন। জনগণ তাঁকে দাফন করার পর হুযুর (স.) এ কথা জানতে পারলেন। তিনি বললেন, "আমাকে জানালে আমিও জানাযায় অংশগ্রহণ করতাম।" এরপর হুযুর (স.) তাঁর কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করলেন।[৪] এ ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়, হুযুর (স.)-এর দৃষ্টিতে মসজিদ পরিচ্ছন্নতাকারীর কত মর্যাদা ছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মসজিদে নোংরা বায়ু মলদ্বারে বের হওয়া অন্যদের পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক। তাই এই 'হদসে আসগার' বা ছোট নাপাকী হতে পবিত্র হওয়ার জন্যে ওযু করার শর্ত নির্ধারণ করে ইসলাম 'ইবাদতখানা' পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার এক উত্তম পন্থা নির্দেশ করেছে। এরপর হুযুর (স.) আরো বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি কাঁচা রসুন বা পেঁয়াজ খেয়ে যেন মসজিদে না আসে এবং পোশাক বা দেহে এমন কোন দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধ বা অন্য কিছু মেখে না আসে, যাতে মসজিদে নামাযীদের কষ্ট হয়।"[৫]

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (স.)-এর উপরিউক্ত বাণী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম এবং মহানবী (স.)-ই একমাত্র নেতা যিনি ধর্মীয় সমাবেশে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যরক্ষার কার্যকরী নীতি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

---

১. নাসাঈ, কিতাবুল মাসাজিদ ও মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৮০।
২. মিশকাত, কিতাবুল মাসাজিদ।
৩. নাসাঈ, বাবুল বুখুর, পৃষ্ঠা নং ৭৬৪।
৪. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ৪৪৪।
৫. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৫১।

পানাহার

মানবজীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বায়ু ও আলো ছাড়া খাদ্যও প্রয়োজনীয় হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। এর পরিচ্ছন্নতা বা ময়লাযুক্ত হওয়া উত্তম স্বাস্থ্য গড়ে তোলে অথবা ক্ষতি করে। মানব জীবনের এই প্রয়োজনীয় বিশেষ দিকটির প্রতি ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশও দিয়েছে।

ইসলাম ও য়াহুদী শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন ধর্মেই মানুষের পানাহার সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট বিধি-বিধান পাওয়া যায় না। কোন্ কোন্ জন্তুর গোশ্ত খাওয়া জায়েয ও না-জায়েয—এ সম্পর্কে শুধু তাওরাতে বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এর ভেতরে কি গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য রয়েছে তা এবং অন্যান্য পানাহার সম্পর্কে কোন নির্দেশ নেই।

নেশাযুক্ত দ্রব্য যেমন শরাব সম্পর্কে তাওরাত গ্রন্থে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং ১৮-২২ শতকের সম্রাটদের আমলে প্যালেস্টাইনের প্রশংসা করে এটাকে নেশা বা শরাবের ভূমি বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ইসলাম মানুষের জন্যে পানাহারে হালাল-হারাম সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে এবং এগুলো গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার যে অমূল্য বিধান রয়েছে, তাও বর্ণনা করেছে।

এটা সর্বজনস্বীকৃত এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও এর সমর্থন করে যে, পানাহারের দ্রব্য আপন সৃষ্ট গুণাবলী দ্বারা শুধু স্বাস্থ্যের উপরই প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট করে না; বরং চরিত্রের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রতিক্রিয়া এগুলোর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কোন কোন দ্রব্য পানাহার করলে উপকারের পরিবর্তে মারাত্মক ক্ষতি করে। আবার কোন দ্রব্য গ্রহণে ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ক্ষতিকর বস্তু যদি সামান্য পরিমাণ খাওয়া হয় তাহলে কোন কোন খাদ্যে বেশ উপকার পাওয়া যায়। আবার কোন উত্তম বস্তুও যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত খাওয়া হয় তাহলে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে যদি ঔষধ হিসেবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে সামান্য পরিমাণ বিষ খাওয়ানো হয় তবে ভালো

উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু পরিমাণের বেশী হলে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শরাব বা মদ শক্তি যোগায়। কঠিন শীতেও দেহে শক্তি বৃদ্ধি করে ও উষ্ণতা আনয়ন করে কিন্তু মন-মগজ এবং চরিত্র পরিবর্তন করে ফেলে। সাধারণ পানাহার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে প্রয়োজন। কিন্তু পরিমাণের বাইরে আহার করা হলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

জোসেফ ক্রেড তাঁর 'ট্রেডারস ইন উইমেন' নামক গ্রন্থে (১৯৩৯ খৃস্টাব্দে লন্ডনে প্রকাশিত) এক ধরনের গাছের শিকড়ের (জড়ী বোটী) কথা উল্লেখ করেছেন, যা তামাকের মত সিগারেট বানিয়ে পান করা হয়। এটা পানকারীর দেহে শক্তি ও জোশ সৃষ্টি করে। কিন্তু এর দ্বারা মস্তিষ্কে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, সে কাউকে হত্যা না করা পর্যন্ত শান্ত হয় না। এমনিভাবে দুনিয়ার অনেক লোকই শূকরের মাংস খেয়ে থাকে। এটা শরীরে শক্তি বৃদ্ধি করে কিন্তু সাথে সাথে নানাবিধ রোগেরও সৃষ্টি করে।

পানাহারের দ্রব্য সামগ্রীর এই উপকারিতা ও অপকারিতার দৃষ্টি-ভঙ্গিকে সামনে রেখে ইসলাম এগুলোর মধ্যে হারাম ও হালালে বিভক্ত করেছে কিন্তু এ বিভক্তির মাঝে কঠোরতা থাকলেও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হয়েছে। এগুলোর হালাল-হারাম এবং জায়েয-নাজায়েযের মধ্যে এমন কি হিকমতে পরিপূর্ণ বিধান রয়েছে যার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও মেলে না।

যেমন একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক বিপদজনক বিষ দ্বারা কোন রোগীর চিকিৎসা করে উপকার করে থাকেন তেমনি ইসলাম হারাম বস্তুর ক্ষতি-কর দিক বর্ণনা সত্ত্বেও অক্ষম ও অসহায় মুহূর্তের সময় তা গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। যদি ইসলাম হারাম বস্তু সম্পর্কে উদার না হতো এবং হালাল বস্তু ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ না করত, তাহলে হালাল হারামের বিভক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ত।

পবিত্র কুরআনে শরাব ও জুয়া হারাম হওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত কৌশলের সাথে আবেদন পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "জুয়া এবং শরাব ক্ষতিকর কিন্তু এতে মানুষের জন্যে উপকারও রয়েছে। তবে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী রয়েছে।[১] একজন বুদ্ধিমান সর্বদা এরূপ বস্তু বা

১. সূরা বাকারা, রুকূ ২৭।

এমন গর্হিত কাজ হতে বেঁচে থাকে, যাতে উপকারের চেয়ে ক্ষতির আশংকা বেশী থাকে।

ইসলামে শূকরের মাংস খাওয়া সম্পর্কে কঠিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের মনে ঘৃণাও রয়েছে। তা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন "অতি ক্ষুধার কারণে যদি মৃত্যুর আশংকা হয় এবং শূকরের মাংস ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া না যায় তখন এতটুকু পরিমাণ খাওয়া জায়েয, যাতে জীবন রক্ষা পায়।"[১] এমনিভাবে কোন রোগীর জন্য শরাব বা নেশা-জাতীয় দ্রব্য ছাড়া যদি অন্য ঔষধ কার্যকর হিসেবে না পাওয়া যায় তখন বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী তা ব্যবহার জায়েয আছে।

যে কোন খাদ্যদ্রব্য শুধু হালাল হওয়াই যথেষ্ট নয়। এর সাথে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র হওয়াও প্রয়োজন। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে যেখানেই হালাল বস্তুর বর্ণনা আসে, সেখানেই 'তাইয়েবাত' শব্দ (পবিত্র বস্তু) ব্যবহৃত হয়েছে। কোন বস্তু হালাল হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র এবং আহারের উপযুক্ত নাও হতে পারে। যেমন হালাল জন্তুর গোশত, ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য। এমন কি যদি পানি ঘোলাটে হয়ে রং পরিবর্তন হয়ে যায়, তা হলে তা পবিত্র থাকে না। তখন এর ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে হালাল জন্তুর গোশত পবিত্র হলে খাওয়া জায়েয কিন্তু এগুলোর রক্ত হারাম। রক্ত চাই পান করা হোক বা আকৃতি পরিবর্তন করে গ্রহণ করা হোক[২] এ জন্যই হালাল জন্তু যবেহ করার জন্যে ইসলামী শরীয়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন জন্তুর দেহ হতে সমস্ত রক্ত বের হয়ে যায়। যদি এর শরীরে রক্ত বাকী থাকে তাহলে গোশত তাড়াতাড়ি নোংরা ও বাসী হয়ে যায়। রক্তের সাথে এবং রক্ত ছাড়া পাক করা গোশ্তের স্বাদেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ কারণেই কোন রোগে মৃত পড়ে গিয়ে মৃত, লাঠি-পাথর ইত্যাদির আঘাতে মৃত অথবা হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণে মৃত হালাল জন্তুর গোশ্ত হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[৩]

১. সূরা বাকারা, রুকূ ২৯; সূরা মায়িদা, রুকূ-১।
২. সূরা মায়িদা, রুকূ-১।
৩. ঐ

য়াহুদীদের ছাড়া মুসলমানদের মত আর কোন জাতিই জন্তু যবেহ করে না।

ইউরোপীয়রা বিদ্যুতের তাপে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে দেহের রক্ত বের না করেই এটা মেরে ফেলে এবং খাদ্য হিসেবে বিভিন্নভাবে জন্তুর রক্ত ব্যবহার করে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানমতে রক্তে কয়েক প্রকার জীবাণু থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'হে বিশ্বাসিগণ! ঐ সমস্ত বস্তু হারাম বলো না, যা আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করে দিয়েছেন এবং সীমাতিক্রম করো না। আল্লাহ্ তা'আলা সীমাতক্রমকারীকে পসন্দ করেন না। যা কিছু আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও।"[১] সাধারণভাবে হালালকে হারাম করার অর্থ এই বলা হয় যে, সে সমস্ত বস্তু, যেমন কোন কোন গোশ্ত ও ফল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "এগুলো হালাল কিন্তু তোমরা নিজ ইচ্ছামত এগুলো হারাম করো না।" কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে উপরিউক্ত বাক্যের এই অর্থও হতে পারে যে, হালাল এবং পবিত্র দ্রব্যের আকৃতি বা অবস্থা পরিবর্তন করে হারাম ও অপবিত্র করে খেয়ো না। যেমন আঙুর ও অন্যান্য ফল এবং তরকারী হালাল ও পবিত্র; কিন্তু এগুলো ছেঁচে খামির বানিয়ে শরাব তৈরী করা, হালাল জন্তুর গোশত ছেঁচে অথবা এগুলো সঠিক পন্থায় যবেহ না করে খাওয়া, হালাল বস্তুকে হারাম করে খাওয়া সীমাতিক্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে এটা বলা বাহুল্য হবে না যে, মানব দেহে শক্তি সঞ্চয় ও বৃদ্ধি করার জন্যে খাদ্য হলো গোশত। গোশত ছেড়ে যারা সর্বদা শাক-সবজি খেয়ে থাকে তাদের অনেকেই ভীরু হয়ে থাকে। এ সমস্ত দ্রব্য আহারকারী ব্যক্তির শরীরে মেদ জমে কিন্তু শক্তি খুব কম হয়ে থাকে।

বিভিন্ন প্রকার গোশতের মধ্যে পাখি ও মাছ সবচেয়ে উত্তম। পবিত্র কুরআনে সমুদ্র এবং পানি হতে ধরা শিকার এবং গোশত উত্তম বলা হয়েছে। বেহেশতের অজস্র নিয়ামতের মধ্যে পাখির গোশতের খুব প্রশংসা করা

১. সূরা মায়িদা, রুকূ ১২।
২. সূরা মায়িদা, রুকূ ১৩।

হয়েছে।[১] পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহর কিতাবে হারাম-হালালের বেশীর ভাগ মাস'আলা গোশত সম্পর্কে, যদ্দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, ইসলামে মানুষের খাদ্যের প্রধান ও উত্তম অংশ গোশতকেই বলা হয়েছে।

স্বল্পাহার

ইসলাম পানাহারে হালাল দ্রব্য পবিত্র হওয়ার শর্ত আরোপ করেছে। এর সাথে আহারের পরিমাণ সম্পর্কেও নিয়মাবলী পেশ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, "পানাহার কর কিন্তু অপব্যয় করো না। আল্লাহ্ অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না।"[২] "অপব্যয় করো না, অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।"[৩] মহানবী (স.)-এর বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তিনি সারা জীবন অত্যন্ত সাদাসিধে এবং কম আহার করতেন। জীবনে তিনদিন একাধারে পেট ভরে আহার করেন নি।[৪] আরব সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়ার পরও তাঁর এ অভ্যাস বলবৎ ছিল। নিজ পরিবারবর্গ এবং সাহাবা-ই-কিরামদেরও তিনি এ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলতেন, "বেশী আহার হতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাও।[৫] ক্ষুধার চেয়ে বেশী আহারকারীকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন না।[৬]

মহানবী (স.)-এর আরো একটি বক্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, "আহার এ পরিমাণ করবে, যাতে দু'এক লোকমার ক্ষুধা বাকী থাকে।"[৭] এ পদ্ধতি গ্রহণ করলে খাদ্য সহজে হজম হয়ে দেহে শক্তি ও রক্ত উৎপাদন করে। পাকস্থলী খাদ্যে বেশী পূর্ণ হলে হজম শক্তি হ্রাস পায়। ফলে ভুক্ত খাদ্য শক্তি উৎপাদনের চেয়ে দেহে দুর্বলতা আনয়ন করে।

---

১. সূরা ওয়াকিয়া, রুকূ ১।

২. সূরা আ'রাফ, রুকূ ৩,।

৩. সূরা বনী ইসরাইল, রুকূ ৩।

৪. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭১০।

৫. استعذا بالله من الرغب

৬. ان الله يبغض الاكل فوق شبعة

৭. বুখারী, কিতাবুল আতাইমা।

একদিন জনৈক ব্যক্তি হুযুর (স.)-এর সামনে ঢেকুর তোলে, যা অধিক পরিমাণে আহারের ফলে সৃষ্টি হয়। তখন হুযুর (স.) বললেন, "পেটের এক অংশ খাদ্য, এক অংশ পানি দিয়ে ভর্তি করতে হয় এবং বাকী এক অংশ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করার জন্য খালি রাখতে হয়।"[১] কত সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন তিনি! চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা বিভিন্ন রোগের জন্য উত্তম প্রতিষেধক।

একটি সাধারণ পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাবে যে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য দিয়ে একটি বোতল ভর্তি করতে হবে এবং এর ভেতর সম্ভব অনুযায়ী পানি দিতে হবে। এরপর শক্ত করে কর্ক লাগাতে হবে। কয়েকদিন পর এর খামির বা সিরাপ উঠতে শুরু করবে। তাপের কারণে তখন হয়ত কর্ক ফেটে যাবে অথবা বোতলটি ফেটে যাবে।

পাকস্থলীতে খাদ্য ভর্তি হওয়ার পর একই অবস্থা হয়ে থাকে। বোতলে প্রথমে কোন উষ্ণতা বা আর্দ্রতা জমা থাকে না। কিন্তু পাকস্থলীতে প্রাকৃতিক নিয়মে উষ্ণতা ও বিভিন্ন প্রকার আর্দ্রতা জমা হয়। এর সাথে মিলে খাদ্য অতি সহজেই খামির হওয়া শুরু হয়। পাকস্থলীর মুখ পর্যন্ত যদি এই খাদ্য ভর্তি থাকে তাহলে কাজ তীব্রবেগে শুরু হয়। যার ফলে টক ঢেকুর এবং বায়ু নির্গত হতে থাকে এবং চতুর্দিকের বায়ু দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। এরূপ অধিক পরিমাণে আহারকারীকে বমি, ডাইরিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

ঔষধে ভর্তি বোতলে প্রয়োজনানুযায়ী মুখের নীচে খোলা রাখা হয়, যেন ঔষধ থেকে তাপ উঠলেও কোন ক্ষতি না হয় তেমনিভাবে পাকস্থলীর মুখ এবং খাদ্যদ্রব্য ও পানির মাঝে রাখা হয়। পেট খাদ্যে পূর্ণ ভর্তি হলে শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। কেননা ফুসফুসের উপর খাদ্যভর্তি পাকস্থলীর চাপ পড়ে।

দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রচলন রয়েছে। ইউরোপীয়দের সভায় ঢেকুর তোলা দূষণীয় মনে করা হয়। কিন্তু বায়ু বের হওয়াতে কোন আপত্তি নেই। কোন কোন এশীয় জাতির মধ্যে ঢেকুর তোলা দূষণীয় মনে

১. তিরমিযী, আবওয়াবুল আশরিবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০।

করা হয় না কিন্তু বায়ু বের হওয়া অত্যন্ত অপসন্দনীয় মনে করা হয়। অথচ উভয়ই অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণের ফল। এর দ্বারা বায়ু দুর্গন্ধ হয় যা স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিরোধী। ইসলামে উভয়ই দূষণীয় ও অপসন্দনীয়।

রোমবাসীদের মধ্যে অধিক আহারের প্রচলন রয়েছে। লোকেরা খেতে খেতে বমি করে, আবার খায়, আবার বমি করে। আমি নিজেই জনৈক ব্যক্তিকে এরূপ করতে দেখেছি।

পাশ্চাত্যের দেশে—বিশেষ করে আমেরিকায় বর্তমানে অধিক আহারের বিষয়টি রাষ্ট্র এবং চিকিৎসাবিদদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিক ও পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে শিশুরা মোটা তাজা হয়ে শীঘ্রই বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং এটা দীর্ঘজীবন লাভের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে ঐ সব দেশে বালেগ বা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার বয়স ধরা হয় বিশ বা একুশ বছর। তাদের পত্র-পত্রিকা এবং সেন্সাস ব্যুরো কর্তৃক রিপোর্টে জানা যায় যে, পনর-ষোল এমনকি দশ বছরের বালকও মেয়েদের সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। ফলে তারা মারাত্মক যৌন রোগে আক্রান্ত হয়। এ ছাড়া অধিক খাওয়ার ফলে তারা বিভিন্ন প্রকার পেটের রোগেও আক্রান্ত হয়ে থাকে।

জাতিসংঘের বিচার বিভাগের সহ-সভাপতি স্যার জাফরুল্লাহ খানকে এক বক্তৃতায় বলতে শুনেছি যে, 'যুক্তরাষ্ট্রে যে খাদ্যদ্রব্য অপব্যয় করা হয় তা দেখে হতভম্ব হতে হয়। হোটেল-রেস্তোরাঁয় পানাহারের পরে অবশিষ্ট খাদ্য এত অধিক পরিমাণে অপচয় হয় যে, তা অপচয় না করে জমা করা হলে ইংল্যান্ডবাসীদের একদিনের খাদ্যের সংস্থান হতে পারে।"

জাতিসংঘের সাবেক উপ-সচিব মরহুম শাহ্ বুখারী দীর্ঘদিন আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "এখানে (যুক্তরাষ্ট্রে) টাকা-পয়সা ও দ্রব্য সামগ্রীর প্রাচুর্যে যা খাওয়ার প্রয়োজন তার চেয়ে দশগুণ বেশী অপচয় করা হয়।"[১]

হিন্দুরা অন্য লোক—সে আত্মীয় হোক না কেন—তার অবশিষ্ট খাদ্য খাওয়ায় অত্যন্ত অপমান বোধ করা হয়। কলকাতা এবং বাংলাদেশে ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় আমি নিজে দেখেছি, সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের

১. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর।

উচ্ছিষ্ট খাদ্য নর্দমা ও ডাস্টবিনে ফেলে দেয়, যার পরিমাণ হাজার মণের কম হবে না। এদিকে দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রাম ও শহরের শত-সহস্র লোক অনাহারে রাস্তা-ঘাট ও স্টেশনে মৃত্যুবরণ করেছে।

ইসলাম অতিরিক্ত আহার ক্ষতিকর বলে নিষেধ করে। কিন্তু সাধ্য অনুযায়ী উত্তম সুস্বাদু খাদ্য পরিমাণমত আহার করায় ইসলাম বাধা দেয় না। আত্মাকে কষ্ট দেওয়া বা বৈরাগ্য ইসলাম সমর্থন করে না। উন্নত-মানের হালাল খাদ্য হুযুর (স.)-এর নিকট এলে তখনই তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করতেন। কিন্তু অধিক আহার অপসন্দ করতেন। পোশাক-পরিচ্ছদে যেমন তাঁর সরলতা ছিল তেমনি খাদ্যদ্রব্যও ছিল সাধারণ। তাছাড়া নির্ধারিত কোন খাদ্যদ্রব্যের প্রতি হুযুর (স.) আসক্ত ছিলেন না। রুটি, ছাতু, দুধ, ফল ইত্যাদি যখন যা মিলত তাই তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে পানাহার করতেন।[১] সরল জীবন যাপনের জন্যে তিনি সর্বদা নির্দেশ দিতেন।

মহানবী (স.) বলেছেন, "পাকস্থলী দেহের হাউজ বা কূপ স্বরূপ এবং শিরাসমূহ এর নর্দমা স্বরূপ। পাকস্থলী যদি সবল থাকে তাহলে শিরাসমূহ সুস্থ থাকে। পাকস্থলী যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে শিরাসমূহ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে (মিশকাত, ২য় খণ্ড পৃ. ৪২৯৩)। তিনি আরো বলেছেন, "কাফির সাত আঁতে আহার করে অর্থাৎ খুব বেশী পরিমাণে খায়, মু'মিন এক আঁতে আহার করে অর্থাৎ কম আহার করে।" দ্বিতীয়ত হুযুর (স.) মুসলমানের জন্যে কম খাওয়াকে ঈমানের অংশ বলে ঘোষণা করেছেন (মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২৫)।

অধিক আহারের ফলে বায়ুর উদ্রেক হয়। প্রত্যেক দেশেই পরিবেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণে জনগণকে অভ্যস্ত দেখা যায়। সর্বদা এর উপর অভ্যস্ত থাকলে স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। নির্ধারিত খাদ্য অনেক সময় সহজে মেলে না। এই খাদ্যের উপর অভ্যস্ত ব্যক্তি তাই অসুবিধায় পড়ে। ভারত বিভাগের সময় (১৯৪৭) আমি দেখেছি কোন কোন লোক অনাহারে কঠিন বিপদে পড়েছে। অথচ

১. তাজরীদে বুখারী, কিতাবুল আতইমা, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭০২, ৭১২ এবং শামায়েলে তিরমিযী।

ঐ সময় শুকনা রুটি পাওয়া কঠিন ছিল। অনেককে কয়েকদিন না খেয়ে থাকতে হয়েছে। অনেকে না খেয়ে মৃত্যুবরণও করেছে।

পানাহারের ব্যাপারে হুযুর (স.)-এর নির্দেশিত নীতি অনুসরণ করা হলে বেশ আরামেই জীবন কাটানো সম্ভব। আমি নিজে এ নিয়ম পালন করে অনেক বিপদে উপকার পেয়েছি।

আহার সম্পর্কে কয়েকটি উপকারী নির্দেশনা

পানাহার সম্পর্কে মহানবী (স.) কতগুলো মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। তা নিম্নে দেয়া হল ঃ

১. খাদ্যের সাথে তরকারী নিও, যদি তা পানিও হয়।[১] শুকনা রুটি অনেক দেরী এবং কষ্টে হজম হয়। তা সহজে খাওয়াও যায় না। তরকারী সাথে হলে ভালোভাবে চিবানো যায় এবং তাড়াতাড়ি হজম হয়। এমনিভাবে ভাতের সাথে ঝোল অথবা অন্য তরকারী অত্যন্ত জরুরী।

২. রাতের আহার না করা হলে খুব শীঘ্র বার্ধক্য আসে[২] এবং শরীর দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়।

৩. বাজারে কিছু খাওয়া নির্বোধের লক্ষণ।[৩] প্রথমত বাজারে আহার করা আদবের খেলাফ। দ্বিতীয়ত ধুলাবালি খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক রোগের কারণ হয়।

৪. মাটি খাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে হারাম।[৪] সাধারণত ছোট শিশু বা মহিলাদের মধ্যে এই কুঅভ্যাস দেখা যায়। এরূপ শিশু

---

১. ايتدموا ولو بالماء

২. তিরমিযী, ২য় খন্ড, আবওয়াবিল আতইমা, পৃষ্ঠা ৭।

৩. الاكل في السوق دناءة

৪. اكل الطين حرام على كل مسلم

ও মহিলারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যু বরণ করে। এ কারণেই হুযুর (স.) এটা সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

- মহানবী (স.) কখনো ঠেস দিয়ে পানাহার করতেন না।[১] এভাবে বসলে দেহে আরাম বোধ হয় কিন্তু খাদ্যনালী কিছুটা বাঁকা হয়ে থাকে বলে সামান্য বাধাপ্রাপ্ত হয়ে খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এর সাথে পাকস্থলী ও আঁত কিছুটা নিষ্কর্ম হয়ে থাকে। অথচ আহারের সময় এগুলোর কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। এছাড়া ঠেস দিয়ে বসে আহার করা কালে মনে অহংকারেরও উদয় হয়ে থাকে। হুযুর (স.) অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও খুব চিবিয়ে আহার করতেন এবং এভাবে আহারের জন্য নির্দেশ দিতেন।[২]

স্বাস্থ্যরক্ষার একটি অতুলনীয় পদ্ধতি

আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি প্রাণীদেহের জন্যে এরূপ পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন যে, প্রয়োজনানুযায়ী যদি পানাহার না মেলে তবে জীবন ধারণ কষ্টকর হয়ে পড়ে। পানাহারের যে পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি হবে এ পরিমাণে তার স্বাস্থ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। ক্ষুদ্র প্রাণী সকল তাদের আহারে সমতা বিধান করে চলে কিন্তু মানুষ সৃষ্টির সেরা এবং বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্র প্রাণীদের উল্টো সীমাতিক্রম করে থাকে। ফলে দেহের ভারসাম্য তিরোহিত হয়। অন্য কথায় নিজেই বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই অন্যান্য জীবজন্তুর রোগ মানবীয় রোগের সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না।

তবে মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় রোগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার নিরাপত্তামূলক চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকে। এ সমস্ত রোগ থেকে বাঁচার জন্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে যা বলা হয়ে থাকে তা হলো কিছুদিন পরপর পানাহার বন্ধ করে পাকস্থলীকে খালি

১. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭০৬ ও শামায়েলে তিরমিযী, পৃ. ১০

২. বুখারী, কিতাবুল আতইমা।

করে বিশ্রাম দিতে হবে, যেহেতু এর উপর সুস্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে। পাকস্থলী শূন্য থাকলে এর ক্ষতিকর বস্তু জ্বলে পরিষ্কার হয়, ফলে এর হজম শক্তি বেড়ে যায়।

পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মে পাকস্থলী খালি রাখার বিধান রয়েছে। প্রচলিত অর্থে এটাকে রোযা বলা হয়। হিন্দুরা ২৪ ঘণ্টার জন্য উপবাস বা রোযা রাখে। তরকারী বা আগুনে পাক করা কোন দ্রব্য তারা এ সময় ভক্ষণ করে না। তবে কাঁচা দুধ, পানি, হুক্কা ইত্যাদি পান করাতে কোন ক্ষতি মনে করে না। বর্তমান যুগের খৃস্টান সম্প্রদায় শুধু মাছ, গোশ্ত ও অন্যান্য কয়টি দ্রব্য ছাড়া সব কিছুই রোযার মধ্যে খেয়ে থাকে। এমনিভাবে য়াহুদীদের মধ্যে কোন কোন দ্রব্য রোযার মধ্যেও খেতে নিষেধাজ্ঞা নেই।

ইসলামে একটি পূর্ণ চান্দ্রমাস হিসেব করে রোযা রাখা হয়। চন্দ্র এবং সৌর বছরের পার্থক্যের কারণে ৩৬ বৎসরের মধ্যে রোযা শীত ও গ্রীষ্মকালে আবর্তিত হয়। এভাবে ৫০ বা এর চেয়ে বেশী বয়সের লোকেরা উভয় ঋতুতে রোযা রাখার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

রমযান মসের রোযা প্রত্যেক বালেগ, 'আকিল বা বুদ্ধিমান এবং সুস্থ মুসলমান নরনারীর উপর ফরয। এছাড়া মুসলমান স্বেচ্ছায় আরো অন্যান্য রোযাও রাখে, যেগুলোকে নফল রোযা বলা হয়। ইসলামী রোযা সুব্হে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাখতে হয়। এ সময় সর্বপ্রকার পানাহার, সহবাস, এমনকি আনুসঙ্গিক অন্যান্য কাজও নিষিদ্ধ। পান, বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা ইত্যাদি হতে বিরত থাকাও অবশ্য কর্তব্য। এ ধরনের যে কোন বস্তু ব্যবহার করা হলে রোযা ভেঙ্গে যায়।

এ ধরনের রোযা আত্মনিয়ন্ত্রণের অদ্বিতীয় উপায়। যুবকরা গ্রীষ্মকালে যখন প্রথম প্রথম রোযা রাখে, তখন পিপাসা দমন করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। তারা ওযুর সময় কুল্লী করে কিন্তু একফোঁটা পানি গলার ভেতর প্রবেশ করায় না। বিশেষ করে গোসলের সময়—যখন তাকে কেউ দেখে না—এ সময় পানি হ'তে বেঁচে থাকা-সত্যিই চরম সততা ও সাহসিকতার কাজ!

তাছাড়া আত্মিক ও চারিত্রিক উপকারিতা ছাড়া ইসলামী রোযা পাকস্থলীর পীড়া এবং দেহের বিষাক্ত বস্তুর জন্য সমার্জনীর মত কাজ করে, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ক্ষুধা-পিপাসায় শক্তি যোগায়। রোযা খোলার সময় পানাহারের মধ্যে একজন রোযাদার যে আনন্দ লাভ করে তা বর্ণনাতীত।

বর্তমান যুগের চিকিৎসাবিদগণ ইসলামী পদ্ধতিতে রোযা রাখা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী বা ফলপ্রদ বলে স্বীকার করেছেন। এমনকি কোন কোন রোগের জন্যে ইসলামী পদ্ধতিতে রোযা রাখার ব্যবস্থাও তাঁরা দিয়ে থাকেন।

প্রসঙ্গক্রমে এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম কোন মানুষের উপর তার ক্ষমতার বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধী। সুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা প্রত্যেক বালেগ মুসলমান নরনারীর উপর ফরয। কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তি, ভ্রমণকারী, বৃদ্ধাবস্থা, গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকারিণীর জন্যে রোযা রাখা ঐ সময় ফরয নয়। কেননা এতে স্বাস্থ্য আরো বেশী খারাপ হয়। হ্যাঁ, যদি চিকিৎসক রোগের প্রতিষেধক হিসেবে রোযার বিধান দিয়ে থাকেন তাহলে রোযা রাখা যেতে পারে।

এভাবে একাদিক্রমে রোযা রাখাও নিষিদ্ধ।[১] কেননা রোযার এ নিয়মাবলী গ্রহণ করা হলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়।[২]

আধুনিক শিক্ষিত লোকদের পক্ষ থেকে এখানে একটি প্রশ্ন উঠে থাকে। তা হল উত্তর গোলার্ধ—যেখানে ছয় মাস রাত এবং ছয়মাস দিন থাকে অর্থাৎ যেখানে একদিন আমাদের এক বছরের সমান, সেখান সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কুরআনের বিধানানুযায়ী রোযা রাখা একেবারেই অসম্ভব। এর উত্তরে আমরা প্রথমত বলতে পারি যে, ইসলাম কারো ক্ষমতার বাইরে তার উপর কোন বিধান প্রয়োগ করে না। দ্বিতীয়ত সেখানকার বাসিন্দারা নিজ কাজকর্ম, পানাহার, নিদ্রা, খাওয়া ও জাগ্রত হওয়ার জন্যে যে ভাবে সময় নির্ধারণ করে, তেমনিভাবে নামায ও রোযার জন্যেও করতে পারে। কেননা একদিন হুযুর (স.) বর্ণনা করলেন ইয়াজুজ-মাজুজের সময় দিন এক

১. তাজরীদে বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ৬১৩।

২. এটা রমযান মাসের জন্য প্রযোজ্য নয়—অনুবাদক।

বছরের সমান হবে। তখন সাহাবা-ই-কিরাম (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তখন আমাদের কি একদিনের নামায যথেষ্ট হবে? হুযূর (স.) বললেন, "না, তোমরা নামাযের জন্যে সময়ের অনুমান করে নাও।"[১]

রাশিয়ার একজন শরীরবিজ্ঞানী ডাঃ প্রফেসর ডি. এন. নাকিটন দীর্ঘায়ু সম্পর্কে ঔষধের বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৯৬০ সালের ২২শে মার্চ লন্ডনে বলেন. "যদি নিম্নের তিনটি নিয়ম পালন করা যায় তাহলে শরীরের বিষাক্ত দ্রব্যাদি বের হয়ে বার্ধক্য থামিয়ে দেবে। প্রথম, অধিক পরিশ্রম কর। এটা এরূপ উপকারী, যা মানুষের দেহের শিরা-উপশিরায় সতেজতা ও সজীবতা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, অধিক পরিমাণে ব্যায়াম কর। বিশেষ করে অধিক পরিমাণে চলাফেরা কর। তৃতীয়ত, যে খাদ্য তোমরা পসন্দ কর, খেতে পারো কিন্তু প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে একদিন অভুক্ত থাক।[২]

মহানবী (স.) বছরে এক মাস রোযা ছাড়াও প্রতি মাসে তিন-চারটি করে নফল রোযা রাখতেন এবং বলতেন صوموا تصحوا অর্থাৎ রোযা রাখ এবং সুস্থ থাক। হুযূর (স.) মৃত্যুপীড়ার সময় হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে যে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন, এর মধ্যে প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখারও নির্দেশ ছিল।[৩]

পানাহারের নিয়মাবলী

ইসলাম যেমন পানাহারের প্রকার ও পরিমাণ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে তেমনি পানাহারের নিয়মাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। এর মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এমন কোন ব্যবস্থা বা নির্দেশ পানাহারের ব্যাপারে নেই যা কোন পরিবেশে পালন করা কষ্টকর হয়।

হিন্দুদের মধ্যে আহারের সময় কাঁচা গোবর দিয়ে লেপা আসনে বসে আহার করা ধর্মীয় বিধান। তাদের বিশ্বাস হলো এই যে, এক পা আসনে

---

১. মুসলিম, বাবুযিকরুদ্দাজ্জাল।
২. এ. এফ. পি.
৩. বুখারী ও মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১২০৭।

এবং অন্য পা জমি বা মাটিতে রাখা হলে মানুষের দেহের দ্বারা মাটির অপবিত্র বস্তু আসনে বিস্তার লাভ করবে। আসন এভাবে অপবিত্র হলে এর উপর রক্ষিত দ্রব্যাদি অপবিত্র হয়ে একজন হিন্দুর আহারের অযোগ্য হয়ে হয়ে যায়। এ ধরনের হিন্দুরা আহারের পূর্বে গোসল করা অত্যন্ত জরুরী মনে করে। কেউ কেউ গোসল করে খাদ্য রান্না করে। উনুন থেকে কাউকে আগুন পর্যন্ত দেওয়া নিষিদ্ধ মনে করে। কেননা এভাবে খাদ্য পাকানো হলে তা অপবিত্র হয়ে যায় বলে তারা মনে করে।

হিন্দুদের ছাড়া অন্য কোন ধর্মে পানাহারের কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। বিভিন্ন যুগে প্রচলিত পদ্ধতিকে তারা গ্রহণ করে থাকে। এদের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কোন পদ্ধতি দৃষ্ট হয় না। যেমন বর্তমান যুগে ইউরোপীয় সভ্যতায় টেবিল-চেয়ার, কাটা-চামচ ইত্যাদি আহারের সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এদের অনুসরণ করে এশিয়া এবং আফ্রিকাবাসী নিজেদের পরিবেশের উল্টা এ পদ্ধতি গ্রহণ করে চলছে। অথচ এটা অপচয় ও অধিক খরচ ছাড়া আর কিছুই নয়, যা বিত্তহীন লোকদের জন্য বিরাট বোঝা হিসেবে গণ্য হয়।

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল, পানীয় দ্রব্যের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী পাত্র, তশতরী, কাটা-চামচ, ছুরি ইত্যাদি ছাড়াও প্রত্যেকের জন্য এক-একটি আলাদা সিটের প্রয়োজন হয়। আহারের জন্যে টেবিল যদিও একটি কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে, এক-একটি চেয়ার, চাদর, রুমাল, সাবান ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। মোটকথা এভাবে সাত-আট ব্যক্তি সমন্বিত একটি পরিবারের বছরে কয়েক হাজার টাকা বাড়তি খরচ হয়। এ সমস্ত দ্রব্য যত্ন করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। পানাহারের এ পদ্ধতি ঐ জাতির উন্নতি ও অর্থের প্রাচুর্যে যুগেই সম্ভব হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কেউ এগুলো জানত না।

বলা হয়ে থাকে উপরিউক্ত পদ্ধতি স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জন্যে অতি উত্তম। হাঁ, এটা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্যে—যারা মলমূত্র ত্যাগের পর পবিত্রতা অর্জন করা, নখ কাটা, আহারের পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করা, কুল্লী করা, ডান হাতে আহার করা অপসন্দ করে এবং এগুলো অর্থনৈতিক চাপ বহন করতে পারে। কিন্তু যারা অপবিত্রতা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে

এবং এগুলোকে ধর্মীয় বিধান বলে মনে করে অথবা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এতো নিম্নে যে, সন্তানদের জন্য পেট পুরে খাদ্য যোগাড় করতে অক্ষম, তারা কিভাবে এরূপ অপচয়ের অভ্যাস গড়ে তুলবে ?

বিখ্যাত ইংরেজী পরিব্রাজক কাপ্তান কুক, যিনি প্রথম অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি হিট্টি উপদ্বীপের বাসিন্দাদের পরিচ্ছন্নতা দেখে আশ্চর্য হয়ে বর্ণনা করেন যে, এ সমস্ত লোক পানাহারের পূর্বে বা পরে হাত ধৌত করে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আঠারো শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও ইংরেজরা জানত না যে, পৃথিবীতে এরূপ লোকও বাস করে যারা পানাহারের পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করে !

ইসলামী আচার-অনুষ্ঠানে লালিত পালিত একজন মুসলমানের পক্ষে পানাহারের পূর্বে ও পরে হাত ধৌত না করা বা কুল্লী না করা খুবই অপসন্দনীয়। কিন্তু বর্তমান তথাকথিত আধুনিক সভ্য লোকদের কথা হলো আহারের উপর হাত স্পর্শ করলে তা খারাপ হয়ে যায়, এটা একেবারে নিরর্থক কথা। খাদ্য ঐ সময় দূষিত হবে যখন অপরিষ্কার ও নোংরা হাতে তা মন্থন করা হয়। অথবা আঙ্গুলে যখন দীর্ঘ নখ থাকে। তাদের দৃষ্টিতে হাতে খাদ্য স্পর্শ করলে দূষিত হয় কিন্তু মাখন মিশ্রিত টোস্ট, কেক, পেস্ট্রি ইত্যাদি শুকনা হোক বা আর্দ্র, হাতে স্পর্শ করলে এটা দূষিত হয় না। এগুলো সাধারণত ছুরি বা চামচ দিয়ে খাওয়া যায় না বরং হাতের দ্বারাই মুখে দেওয়া হয়। অনেক সময় মুখে আঙ্গুল প্রবেশ করে কিন্তু তারা এটা অপসন্দ করে না।

পানাহারের এ পদ্ধতি কেবল সম্পদশালীদের জন্যে। কিন্তু ইসলাম পানাহারের জন্যে এরূপ সহজ ও সরল পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছে যা যে কোন পরিবেশে কার্যকর করা যায়। এটাই পানাহারের বিধিও বটে। এদিকে ইসলাম সংকীর্ণতাকে শিক্ষা দেয়নি। যদি কেউ সম্পদশালী হয় এবং তার ক্ষমতার বাইরে না গিয়ে ও অপচয় না করে সম্ভব হলে মাটির বিছানা বা চৌকাঠ ছেড়ে মখমলের বিছানা অথবা চেয়ার-টেবিলে বসে হাত ও ছুরি দিয়ে আহার করতে পারে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে মহানবী (স.)-এর ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তিনি সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকা সত্ত্বেও আহারের পূর্বে হাত ধুয়ে নিতেন এবং অধিকাংশ সময়ে মাটিতে বসে আহার করতেন। আহারের পর কুল্লী করতেন এবং হাত ধুতেন। দুধ পান করে কুল্লী করতেন। দাঁতের মাড়ি থেকে খাদ্যদ্রব্যের টুকরা বের করে ফেলতেন।[১] তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় মিসওয়াক করতেন, যার ফলে মুখে কোন আহার্য দ্রব্য থাকত না।

দাঁতের মাড়ি থেকে ভুক্ত দ্রব্য বের করার জন্যে মুসলমানেরা ধাতু নির্মিত খেলালের প্রচলন করেছে, যা পরিচ্ছন্নতার জন্যে খুবই উত্তম।

হুযুর (স.) আহারের পূর্বে ও পরে ওযু করা বরকতের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন।[২] তিনি আরো বলেছেন, "যদি কেউ আহারের পর হাত ধৌত না করে শুয়ে পড়ে এবং তার কোন প্রকার রোগ হয়, তবে যেন নিজেকে নিজে খারাপ জানে।" তিনি ডান হাতে পানাহারের কথা বলেছেন এবং বা হাতে পানাহার থেকে নিষেধ করেছেন।

পরস্পর সুসম্পর্ক গড়ে তোলবার জন্যে এক পাত্রে আহারের কথা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] তবে রুচির পার্থক্য বা কোন রোগ থেকে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে পৃথক পাত্রে আহার করারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

একদিন কোন এক ব্যক্তি হুযুর (স.)-এর সাথে একই পাত্রে আহারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পাত্রের চারদিক থেকে তরকারী ও সব্জির টুকরা নিয়ে খাচ্ছিলেন। হুযুর (স.) বললেন, ডান হাতে খাও এবং যা তোমার সামনে, তা খাও। অতঃপর তশতরী ভরে বিভিন্ন ফল আনা হলো. তখন ঐ লোকটি তার সম্মুখ থেকে ফল খেতে লাগল।

---

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৭৯ ও ২৯৪।

২. শামায়েলে তিরমিযী, পৃ. ১৩।

৩. সূরা নূর, রুকূ ৫।

হুযূর (স.) তাঁকে বললেন, সম্মুখ থেকে খাওয়ার অর্থ এই নয় যে, ফল জাতীয় দ্রব্যও সম্মুখ থেকে খাবে।[১]

উপরিউল্লিখিত নির্দেশের উদ্দেশ্য এই যে, তরকারীর পাত্রে এদিক-সেদিক হাত লাগানো আদব-বহির্ভূত এবং এতে খাদ্য দূষিত হয়। কিন্তু অন্যান্য শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য বা ফলের বেলায় একই পাত্রে এরূপ হয় না।

পানাহারের দ্রব্যে ফুঁ দেওয়া গর্হিত কাজ। হুযূর (স.) এটা করতে নিষেধ করেছেন। স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতেও তিনি নিষেধ করেছেন। কেননা এতে অপচয় হয় এবং অন্তরে গৌরবের উদ্রেক হয়। কিন্তু এটা ইসলামের পসন্দ বা সমর্থনযোগ্য যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাত্র হতে হয়। স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর না হলে যে কোন বস্তু দিয়ে পাত্র তৈরী করা যায়।

পানীয় সামগ্রী

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট পানীয় দ্রব্যের মধ্যে পানি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত বা দান। এর পরিমাণ এবং পরিচ্ছন্নতার হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে মানব জাতি—এমনকি অন্যান্য প্রাণীর জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

বিশুদ্ধ পানি ও পানির উপকারিতা—যথা মৃতপ্রায় মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, তরুলতা, শস্য প্রভৃতিকে পানি দ্বারা জীবন দান করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বেহেশতের সুমিষ্ট পানির নালা ও ঝর্ণা এবং সজীব ফল-ফুলের বাগানের কথা কুরআনে এমনি আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইসলামের শত্রুও তা পাওয়ার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকে।[২]

বৃষ্টির পানি অতি উত্তম বলে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।[৩] চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে এ পানি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও উপকারী। হুযূর (স.) সুমিষ্ট ও ঠাণ্ডা পানি অত্যন্ত পসন্দ করতেন।

---

১. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭০১।

২. সূরা বাকারা, আন'আম, নহল ইত্যাদি।

৩. সূরা আন'আম, রুকু ১২; নহল রুকূ ২; রূম, রুকূ, ২।

অন্যান্য পানীয় দ্রব্যের মধ্যে পবিত্র কুরআনে মধুর অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে এবং এটা মানব জাতির জন্যে শেফা বা রোগমুক্তির মহৌষধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[১] হুযুর (স.) অধিকাংশ রোগে এটা ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন। একবার কোন এক ব্যক্তি মহানবী (স.)-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তার ভাই-এর পেটে ব্যথার কথা জানাল। তিনি বললেন "মধু পান করাও।" মধু পান করানো হলো কিন্তু কোন উপকার হলো না। লোকটি এসে হুযুর (স.)-কে এ কথা জানাল। তিনি পুনরায় মধু পান করার আদেশ দিলেন। এমনিভাবে তিনবার মধু পানের আদেশ দিলেন কিন্তু কোন উপকারই হল না। তাই লোকটি এসে চতুর্থবার হুযুর (স.)-কে এ একথা জানাল। তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা সত্য, যিনি বলেছেন মধুর মধ্যে নিরাময় ও শেফা রয়েছে। সুতরাং পুনরায় মধু পান করাও।" এবার রোগীকে মধু পান করানোর ফলে পাকস্থলী থেকে দূষিত পদার্থ বের হয়ে গেল এবং সে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করল।[২]

হুযুর (স.) খাঁটি মধু রুটির সাথে খেতেন এবং পানির সাথে মিশিয়ে শরবত হিসেবে পান করতেন।

ইউনানী চিকিৎসাবিদগণ এখনো ঔষধে চিনির পরিবর্তে মধু ব্যবহার করেন। এটা ঔষধ দূষিত হওয়া থেকে নিরাপদ রাখে। এর মধ্যে ফলমূল রাখা হলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাজা থাকে। ইংরেজদের ঔষধেও মধু ব্যবহার করা হতো কিন্তু এখন সেখানে গ্লিসারিন ব্যবহার করা হয়। আমাদের গ্রাম এলাকায় চোখের রোগে বা চোখে কিছু প্রবেশ করলে তাতে মধু দেওয়া হয়। এতে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মধুর পরেই পবিত্র কুরআনে দুধের প্রশংসা করা হয়েছে এবং একে উত্তম খাদ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] দুধ পান মানুষের স্বাস্থ্যে সজীবতা আনয়ন করে এবং উত্তম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যার দৃষ্টিতে এবং সর্বসম্মতিক্রমে

১. সূরা মুহাম্মদ, রুকু ২।
২. তাজরীদ, বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস নং ৭৭৬।
৩. সূরা নহল, রুকু ৯।

ছোট-বড়, সুস্থ-অসুস্থ, নরনারী, বৃদ্ধ-যুবক, দুর্বল ও শক্তিশালী প্রত্যেক মানুষের জন্যে দুধ একটি উত্তম খাদ্য। যে সমস্ত দ্রব্য দুধ হতে তৈরী হয় যেমন; দধি, মাখন, ছানা, ঘি—এগুলোও স্বাস্থ্যের জন্যে উত্তম। দুধের তৈলাক্ততা দুনিয়ার অন্যান্য তৈলাক্ত বস্তু হতে স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম বলে স্বীকৃত। হুযুর (স.) দুধ অত্যন্ত পসন্দ করতেন এবং অনেক সময় দুধ পান করেই আহার সমাধা করতেন।

এটা সর্বজনস্বীকৃত ও পরীক্ষিত যে, যে জাতির মধ্যে দুধ পান করা এবং দুধে তৈরী দ্রব্যাদি পানাহারের বেশী অভ্যাস প্রচলিত, তাদের স্বাস্থ্য সাধারণত ভাল হয়ে থাকে। দুধ এবং মধু মিলিয়ে পান করলে তা সোনায় সোহাগার কাজ করে। আমার এক ডাক্তার বন্ধু বলেছেন. "বোম্বাই শহরে আমি একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বৃদ্ধকে দেখেছি, তিনি মধুর সাথে বকরীর দুধ মিশিয়ে পান করতেন। বয়স জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তাঁর বয়স ১৫০ বৎসর।

পানি এবং অন্যান্য পানীয় সামগ্রী সম্পর্কে কতিপয় জরুরী নির্দেশ

পানীয় দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে মহানবী (স.) এমন কতকগুলো নির্দেশ দিয়েছেন, যেগুলোর উপকারিতা বর্তমান যুগে সর্বজনস্বীকৃত হয়েছে। এমন আরও কতকগুলো রয়েছে যেগুলোর উপর উন্নত জাতিরা আজও আমল করে। যেমন মহানবী (স.) বলেছেন, কোন পানীয় দ্রব্য একবারে পান করা অনুচিত বরং দু'তিনবার শ্বাস নিয়ে পান করতে হবে।[১] যদি একবারে গলাধঃকরণ করা হয় বা উটের মত ঘোঁৎ করে পান করা হয়, তাহলে অনেক সময় পেটে ব্যথা শুরু হয়। পিপাসাও দূর হয় না। কিন্তু থেমে দু'তিনবার শ্বাস নিয়ে পান করা হলে সামান্য পরিমাণেই শান্তি আসে, পিপাসা দূর হয়। গ্রীষ্মকালে কঠিন পিপাসা অনুভূত হয়। তখন শ্বাস না নিয়ে একবারে পানি পান করাতে কোন কোন সময় পানকারীর মৃত্যুর ঘটনাও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

এটাও দেখা গেছে যে, গ্রীষ্মকালে রোযার ইফতার করার সাথে সাথে কোন কোন লোক পেয়ালা ভর্তি পানি বা শরবত শ্বাস না নিয়ে পান করে

১. তিরমিযী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবাহ্, পৃ. ১০—১১।

থাকে। কিন্তু এত অধিক পরিমাণে পানি পান করা সত্ত্বেও তাদের পিপাসা নিবারিত হয় না। এ পদ্ধতি কোন কোন সময় ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি হুযূর (স.)-এর নির্দেশ পালন করা হয় তাহলে দু-এক পেয়ালাই এজন্যে যথেষ্ট।

এক ব্যক্তি মহানবী (স.)-এর নিকট অভিযোগ করল যে, পানি এক নিশ্বাসে পান করলে পিপাসা নিবারণ হয় না। তিনি বললেন, "পেয়ালা মুখ হতে সরিয়ে শ্বাস গ্রহণ কর, আবার পান কর।"[১]

হ্যাঁ, ঔষধের বেলায় এর ব্যতিক্রম আছে। কেননা এটা কয়েক চুমুক হয় অর্থাৎ স্বামান্য পরিমাণ এবং এর প্রতি বিস্বাদগ্রস্ত রোগীর জন্যে এভাবে পান করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। অতঃপর হুযূর (স.) ইরশাদ করেন, "পানি বা পানীয় দ্রব্য পান করার সময় পাত্রে নিশ্বাস ফেলা অনুচিত।[২] বরং শ্বাস নেওয়ার সময় পেয়ালা মুখ থেকে কিছুটা সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।"[৩] পানীয় দ্রব্য ছাড়াও যে কোন খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে এ নিয়ম গ্রহণ করতে হবে। হুযূর (স.) এটা অপসন্দ করতেন।

উপরিউল্লিখিত দু'টো নির্দেশ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে খুবই সাধারণ মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এর মাঝে বিরাট হিকমত রয়েছে এবং এটা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে উত্তম ও এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্যাপারটি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না।

শ্বাস গ্রহণের সময় বিশুদ্ধ বায়ু ভেতরে প্রবেশ করে এবং প্রশ্বাস বের হওয়ার সময় বায়ুর একটি অংশ অক্সিজেন হিসেবে ভেতরে থেকে এবং বাকী অংশ বিষাক্ত গ্যাস ও বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবাণু ইত্যাদি নিয়ে বের হয়ে আসে। এ বায়ুর মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর মত বিষাক্ত গ্যাসও বিদ্যমান থাকে। এই গ্যাস আর্দ্র বস্তুর সাথে সহজে মিশে যায়।

আমরা স্বীকার করি যে, মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাঝে অক্সিজেন ও কার্বন গ্যাসের অবস্থান এবং এগুলোর তরল বস্তু ও আর্দ্র বস্তুর

১. মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০২২।

২-৩. তিরমিযী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবাহ্, পৃ. ১০—১১।

সাথে মিশে যাওয়া বর্তমান যুগের আবিষ্কার। কিন্তু চৌদ্দশত বছর পূর্বে আরবের মত অনুর্বর দেশের একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিকে মানুষের নাসিকা থেকে বহির্গত নিশ্বাসের ক্ষতি সম্পর্কে কে জ্ঞান দিয়েছিলেন ?

কোন কোন লোক গরম চা, কফি ইত্যাদি ফুঁ দিয়ে পান করে থাকে। কিন্তু তারা জানে না যে, এ কাজ তাদের স্বাস্থ্যের জন্যে কত ক্ষতিকর ! মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে যে কোন গরম বস্তু মুখে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে পান করায় বা খাওয়ায়। কিন্তু তারা জানে না যে, প্রতি ফুঁ শিশুর খাদ্যে বিষের ভাগ বৃদ্ধি করে !

ইসলামে দাঁড়িয়ে পান করা বা আহার করা নিষেধ করা হয়েছে। তাই এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, "যদি তোমরা জানতে—দাঁড়িয়ে পানি পান করা কত ক্ষতিকর, তাহলে পান করা বস্তুও বমি করে ফেলে দিতে।"[১] দাঁড়িয়ে আহার করার বেলায়ও এরূপ নির্দেশ রয়েছে। ডাক্তারগণ বলেন, এভাবে পানাহার করলে কোন কোন সময় পেট ব্যথা শুরু হয় অথবা উদরাময় রোগ দেখা দেয়।

মহানবী (স.) বলেছেন, "রোদে উত্তপ্ত গরম পানি দ্বারা গোসল করা, ধৌত করা বা পান করা উচিত নয়। এর দ্বারা শ্বেতী রোগ হওয়ার আশংকা আছে। এটা বলা হয়েছে শুধু ঐ পানি সম্পর্কে, যা কোন পাত্রে ভর্তি করে রোদে গরম করা হয়। নতুবা কূপ, দরিয়া, ঝিল এবং সমুদ্রের পানি তো সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয়ে থাকে কিন্তু পানির পরিমাণ বেশী হওয়ার ফলে ঐ পানির মধ্যে এরূপ কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

আরো বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নদীতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করে তার দৈহিক শক্তি কমে যায়।[৩] কোন কোন সময় নদীতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করাতে কলিজার উপর বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারা দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। কোন কোন উষ্ণ অঞ্চলে খালি

১. মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০১১।

২. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৪১।

৩. من شرب الماء على الريق فقضت فولد

পেটে কখনো পানি পান করে না। এ ছাড়া মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা থেকেও নিষেধ করা হয়েছে।[১] নল বা পাইপ দ্বারা পানি পান সম্পর্কেও এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট। কোন কোন লোক এটা অপসন্দ করে। এভাবে পানি পানকারী ব্যক্তি যদি কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য লোকেরও এর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

পেয়ালার ভাঙ্গা অংশ দিয়ে পানি পান করা উচিত নয়।[২] কেননা এর দ্বারা কোন কোন সময় ঠোঁট যখম হয়ে যায়। বিশেষ করে সীসার তৈরী ভাঙ্গা পেয়ালা দ্বারা এর আশংকা বেশী। পাত্রের ভাঙ্গা স্থানে ময়লা থাকে, যা ধৌত করলেও সামান্যই পরিষ্কার হয় এবং পানির সাথে মিশে পাকস্থলীতে চলে যায়। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

হুযূর (স.) লবণ দিয়ে রোযা খুলতেন এবং এরপর পানি বা অন্য কিছু পান করতেন। এছাড়া তিনি আহারের পূর্বে এবং পরে খানিকটা লবণ খেয়ে নিতেন। ডাক্তারগণ বলেন, প্রতিকূল আবহাওয়ার ফলে অসুস্থতা বা পরিশ্রমের কারণে যখন শরীর হতে ঘাম বের হয়, তখন ঘামের সাথে শরীরের লবণাক্ততাও বের হয়ে যায়। এর ফলে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ক্ষয় পূরণের জন্যে লবণ অপরিহার্য। এজন্য ডাক্তারগণ গ্রীষ্মকালে পানির সাথে লবণ মিশিয়ে পান করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এই হিকমত ও কৌশলের কারণেই হুযূর (স.) রোযার ইফতারের সময় লবণ ব্যবহার করতেন। কেননা রোযার দ্বারাও, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে শরীর থেকে লবণ বের হয়ে যায়।

হুযূর (স.) আরো বলেছেন, গরম এবং ঠাণ্ডা দ্রব্য একত্রে খাওয়া উচিত নয়। বর্তমান যুগে ইউরোপীয় এবং তাদের আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণকারী জাতিসমূহ গরম চা পান করার সাথে সাথে আইসক্রিম খেয়ে থাকে অথবা এর উল্টোটাও করে থাকে। এভাবে পানাহার করার ফলে পাকস্থলী খারাপ বা কফ-সর্দি এবং গলায় ব্যথা হওয়ার আশংকা থাকে।

---

১. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৫৫-৭৫৬।

২. মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০২৪।

ফল, শাক-সব্জি ও স্বাস্থ্য

আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের মধ্যে ফলমূল, শাক-সব্জি মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। যে জাতি এগুলো ব্যবহার করে এবং এগুলো জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে। পাকস্থলীর উপর এগুলোর উত্তম ক্রিয়া দেখা দেয় এবং মন ও মস্তিষ্কে শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু এগুলোর আধিক্য এবং গোশত একেবারে ছেড়ে দেওয়া, যেরূপ কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে—দৈহিক শক্তি ও আত্মাকে দুর্বল করে দেয়। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পরিবর্তন এবং এর পরিমিত পরিমাণ স্বাস্থ্যের জন্য অতি উত্তম। শুধু একই প্রকার আহারের উপর সীমাবদ্ধতা স্বাস্থ্যের জন্যে সুষম নয়।

হযরত আলী (ক.) বলেছেন, "পেটকে জানোয়ারের কবর বানিও না। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যা শুধু গোশত খেয়ো না। গোশত ছাড়া আল্লাহ্ প্রদত্ত অন্যান্য নিয়ামত দ্বারাও উপকারিতা লাভ কর।" সকাল-সন্ধ্যা গোশত আহারকারীর চরিত্রে কিছু হিংস্রতা সৃষ্টি হয়। ফল এবং শাক-সব্জি ব্যবহার গোশতের তীব্রতা কমিয়ে দেয় এবং সংযত চরিত্র আনয়ন করে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বাগান, সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ফল, শাক-সব্জি ও তরি তরকারীর বর্ণনা আছে। সূরা 'আবাসা'-এর মধ্যে তরি-তরকারী এবং ফল সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "এগুলো তোমাদের এবং তোমাদের পালিত জানোয়ারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।"

সূরায়ে আন'আম-এর ১৭ রুকূতে বিভিন্ন প্রকার তরি-তরকারি এবং সুস্বাদু ফলের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "যখন এগুলো ফল দেয় তখন এদের ফল খাও এবং আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায় কর অর্থাৎ দরিদ্র লোকদেরকে ফল দান কর।" যেন এগুলো দ্বারা সমস্ত জাতি উপকার লাভ করতে পারে। অতঃপর বলা হয়েছে, 'অপচয় করো না' অর্থাৎ ফল এত অধিক না খাও, যার ফলে তোমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। যে দেশে ফল বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেখানে লোকেরা এগুলো বেশী

বেশী খেয়ে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে কলেরা এবং অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

হুযূর (স.) ফল এবং শাক-সব্জি বেশী পসন্দ করতেন। সব্জির মধ্যে কদু সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'কদু খাও, কেননা এটা মনকে শক্তি-শালী করে এবং মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করে।"[২] ফলের মধ্যে আঙুর, আনার এবং খেজুর হুযূর (স.)-এর সব চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল।[১] খেজুর তো আরব দেশে প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হুযূর (স.) এর অত্যন্ত প্রশংসা করছেন। বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে খেজুরকে উত্তম ফল হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং ফলের মাঝে এর ভেতর সবচেয়ে বেশী খাদ্যপ্রাণ আছে বলে জানা গেছে।

ফল-মূলের প্রতি আকর্ষণ বাগান ও বৃক্ষ রোপণের কারণে হয়ে থাকে। শাক-সব্জি, ও বৃক্ষলতা আবহাওয়ার উপর বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুসলিম জাতি যেখানেই শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে তাদের বৃক্ষ রোপণ এবং বাগান তৈরীবিরাট গুরুত্ব রেখেছে। আরব জাতি তো যেখানেই পৌঁছত, খেজুরের বৃক্ষ সাথে সাথে নিয়েই যেত। বর্তমান যুগে কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে এটাও প্রকাশ পেয়েছে যে, খেজুর বৃক্ষ এরূপ, যা যে কোন আবহাওয়া এবং যে কোন জমিতে ফল উৎপাদনে সক্ষম। বস্তুত আরবরা শত বৎসর পূর্বেই এটা প্রমাণও করেছে।

ইসলামী বিজয়ের পূর্বে অনেক রাজ্য এরূপ ছিল যে, সেখানে বাগ-বাগিচার নামগন্ধও ছিল না। মুসলিম শাসকগণ সেখানে বাগ-বাগিচার এত প্রচলন করেছেন যে, মনে হয় এটা বাগানেই পরিণত হয়ে গেল এবং এটা একটা জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত হলো। ভারত উপমহাদেশ এবং স্পেন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ পর্যায়ে ইউরোপীয়রা স্পেনের মুসলমান থেকে বিরাট উপকার লাভ করেছে। বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রত্যেক সম্পদশালী ও উন্নতিশীল দেশের শাসন ব্যবস্থায় কৃষি, বাগ-বাগিচা এবং বৃক্ষ রোপণ ও বন বিভাগের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

---

১. عليكم بالقرع فانه يشد الفؤاد و يزيد الدماغ

২. শামায়েলে তিরমিযী, পৃ. ১৪।

মাদক দ্রব্য ও স্বাস্থ্য

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের প্রেরিত দীন (ধর্ম) হিসেবে ইসলাম এমনি এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে যাবতীয় পানাহার্য বস্তুর হালাল-হারাম অথবা বৈধ-অবৈধের মাঝে ভাগ করে মানব জাতির উপর বিরাট করুণা প্রদর্শন করেছে। হযরত মূসা (আ.)-এর (প্রচারিত) শরীয়তেও এরূপ ভাগ করা দেখা যায় এবং তাতে বলা হয়েছে যে, ঐ বস্তু খাওয়া বৈধ এবং ঐ বস্তু অবৈধ কিন্তু এর দলীল বা সাক্ষ্য অথবা এর খাওয়া বা না খাওয়ার উপকারিতা বা অপকারিতা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

তাওরাতে নেশা জাতীয় বস্তু সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ নেই। হিন্দু ধর্মে আফিম, ভাং, চরস ইত্যাদির ব্যবহার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে গণ্য করা হয়। বেদগ্রন্থে মাদক দ্রব্য—বিশেষ করে সোমরস (ভাং)-এর অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে।

ইউরোপ বা খৃস্টানদের দেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এত অধিক শরাব ব্যবহার করা হয় যে, মনে হয় যেন শরাবের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে! প্রভুর নৈশকালীন ইবাদতের পবিত্র পদ্ধতির মধ্যে শরাব দিয়ে ভেজানো রুটি ইবাদতকারী নরনারী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে বণ্টন করা হয়। এটা খৃস্ট ধর্মে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। কেননা এই রুটি ঈসা মসীহর গোশত এবং এর সাথে মেশানো শরাব তাঁর রক্তের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

বর্তমান যুগে অমুসলিম জাতি উন্নত হোক বা অনুন্নত, শরাব এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্য জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু বলে মনে করে। এমনকি যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহ সৈন্যদের জন্য এ সমস্ত মাদক দ্রব্য আমদানী করে থাকে—যদিও তাদের সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে শরাব বা মাদক দ্রব্য যুদ্ধক্ষেত্রে আমদানী করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

ইসলাম ধর্মে শরাব, আফিম, গাঁজা, ভাং ইত্যাদি মাদক দ্রব্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে; এর পরিমাণ অধিক হোক বা অল্প।[১] পবিত্র কুরআনে প্রকাশ্যভাবে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা বাকারার সাতাশ রুকূতে ঘোষণা করা হয়েছে, "শরাব এবং জুয়া খেলা অত্যন্ত ক্ষতিকর, যদিও

১. তাজরীদে বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবাহ্, হাদীস নং ৭৪৫ এবং তিরমিযী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবাহ্, পৃ. ৮-৯।

এতে সামান্য কিছুটা উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু এর উপকারিতার চেয়ে ক্ষতিকর দিকটা বড়।"

এরপর সূরা মায়িদার বার রুকূতে ইরশাদ হচ্ছে, "এ অপ্রীতিকর কাজ শয়তানের প্ররোচিত। সুতরাং এর থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর।" এখানে শয়তানের অর্থ হল ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া। অর্থাৎ এ গর্হিত কাজ ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরপর আরো বলা হয়েছে, "শরাব এবং জুয়ার দ্বারা শয়তান তোমাদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে।"

ইসলাম প্রবর্তক মহানবী (স.) বলেছেন, ما اسكر كثيره فقليله حرام অর্থাৎ যে বস্তু অধিক পরিমাণে মাদকতা সৃষ্টি করে এর সামান্যতম অংশও হারাম।[১] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে হালাল ও হারাম—দু'ভাগ করেছে। শরাব এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের অনিষ্টকরণের দিক, যাতে মানুষের শারীরিক গঠনের উপর প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া পড়ে—এর ধারণা মাদক দ্রব্যে অভ্যস্ত লোকদের অবস্থার দ্বারা শরাবখানা এবং বর্তমান যুগের বিভিন্ন ক্লাবে গিয়ে সহজেই করা যায়।

বর্তমান যুগে মাদক দ্রব্যের সাধারণ প্রচলনের দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ কেউ বলে থাকেন, শক্তির জন্যে এবং শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্যে যদি সামান্য পরিমাণ মদ্যপান করা হয়—যা অতিরিক্ত মাতলামো সৃষ্টি না করে এবং জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি ঠিক থাকে, তবে এতে কি দোষ আছে? প্রতিবাদের প্রধান বিষয় হ'ল এই যে, এটা অধিক পরিমাণে পান করলে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এ সমস্ত লোক এটা ধারণা করতে পারে না যে, এটা এরূপ একটা কুঅভ্যাস, যা একবার রপ্ত করলে তার থেকে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং এর দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি ধ্বংসের অতল গভীরে তলিয়ে যায়। যদি কোন ক্ষতিকর বস্তুর সামান্য পরিমাণ থেকে বাঁচা না যায় তাহলে এর বিরাট অংশ থেকে মানুষ বাঁচতে পারে না। কোন ক্ষুদ্র অন্যায় বা পাপ করার ফলে বিরাট অন্যায় বা পাপ করার স্পৃহার উদ্রেক হয়।

---

১. তিরমিযী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আশরিবাহ্, পৃ. ৮-৯।

মহানবী (স.) সমস্ত হারাম বস্তুকে একটি সরকারী চারণভূমির সাথে তুলনা করেছেন, যার সীমানায় গৃহপালিত পশু চরানো বিপদ থেকে মুক্ত নয় এবং বলেছেন, "সে চারণভূমির নিকটও যেও না।"[১]

উদাহরণে হুযুর (স.) মানুষের 'নফসে আম্মারাকে চতুষ্পদ জন্তু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যা মানুষকে পাপের কাজে উৎসাহিত করে। সরকারী চারণভূমির বাইরে বিচরণকারী জন্তুগুলো এর ভেতর আকর্ষণীয় ঘাস দেখে পাশে দাঁড়িয়েই মুখ লাগাবার চেষ্টা করে, এমনকি কিছু খেয়েও ফেলে। এরপর এক পা ভিতরে রাখে এবং ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হয়। অবশেষে চারণভূমির মাঝে পৌঁছে এর থেকে বের হওয়া অপসন্দ করে—যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বের করে না দেয়। কিন্তু মানুষ স্বীয় ইচ্ছাধীন হওয়ার পরও যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করে তবে অন্য কেউ তার উপর জবরদস্তি করতে পারে না। জ্ঞানহীন জন্তুর তুলনায় মানুষের এ স্বাধীনতা অনেক সময় তার জন্য বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়। মধ্যভারতের রিটোল জেলায় কয়েকজন গ্রাম্য লোক একটি মদ্যশালায় বাজি ধরে যে, কে অতি অল্প সময়ে কমপক্ষে দশ বোতল শরাব পান করতে পারবে। একজন এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়। কিন্তু অধিক পরিমাণে পান করায় তার মাথা ঘুরে যায় এবং সে বেহুঁশ হয়ে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।[২]

মুসলিম জাতি মদ বা শরাবের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে 'উম্মুল খাবায়েস' অর্থাৎ সব মূল খবীছের মাতা বা অনিষ্টের মূল বলে স্বীকার করে থাকে। তবে যদিও এ নাম সঠিক কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা সমস্ত মাদকদ্রব্যের মূল বলে ঘোষণা করা উচিত। কেননা প্রত্যেকটি মাদক দ্রব্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে এবং ব্যবহারের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা পূর্ণাঙ্গভাবে মদের মধ্যে বিদ্যমান। অন্য কথায় সমস্ত মাদকতার ক্ষতিকর দিকটি এই একটি নেশার মধ্যে বিদ্যমান। আফিম, ভাং, গাঁজা ইত্যাদি যদি দুর্বল ও নিস্তেজ করে রক্তের সাথে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তাহলেও এ ধরনের সব প্রতিক্রিয়া এর মধ্যে বিদ্যমান। মদ্যপানকারী ব্যক্তি কোন কোন সময় উত্তেজিত

১. তাজরীদে বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৪৭।
২. এ. পি. পি. দিল্লী, ১ ই আগস্ট, ১৯৬০ ইং।

হয়ে গালি-গালাজ, এমনকি নিজে মৃত্যুর জন্যে বা অন্যকে হত্যা করতেও উদ্যত হয়। কখনো কাঁদতে থাকে, কখনো ভয়ে কাঁপতে থাকে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এরূপ আশ্চর্য, কুরুচিপূর্ণ ও অপ্রীতিকর কাজ করতে দেখা যায়, যা কোন জ্ঞানী বা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক দেখাই অপসন্দ করে।

বর্তমানে জাপানী পুলিশ নেশাগ্রস্ত হয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা ও অপ্রীতিকর কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের নিয়ে এক হাস্যকর ঘটনার অবতারণা করে থাকে। যখন তারা এ অবস্থায় থাকে, তখন সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা তাদের সমস্ত অসংলগ্ন কথাবার্তা টেপরেকর্ডে আবদ্ধ করেন। অতঃপর যখন তারা সঠিক অবস্থায় ফিরে আসে তখন রেকর্ডের সাহায্যে তাদেরকে তা শোনানো হয়। ফলে তারা লজ্জায় মাথা নত করে ফেলে।

যদিও অন্যের জন্যে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক বলে স্বীকার করা হয়, তাহলেও একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি আপন সাথীকে মদ্যপানে বাধ্য করে, যদিও সে মদ্যপানে অভ্যস্ত না হয়। মদ্যপানের বেলায় সে অত্যন্ত খয়ের খাঁ, দানশীল ও সদালাপী হয়ে থাকে এবং অন্যকে নিজের সমগোত্রীয় করার জন্যে স্বীয় ক্ষমতার বেশী ব্যয় করার জন্যে তৈরী থাকে। কোন কোন সময় এটাও দেখা গেছে যে, কোন অপরিচিত লোক মদ পানকারীদের দলে ঘটনাক্রমে প্রবেশ করেছে, তাহলে মাদকতায় সম্পূর্ণ বিবেকশূন্য হয়ে সে তাকেও বাধ্য করবে—এমনকি তাকে শুইয়ে দিয়ে হলেও তার মুখে জবরদস্তি করে মদ প্রবেশ করিয়ে দেবে।

বোম্বাই শহরে আমি নিজে দেখেছি যে, শিল্প-কারখানায় কর্মরত নারী-পুরুষ তাদের মাসিক বেতন নিয়ে বাচ্চাদেরসহ তাড়ির দোকানে চলে যায়। নিজেরা পান করে এবং বাচ্চাদেরকে মেরে তা পান করতে বাধ্য করে। এ কারণেই ইসলাম এরূপ জনসমাগমের নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে।

আমরা এখানে চতুর ও জ্ঞানী ইউরোপীয়দের জ্ঞানের ব্যাপারে আশ্চর্য না হয়ে পারছি না। তারা কোক, ভাং, গাঁজা, আফিম এবং এগুলো দ্বারা গঠিত দ্রব্যাদি বিভিন্ন রাজ্যে বা শহরে ব্যবহার ও এর আমদানী-রফতানীর উপর কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এর সাথে

সংশ্লিষ্ট যে কোন পদক্ষেপকে স্তব্ধ করার জন্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেও বদ্ধপরিকর। কিন্তু সব অনিষ্টের মূল মদ—যা তাদের দেশে তাদের বিবরণানুযায়ী অন্যান্য মাদক দ্রব্যের চেয়ে অনেক বেশী ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—এর ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন! এর বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ বা বিবৃতি প্রদানের ক্ষমতা তারা রাখে না, বরং এটাকে তাদের সামাজিক আচারের অঙ্গ এবং খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের মত জীবনের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় উপাদান বলে মনে করে।

ইউ. এন. ও. (জাতিসংঘ) এর মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত কমিশনের ১৯৫৮ সালের সভায় এ ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আফিম ও এ ধরনের অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায়ীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া একটি কার্যকর পদক্ষেপ। এ পর্যায়ে ঐ দেশগুলোর এ পদক্ষেপের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়, সেখানে এ সমস্ত নীতিবিরোধীদেরকে যাবজ্জীন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে। তাই তুরস্ক, ইরান এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে এ ধরনের ব্যবসায়ীদেরকে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালে এরূপ একজন ব্যবসায়ীকে দুটো ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের জন্যে ২০ বৎসর করে শাস্তি দেওয়া হয় এবং একের পর এক শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভাগের ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত মাদকদ্রব্য বন্ধকরণ সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্তে এটাও স্বীকৃত হয় যে, বর্তমান শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রে এ সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসা বন্ধ করার ব্যাপারে বিফল হয়েছে। তাই আরো কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্যে সরকারের নিকট আবেদন করা হয়। কিন্তু এ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান, যা মানবজাতির সেবার দাবি করে থাকে, মদ ও মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। যেহেতু জাতি-সংঘের লাগাম যে জাতির হাতে, তারা এ পদক্ষেপ নিতে রাযী নয় এবং তাদের প্রতিনিধিগণ সাধারণ মতামতের বিরোধিতা করার সাহস পাচ্ছে না। অথচ ঐ সমস্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের দেশে, বিশেষ করে উন্নত দেশ বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া এবং এদের প্রতিনিধিদের বক্তৃতা-বিবৃতি, তাদের রেজিস্ট্রার জেনারেল, পুলিশ, বিচার বিভাগ এবং দুর্নীতি দমন বিভাগ

শিশু-কিশোরদের সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ করে যে, যুবক-যুবতীদের মাঝে মদের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। এর ফলে এদের মধ্যে অপরাধ, অসদাচরণ, অবৈধ জন্ম, ক্ষতিকর রোগ এবং মাতাল ড্রাইভারদের হাতে অসংখ্য জীবননাশের গতি বেড়েই চলছে। এ সমস্ত বিপজ্জনক কার্যকলাপ স্তব্ধ করার জন্যে দুর্নীতি দমন বিভাগ সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়েছে।

১৯৫৮ সনের ৫ই জুলাই মস্কো থেকে এ. এফ. পি-র খবরে প্রকাশ রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ লেনিনগ্রাডে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে বলেন, "শরাব আমাদের সামাজিক জীবনে ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পারিবারিক জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে। অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করে উৎপন্ন দ্রব্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করেছে। এখন আমরা এর বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাব।"

কিন্তু ১৯৫৮ সালের ১৫ই অক্টোবর মস্কো রেডিওর খবরানুযায়ী এ বিরামহীন সংগ্রামের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ নেতৃবৃন্দের যুদ্ধের ঘোষণার মাত্র তিন মাস পরে নিজ গ্রাম লিনুফকায় বক্তৃতার সময় তাঁদের অঙ্গীকার থেকে দূরে সরে যান। তাঁরা বলেন, আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে শরাব নিষিদ্ধ করার আইন প্রয়োগ করতে চাই না। শরাব পান করা আমাদের সামাজিক আচার-আচরণের অংশ, আমাদের জনগণকে কেউ শরাব পান করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষের মান-সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নতুন আইনানুযায়ী এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শরাব পানকারী শরাবখানা হতে শুধু এক পেয়ালা পাওয়ার অধিকারী হবে। এর সাথে সাথে মিঃ ক্রুশ্চেভ এ হুঁশিয়ারীও উচ্চারণ করেছেন যে, যদি তার দ্বিতীয় পেয়ালা পান করার ইচ্ছা হয়, তা হলে সে নিশ্চয়ই অন্য শরাবখানার দিকে যাত্রা করবে। কিন্তু এক শরাবখানা হতে অন্য শরাবখানায় গমন তাকে জেলে প্রবেশ করাবে।

এ যুদ্ধ ঘোষণার এক বছর পর ১৯৫৯ সালের ১০ই জুলাই দৈনিক 'পরদাওয়া' একদল সন্তান-সন্ততিওয়ালা মহিলাদের সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদে মহিলাগণ দাবি করে বলেছে যে, শরাব পানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদেরকে পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালের চিকিৎসাধীন রাখা উচিত

এবং চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তারা আরো বর্ণনা করেছে যে, শরাবের মূল্য বৃদ্ধি, মাতলামীর করণে চালান দেওয়া ইত্যাদি সরকারী পদক্ষেপ শরাব পানকারীদের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে অপ্রতুল এবং অকৃতকার্য হয়েছে। কোন মাতা বা স্ত্রী তার ছেলে বা স্বামীকে চালান দেওয়া অথবা শহরে বন্দী করে রাখা পসন্দ করে না। ঐ মহিলাগণ আরো অভিযোগ করে যে, এরূপ শরাব পানকারীদের টাকা-পয়সা আমাদের নিকট পাঠানো উচিত। কেননা তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের সমস্ত টাকা-পয়সা, এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র বিক্রি করে হলেও শরাবের জন্যে তা ব্যয় করে থাকে।

রাশিয়ান পত্রিকা 'ইজভেস্তিয়ার' বরাত দিয়ে রয়টার ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ সনে এক খবর পরিবেশন করে। এতে বলা হয়েছে মিঃ ক্রুশ্চেভ কৃষকদের সমাবেশে এক বক্তৃতায় বলেন, "দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সবাইকে কঠোর নীতি তৈরী করতে হবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, সমস্ত জনগণকে শরাব পানকারী, অতিরিক্ত লাভকারী এবং জনগণকে শোষণকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করতে হবে।"

অন্যান্য রাষ্ট্রেও শরাবের প্রাচুর্য এবং ব্যবহারের পরিমাণ এতদূর বেড়েছে যে, ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের কোন কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রী বা কর্ণধার সমস্ত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী বিসর্জন দিয়ে স্বীয় নির্ধারিত বেতনের চেয়ে বেশী গ্রহণের চেষ্টা করত। সুতরাং রাজধানী পোল্যান্ড থেকে সংবাদ পরিবেশন সংস্থা পি. পি. এ. কর্তৃক ১৯৬১ সনের ১৫ই জুলাই খবরে প্রকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ত শরাব প্রস্তুতকারক কারখানার প্রধান রক্ষকের ঘরে সরকারের একজন পদস্থ প্রতিনিধি নিমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি পিপাসা বোধ করলে ঐ বাড়ীর রন্ধনশালায় গিয়ে পৌঁছলেন এবং পানির নল ঘুরালেন। তখন পানির পরিবর্তে শরাব নির্গত হতে লাগল। কারখানার প্রধান রক্ষক চুরি করে কারখানা থেকে তার বাংলো পর্যন্ত পাইপ দ্বারা শরাব নেওয়ার বা পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেছিল। সরকারী সম্পদের চুরির অপরাধে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

ফ্রান্সের জনগণকে শরাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখে ১৯৫৯ সনের জুলাই মাসে শরাব প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য

নেতা ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট দাবি পেশ করে যে, তিনি যেন এ নির্দেশনামা পরিত্যাগ করে এটা ঘোষণা করেন যে, শরাব আমাদের জাতীয় পানীয় দ্রব্য।

শরাব পান করে স্বাস্থ্য ধ্বংস হওয়ার হাজার হাজার ঘটনা প্রত্যেক দেশেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ঐ সমস্ত দেশ, যেগুলো শরাব পানের কেন্দ্র তাদের ধ্বংস দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

ফ্রান্সের হোটেলের যেখানে কম মূল্যে শরাব পাওয়া যায় কিন্তু সেখানে বেশী মূল্যে দিয়ে সাদা পানি বহু কষ্টের পর পাওয়া যায়। তাদের ১৯৫৬ সালের পরিসংখ্যানের রিপোর্ট, অনুযায়ী দেখা যায় যে, ঐ দেশে প্রতিবছর শরাব পানের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক ও ক্ষতিকর রোগের ফলে ১৫ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে এবং এর চেয়েও অনেক গুণ বেশী লোক এরূপ রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবন ও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে থাকে এবং প্রতি ৩৫ মিনিট পর পর একটি করে মূল্যবান জীবনের অবসান হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র শরাব নিষিদ্ধকরণ ও শরাব প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি হিজাজের বাদশাহ সউদকে তাদের দেশে শরাব ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করায় কটাক্ষ করে তারাই আবার বলেছে, ৬৮ হাজার লোক শরাব পান করে প্রতি বৎসর আমাদের দেশে মৃত্যুবরণ করে। উপরিউক্ত সংখ্যার দ্বারা দুনিয়ার শুধু একটি ক্ষতিকর নেশার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে এবং এর জনবহুল এলাকা ও অধীনস্থ রাজ্যে খৃস্টমাস ডে (বড় দিন) এবং নিউইয়ার্স ডে (নতুন দিন)-তে সাধারণ লোক ছাড়া ধর্মীয় উপদেষ্টাগণ এত অধিক পরিমাণে শরাব পান করে যে, ফলে তাদের বুদ্ধি-বিবেক লোপ পেয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্ত সীমা-লংঘন করে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সমস্ত উৎসবে যুবক-যুবতিগণ যে ধরনের কদর্য কুকর্ম এবং মারাত্মক ধরনের অপরাধ করে যা জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের সংবাদপত্রসমূহ বিরাট আকারে প্রকাশ করে।

পারিবারিক জীবনে শরাব পানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমেরিকার আরিগণ রাজ্যের 'এলকোহল এডুকেশন কমিটি' এবং শরাব পান দমন সভার ডাঃ ইওয়ার্ড এম স্কট এর গবেষণা চিন্তার বিষয়—অন্যান্য ডাক্তার তাঁর গবেষণার সাথে একমত। তিনি বলেছেন, এই রাজ্যে শরাব পানকারী পুরুষদের মধ্যে ৫৭% জন আপন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে এবং শরাব পানকারী স্ত্রীদের মধ্যে ৮০% জন আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করে পারিবারিক জীবনের অবসান ঘটিয়ে থাকে।

ভ্যাটিকান সিটি (খৃস্টধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ দল রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মীয় কেন্দ্র এবং ইউরোপের একটি শহর) থেকে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'আদজার দিটো রোমানো' ১৯৬০ সালের ২০শে নভেম্বর ককটেল (এক প্রকার শরাব, যার সাথে বিভিন্ন প্রকার শরাব ও অন্যান্য দ্রব্য মেশানো হয়)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং বলে, এটা মাঝে মাঝে পান করা যেতে পারে কিন্তু সর্বদা পান করা শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে।

এর কুফলে শরাব পানের বদঅভ্যাস, আত্মা ও মনের অবক্ষয়, দ্রুত রোগের আশংকা, মস্তিষ্কের উপর রক্তের প্রবাহ, কম্পন রোগ প্রভৃতির সাথে দুঃস্বপ্ন এবং দৈহিক ও শারীরিক ধ্বংস শুরু হয়ে থাকে।

মস্কো থেকে ১৯৫৯ সালের ১৯শে জুলাই 'তাবদো' নামক পত্রিকার খবরে প্রকাশ, এক মাতাল ড্রাইভার তিনজন স্কুলের শিশু ছাত্রকে গাড়ীর নীচে চাপা দিয়ে হত্যা করে। আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। যদি এগুলোর ক্ষতির দিক ঐ সমস্ত রাষ্ট্র বুঝতে সক্ষম হতো এবং এগুলো বন্ধ করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করত তাহলে রাষ্ট্রের জন্য তা কত মঙ্গলময় হতো!

হযরত রসুলুল্লাহ (স.) অতি গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ দিয়েছেন যে, শরাব পান করো না। কেননা এটা সমস্ত পাপ কার্যের চাবি।[১] এমনকি এরূপ পাত্র ব্যবহার করতেও তিনি নিষেধ করেছেন, যা সাধারণভাবে শরাব পানের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

---

১. আল আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী।

উপরিউল্লিখিত মাদক দ্রব্য ছাড়া আরো একটি মাদক দ্রব্য আছে, যা দুনিয়ার কেউ নেশা বলে মনে করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা নেশার পরিপূর্ণ ক্রিয়া বহন করে থাকে। এটাও হালকা ধরনের নেশা। সারা বিশ্বে এটার এত ব্যাপকভাবে প্রচলন হয়েছে যে, সাদা-কালো, লাল হলুদ প্রতিটি দেশের নরনারী, যুবক-বৃদ্ধ এর শিকার হচ্ছে। এমনকি রাষ্ট্রও এটাকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে কিন্তু নির্ভয়ে এ কথা বলা যায় যে, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর পাঁচটি বস্তুর মধ্যে সেটা অন্যতম। তা এমন বস্তু যা জীবন ধারণের জন্যে অপ্রয়োজনীয় ও অকার্যকর এবং যা বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে বেশী প্রচলিত অথচ সব ক্ষতিকর বস্তুর মধ্যে এ বস্তুটি হবে প্রথম নম্বরে।

ক্রমানুসারে ঐ বস্তুগুলো হলো তামাক (ধূমপান), চা, আইসক্রিম, শরাবের ন্যায় অন্যান্য মাদক দ্রব্য এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ঔষধ ও সরঞ্জামাদি। শরাব সম্পর্কে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে শুধু তামাক (ধূমপান) সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে, যেহেতু এটাকে আমরা অপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে প্রথম নম্বরে বর্ণনা করেছি।

সর্বপ্রথম আমেরিকার আদি বাসিন্দাগণ এটা ব্যবহার করত। তিন-চারশত বৎসর হলো আমেরিকার বাইরেও এর প্রচলন ও ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং বিশ্বে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে।

ইসলামে যদিও এ সম্পর্কে খোলাখুলি কোন বিধান নেই কিন্তু এর ক্ষতি ও অপকারিতা এবং ব্যবহার নিরর্থক হওয়াই এর অপ্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে। ইসলাম অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে বাধা প্রদান করে। তাছাড়া নেশা বা মাদকতা কম হোক বা বেশী, অথবা কোন বস্তু কম নেশা বা বেশী নেশা জাতীয় হোক না কেন, ইসলাম এটাকে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল ঘোষণা করে।

প্রায় সারা বিশ্ব ধূমপানে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং এটা এরূপ অক্ষতিকর বলে মনে করে যে, এর বিরুদ্ধে কোন প্রকার বাক্য উচ্চারণ করা বিপদ ডেকে আনারই নামান্তর। ধূমপান থেকে বিরত ব্যক্তি যখনই এর ক্ষতি ও অনিষ্টকর দিকগুলো তুলে ধরবেন তৎক্ষণাৎ এর প্রতিবাদে এই বলা হবে যে, যে এর স্বাদ গ্রহণ না করেছে সে এর

সম্পর্কে কি মন্তব্য করবে? এসব মন্তব্য তো কাঠ মোল্লাদের ফতোয়ার চেয়ে বেশী বৈশিষ্ট্য রাখে না।

কিন্তু আমার প্রতিবাদ নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। নিজের সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অপসন্দনীয় কাজ। তবুও পাঠকদের মধ্যে আমার অবস্থা অবগত হয়ে যদি কেউ ধূমপান পরিত্যাগ করে তবে এটা হবে আমার খুশীর বিষয়।

আমার পিতা ও অন্যান্য অনেক মুরুব্বী ধূমপানে অভ্যস্ত ছিলেন। আমার পিতা বন্ধু-বান্ধব ও সমপাঠীদের মধ্যে উন্নতমানের তামাক ও ধূমপানের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তৈরি করা তামাক পান না করে বরং এরূপ ব্যবহৃত হুক্কায় আরো উন্নতমানের তামাক ভর্তি করে ধূমপান করতেন। ভ্রমণে বা বাসস্থানে হুক্কা তাঁর সাথে থাকত। অবশ্য ভ্রমণে কখনো কখনো সিগারেটও পান করতেন।

যদিও হুক্কা পান করা আমার ও আমার ভাইদের জন্যে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু প্রায়ই আমি আব্বাকে হুক্কা নতুনভাবে সাজিয়ে টাটকা তামাক পান করাতাম। এভাবে হুক্কা ও তামাকের সাথে দীর্ঘদিন আমার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কলেজে চার-পাঁচ বছর কাটানোর পর আমার এটা পানে অভ্যাস হয়ে গেল এরূপ অভ্যাস হয়ে গেল, যা এক সময় সীমাতিক্রম করে গেল। বিরতিহীনভাবে একটার পর একটা সিগারেট পানকারী হয়ে গেলাম। সবচেয়ে উন্নত এবং সবচেয়ে নিম্নমানের সিগারেট আমি পান করেছি। পাইপ ভর্তি করে বিভিন্ন দেশের তামাক পান করেছি; বিড়ি পান করেছি। এমনকি শেষে হুক্কায় শুকনা পাতা এবং তৈরী করা তামাক ভর্তি করে পান করতে থাকি। সিগারেট- বিড়ি পান করে ঠোঁটে দাগ পড়ে গিয়েছিল।

এরপর কমাতে লাগলাম এবং স্বভাবের উপর জবরদস্তি করে এটা একবারে পরিত্যাগ করলাম। এরপর পঁচিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, এখন ধূমপানকারী ব্যক্তির নিশ্বাসও আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠে।

এখন ধূমপানে অভ্যস্ত বন্ধু-বান্ধব এবং প্রিয় যুবকদেরকে জিজ্ঞেস করি, আমি ধূমপান করে তা ছেড়ে দিয়েছি। আমি এখন এর কোন

স্বাদ বা মজা পাচ্ছি না। তোমাদের কি স্বাদ লাগে? এ প্রশ্নের সর্বদা একই উত্তর পাওয়া যায় যে, অভ্যাস হয়ে গেছে। বলি, আমার মত দুর্বল লোক এটা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলাম আর তোমরা যুবক হয়ে তা কেন পারবে না?

এখন প্রশ্ন হলো, এটা কি নেশা জাতীয়, না নেশা জাতীয় নয়? এটা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, না ক্ষতিকর নয়! এটা দীর্ঘ আলেচনার ব্যাপার। কিন্তু একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা দেখা যায় যে, যখন কোন অনভ্যস্ত ব্যক্তিকে প্রথমবারের মত মাদক দ্রব্য খাওয়ানো বা পান করানো হয়, যেমন আফিম, ভাঙ, শরাব ইত্যাদি, তখন ঐ নির্দিষ্ট মাদক দ্রব্যের পরিমাণ অনুযায়ী পান করা বা খাওয়ানোর ফলে ঐ ব্যক্তির মাঝে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ফলে মাথা ঘুরায়, নিদ্রা আসে, মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয়। সিগারেট বা হুক্কা পান করলে অথবা পানের সাথে তামাক খেলে কিংবা নাকে বা দাঁতে এর নস্য গ্রহণ করলে উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা ধূমপানের এ প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছি।

সর্দির কারণে নাক বন্ধ হলে কোন কোন সময় নস্য ফলদায়ক হয়ে থাকে। আমিও কয়েকবার ঔষধ হিসেবে এটা ব্যবহার করেছি। কিন্তু একবার এটা এত তেজস্ক্রিয় ছিল যে, এটা ব্যবহারের ফলে এত জোরে আমার হাঁচি উঠেছিল, যার ফলে আমার ব্রহ্মতালু ফেটে যায়। পূর্বে এ সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

এ সমস্ত বর্ণনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধূমপান নিশ্চিত-ভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যদিও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের তুলনায় এর মাদকতা কম। যেমন এর কিছু পরিমাণ নিয়মিতভাবে পান করলেও বাহ্যিকভাবে স্বাস্থ্য ও দেহে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, ধীরে ধীরে এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, যা কিছুকাল পরে এক ভয়াবহ ও মারাত্মক রূপ ধারণ করে। এভাবে এতে অভ্যস্ত ব্যক্তি এর প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে পারে না–কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি যে, এর প্রতিক্রিয়া এত বেশী নয় যা অন্যান্য মাদকদ্রব্যে বিদ্যমান। অবশ্য এর ব্যবহারের ফলে কিংবা পান

ও অন্যান্য দ্রব্যের সাথে মিলিয়ে খেলে প্রায়ই হৃৎপিন্ডের কম্পন ও অন্যান্য ভয়াবহ রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জনৈক অভিজ্ঞ ও হৃৎপিন্ড-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট আমার উপস্থিতিতে একজন যুবক হৃৎপিন্ডের রোগী এলো। তার ধূমপানের অভ্যাস ছিল। চিকিৎসক তার ধূমপান হ্রাস করার প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আমি একজন হুক্কা ও ধূমপানকারীর রমযান মাসের ইফতারের সময় অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করেছি। দু'এক ঢোক পানি দ্বারা সে ইফতার করে। এরপর সাথে সাথে পেশোয়ারী তামাক সিলিমে ভরে জোরে টানতে থাকে। হুক্কার তামাকে ঐ পরিমাণ তেজ থাকে না, যা সিগারেটে পাওয়া যায়। কেননা নিকোটিন নামক তামাকের যে বিষাক্ত অংশ, তা অধিকাংশ হুক্কার পানির সাথে মিশে থাকে। তথাপিও হুক্কায় টান দেওয়ার সাথে সাথে তার দেহ-কাঁপত এবং প্রায়ই সে বেহুঁশ হয়ে যেত। কিছুক্ষণের জন্যে অন্য কেউ তাকে ধরে রাখত এবং শরবত পান করে সে সুস্থ হয়ে উঠত। এ ঘটনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তামাক দেহে কত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে!

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এটাতেও নেশা বিদ্যমান। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, তামাক পানকারী অথবা নস্য ব্যবহারকারী সময়মত এটা না পেলে এভাবে হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং এর আকর্ষণ তাকে এভাবে অস্থির করে তোলে, যা একজন শরাব পানকারী, আফিম বা ভাঙ ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যক্তি এ মাদকদ্রব্যগুলো না পেলে হতবুদ্ধি বা অস্থির হয়ে থাকে। কঠোর ক্ষুধায় যদিও আহার না মেলে, কঠোর পিপাসার সময় পানি যদি নাও মেলে কিন্তু চাহিদার সময় তামাক না পাওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে আরো একটি চিন্তার বিষয় রয়েছে। দেহের কোন অংশ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কোন নতুন উদ্ভাবিত চাপ যদি পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কিছুদিন পর এতে ব্যথা শুরু হয়। যেমন, একটি পাথর দেহের কোন অংশে যদি বেঁধে রাখা হয় এবং ঐ অংশটি যদিও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়, তবুও কিছুদিন পর ঐ স্থানে ব্যথা

অনুভব হবে। যদি অনেক দিন এ অবস্থা বিরাজ করে তা হলে ঐ স্থান ফুলে যাবে অথবা ফোঁড়া হয়ে যাবে।

তামাক পানে সুস্থ ফুসফুস-এর উপর চাপ পড়ে থাকে এবং পান করার সময় প্রায়ই কাশি ওঠে, যা দেহের অন্য কোন অনিষ্টের ফলে হয় না, বরং তামাক পানের ফলে স্বাভাবিকভাবে এটা সৃষ্টি হয়। তামাক যত তেজস্ক্রিয় হয় ও বেশী পরিমাণ এবং ক্রমাগত পান করা হয়, এ চাপও তত বেশী বেড়ে যাবে। এর ফলে ফুসফুস দুর্বল হয়ে বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির ক্ষয়রোগ বা ক্যানসারের আশংকা বেশী থাকে।

ধূমপানের অনিষ্টকারিতা এবং জীবনযাত্রার জন্য অপ্রয়োজনীয়তা অধিকাংশ পানকারী স্বীকার করে। পৃথিবীর অধিকাংশ চিকিৎসক ও ডাক্তার এ ব্যাপারে একমত। তবুও পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এটা পানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং এর ব্যবসায়ী পৃথিবীতে পঙ্গপালের মত বিস্তার লাভ করেছে। তারা লাখ লাখ টাকা তামাক ও সিগারেটের বিজ্ঞাপনে পানির মত ব্যয় করে থাকে এবং প্রত্যেক বিজ্ঞাপনে এগুলোর এত প্রশংসা করা হয় যেন এগুলো প্রত্যেক রোগের ঔষধ বা প্রতিষেধক! তারা গ্রাহকদেরকে এমনি-ভাবে নিয়ন্ত্রণ বা পরাস্ত করে, যেমন জীবজন্তু শিকারী প্রাণীকে শিকার করে থাকে।

এ অনিষ্টকর বস্তুর বিস্তার এবং এ সম্পর্কে প্রোপাগাণ্ডার পরিমাণ শুধু আমেরিকার মত একটি দেশের বিজ্ঞাপন ও এর ব্যবহারের পরিমাণ থেকে অনুমান করা যায়। ঐ দেশে ছোট-বড় পত্রিকা, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক মিলে কয়েক লক্ষ প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে বিশটি কোম্পানীর সিগারেটের বিজ্ঞাপন ভরপুর থাকে। শুধু ১৯৫৭ সালে এ দেশে মোট চার কোটি দশ লক্ষ সিগারেট পান করা হয়েছে। এতে পাইপ দ্বারা পান করা তামাক যোগ করা হয়নি। ১৯৫৮ সনের ৩০শে ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ, কৃষি বিভাগের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৫৮ সালে আমেরিকাবাসী সাড়ে পাঁচ কোটি ডলারের সিগারেট ক্রয় করেছে। সারা বিশ্বে এমনিভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা সারা বছর ফুঁকিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়।

ছোট দেশ ইংলন্ডে সারা বছর তামাক পাতা সিগারেট ও চুরুট ইত্যাদি তৈরীর জন্যে ২৫/৩০ কোটি পাউন্ড খরচ করা হয়। কিন্তু এটা এত বেশী পরিমাণে ব্যবহার করা সত্ত্বেও বিশ্বের অভিজ্ঞ শরীয়তবিদ এবং ডাক্তারগণ বেশ দীর্ঘদিন যাবত বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন যে, এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, না ক্ষতিকর নয়। এর আধিক্য ক্যানসার ও হৃদকম্পন জাতীয় কষ্টদায়ক রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ। অথবা এ সমস্ত রোগের কারণ ধূমপান নয়; বরং অন্য কিছু। একদল এর বিপক্ষে ও অন্য দল এর পক্ষে মত পোষণ করে।

সর্বশেষে উল্লেখিত মতের চিকিৎসকগণ পৃথিবীর লাখো কোটি তামাক ব্যবসায়ীদের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়ে থাকে এবং তারা তাদের মত প্রচারের জন্যে ব্যবসার সফলতার উদ্দেশ্যে লাখো-লাখো টাকা ব্যয় করে থাকে। কিন্তু প্রথম দলের বা মতের চিকিৎসকগণ এ সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। তাদের মত শুদ্ধ হোক বা অশুদ্ধ, এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ মতের প্রতি সহানুভূতিশীল চিকিৎসকগণ নিজেদের মত, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে জনসমাজের কল্যাণার্থে পৃথিবীর বুকে প্রকাশ করে থাকে। ঐদিন বেশী দূরে নয়, যখন ধূমপানবিরোধীদের মতই জয়যুক্ত হবে এবং এটা পালন করার জন্যে পৃথিবীর মানুষ বাধ্য হবে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের লোকেরা এ অপ্রয়োজনীয় বস্তুর অনিষ্টতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

ধূমপানের অপকারিতা ও উপকারিতা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে এবং এর পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি পেশ করা হয়। কিন্তু এর ক্ষতিকর দিকটি এরূপ, যা কখনো অস্বীকার করা যায় না। মানব জাতি ভবিষ্যতে এর তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। ধূমপানের ফলে যত জান ও মালের ক্ষতি সাধিত হয়, তা অন্য কোন নেশা বা মাদক দ্রব্যে হয় না।

ধূমপানে অভ্যস্ত ব্যক্তির যখন এটা পানের তীব্র ইচ্ছা জাগরিত হয়, তখন বাধা-বিপত্তি ও কঠোর নিষেধাজ্ঞা পরিত্যাগ করে চুপে চুপে তামাকের সিলিমের আগুন জ্বালিয়ে থাকে অথবা দিয়াশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট পান করে থাকে। এ সময় অসাবধানতাবশত আগুনের জ্বলন্ত ফুলকি উড়ে অন্যস্থানে পড়তে পারে অথবা দিয়াশলাই এর জ্বলন্ত কাঠি বা সিগারেটের

শেষাংশ এদিক সেদিক নিক্ষেপ করে থাকে। এর ফলে কৃষকদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে জমাকৃত ফসলের গোলা, শিল্প-কারখানা, বন-জঙ্গল, জরুরী ও প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রের নিরাপত্তা প্রত্যেক বছর আগুনে জ্বলে যায়। এমনকি অনেক সময় এর দ্বারা অনেক জীবনও ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবীর প্রায় দেশেই এ ধরনের হাজার হাজার ঘটনা ঘটে থাকে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ অগ্নিকান্ড এই তথাকথিত ভাল অভ্যাসের ফলে ঘটে থাকে।

শুধু ইংল্যান্ডে- যেখানে অধিবাসীর সংখ্যা ৬ কোটি—ধূমপানের ফলে দশ হাজার অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। (রিডার ডাইজেস্ট—মার্চ ১৯৬১ ইং, পৃ. ৭৩)। বৃটিশ কলম্বিয়া সরকার ১৯৬১ ইং সালের ৩১ শে মে তারিখকে "ধূমপান বর্জন দিবস" ঘোষণা করে প্রচারণা চালান যে, জাতীয় সুস্বাস্থ্য এবং বন সম্পদ রক্ষার জন্য ধূমপান বর্জন অপরিহার্য। এই দিবস ভবিষ্যতের জন্যে ধূমপান ত্যাগের প্রেরণা যোগাবে।" এই ঘোষণা দৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ দেশে বন বিভাগে অগ্নিকান্ডের প্রধান কারণ সিগারেট তথা ধূমপান!

ইসলাম মানব জাতির স্বাস্থ্যরক্ষা এবং চরিত্রের উপর শরাব ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া, অনিষ্টতা ও ক্ষতির দিকটা লক্ষ্য করে এর কম বা বেশী, যে কোন পরিমাণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবিগণ স্বীয় জাতিকে ঐ সময়ই এ দৈত্যের থাবা থেকে মুক্তি দিতে পারবে, যখন তারা প্রত্যেক প্রকারের মাদকদ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানী, উৎপন্ন এবং এর ব্যবহারকে মারাত্মক অপরাধ বলে ঘোষণা করবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। শুধু আফিম এবং আফিম মিশ্রিত কোকো ইত্যাদির জন্যে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ফাঁসি দন্ডের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অনিষ্টের মূল শরাবকে এ ধরনের আইন থেকে পৃথক মনে করা অর্থহীন এবং বিফল বলে গণ্য হবে।

বৈরাগ্য ও স্বাস্থ্য

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন, এগুলো দ্বারা যদি উপযুক্ত কাজ না করানো হয়, তাহলে এগুলো অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং এগুলোর অকর্মণ্যতা দেহের অন্যান্য অংশের উপর প্রতিক্রিয়ার

সৃষ্টি করে। কোন কোন হিন্দু যোগী কিছু দিন তাদের হাত খাড়া করে রেখে তা অকর্মণ্য করে ফেলে। এ কাজ তাদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং দেহের শক্তি-সামর্থ্যও কমিয়ে দেয়। এভাবে দেহের অন্যান্য অংশ—বিশেষ করে যার সম্পর্ক বংশ বৃদ্ধি ও সন্তান উৎপাদনের সাথে জড়িত—তা দীর্ঘদিন কর্মহীনভাবে রাখা বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে যেভাবে দেহের অপ্রয়োজনীয় বস্তু বের করে দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি মানব দেহ থেকে প্রজনন পদার্থ (বীর্য) উপযুক্ত সময়ে বের করা অত্যন্ত উপকারী। অবিবাহিত পুরুষ-স্ত্রী অধিকাংশ সময়ে কিছু কিছু নির্দিষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। মেয়েদের বিলম্বে বিবাহ অধিকাংশ সময় হিস্টিরিয়া বা জরায়ু ঘটিত রোগ সৃষ্টি করে যা জিন্ন ভূতের আছর বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এ অবস্থায় চিকিৎসকগণ সর্বদা এর চিকিৎসা হিসেবে শীঘ্র বিবাহের পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং এ ব্যবস্থা ফলদায়ক হয়ে থাকে। এ ধরনের রোগের ক্রিয়া প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহে বেশী বিলম্ব করলে সাধারণত এটা স্থায়ী এবং ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

কোন কোন ধর্ম বৈরাগ্য এবং নির্জনবাসকে অত্যন্ত পুণ্য ও মুক্তির উপায় বলে মনে করে। যদি প্রত্যেক মানুষ এ পুণ্যের রাস্তা গ্রহণ করে—যেমন প্রত্যেক ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো পুণ্যের কাজ করা, তা'হলে দুই পুরুষেই মানুষের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে।

মানব জাতিকে এ অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় নবী (স.) বলেছেন, ইসলামে বৈরাগ্য নেই। বিবাহ করা আমার নীতি। যে আমার নীতি থাকে ফিরে থাকে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[১] অন্য কথায়, যে মুসলমান জেনে শুনে, বিনাকারণে সুস্থ ও সবল অবস্থায় বিবাহ করা থেকে ফিরে থাকে সে মুসলমান নয়। এরূপ লোক শুধু স্বাস্থ্যরক্ষার শত্রুই নয়, বরং স্বীয় বংশ বৃদ্ধি বন্ধ করে মানব জাতির সাথে শত্রুতা করে থাকে।

প্রত্যেক মুসলমানের নিকট ইসলামের আবেদন হচ্ছে সে যেন

১. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৬৩১।

স্বীয় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করে, যাতে জাতির জন্যে সুস্থ ও সবল বংশ বৃদ্ধির ব্যাপারে সাহায্যকারী হতে পারে।

হ্যাঁ, তবে মহানবী (স.) বলেছেন যে, সুস্থ ও সবল থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ বিবাহ থেকে কোন কারণে বঞ্চিত থাকে, তা'হলে সে যেন বেশী করে রোযা রাখে।[১] বেশী করে রোযা রাখলে যৌন শক্তি হ্রাস পায় এবং মানুষ অসদাচরণ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু হুযুর (স.) বিবাহের অসমর্থ সুস্থ ও সবল ব্যক্তিকে নিজকে খাসি হওয়ার জন্য অনুমতি দেননি।[২]

এভাবে আরো একজন খাসি হওয়ার জন্যে অনুমতি প্রার্থনাকারী যুবককে মহানবী (স.) বলেছেন, "খাসি হওয়া আমাদের নীতি নয়। আমাদের রোযা রাখাই হলো খাসি হওয়া।" তাই তিনি বৈরাগ্যের অনুমতি দেননি। তিনি বলেছেন, আমাদের বৈরাগ্য হলো মসজিদে বসে নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা।[৩]

১. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৮০।
২. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১।
৩. মিশকাত, ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৫৯।

৯

পাপাচার ও স্বাস্থ্য

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক প্রকারের সৃষ্টি, যথা জড়বস্তু, তরুলতা এবং প্রাণীকে নরনারী হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এই জোড়ার মাঝে এগুলোর অবস্থানানুযায়ী আকর্ষণের অনুভূতি ও আবেগ সৃষ্টি করেছেন। ছোট ছোট সৃষ্টির মাঝে এ আবেগ ও সম্পর্কের জন্যে কাল, ঋতু ও সময় নির্ধারিত হয় থাকে। কিন্তু সৃষ্টির সেরা মানবজাতির জন্যে আকস্মিক বিপর্যয় ছাড়া এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এ জাতির প্রতিটি শ্রেণী দ্বারা স্বীয় পরিবেশ অনুযায়ী এ উদ্দেশ্য সফলের জন্যে কিছু নিয়ম-শৃংখলা স্থির করেছে, যা নিকাহ বা বিবাহ নামে প্রচলিত আছে। এ নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গ করে, অন্য কথায় বিবাহ ছাড়া এ সম্পর্কে গড়ে তোলা সকল মানুষই অপসন্দ ও ঘৃণা করে থাকে। এ নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গ করা যিনা বা ব্যভিচার বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

প্রায় প্রত্যেক জাতির বিবাহের নিয়ম ও নীতির মধ্যে ধর্মের বিরাট প্রভাব রয়েছে। বিধর্মীদের মধ্যেও এ সম্পর্কে ধর্মীয় নীতিই কাজ করে থাকে। যদিও তারা শাব্দিক অর্থে এটা গ্রহণ করে থাকে ধর্ম এ নিয়ম-নীতির বিরোধিতা করা অপসন্দ করে এবং এ ধরনের কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, এর কারণ স্পষ্ট। ধর্মের উদ্দেশ্য হলো বিবাহের দ্বারা মানুষের আত্মিক ও দৈহিক উন্নতি লাভ। বিবাহ ব্যতীত নরনারীর সম্পর্ক আত্মিক ক্ষতি সাধন ছাড়াও স্বাস্থ্যের উপর বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করে। ধর্ম এ ধরনের সমস্ত কাজ থেকে বাধা প্রদান করে—যা পালনকারীর যে কোন প্রকার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অসদাচরণ মানব জাতির কতটুকু ক্ষতি করে এবং কোন জাতির মধ্যে এটা হয়ে সাধারণ পড়লে তা কিভাবে ঐ জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে এর প্রমাণ অতীতের সমস্ত উন্নতিশীল জাতির ইতিহাস একটু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে। পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই, যারা চরম উন্নতি লাভ করেনি এবং সর্বশেষে এদের পরাজয় ও ধ্বংসের সবচেয়ে প্রধান কারণের মধ্যে বিলাস ও আনন্দময় জীবন যাপন, অন্য কথায় যিনা, শরাব, নাচগান ইত্যাদি না রয়েছে। বাইরের শত্রুর আক্রমণ তাদের পতনের জন্যে এতটুকু দায়ী নয়, যতটুকু অসদাচরণ ইত্যাদি দায়ী।

একটি শক্তিশালী ও সুস্থ জাতি, সে যত ক্ষুদ্র হোক না কেন, এর উপর যে কোন বিরাট শক্তিশালী জাতিও বিনা কারণে আক্রমণ করার সাহস করে না। কিন্তু যখন কোন বিরাট শক্তিশালী ও উন্নতিশীল জাতি বিলাসপূর্ণ জীবন যাপনে ডুবে যায়, তখন ছোট ও ক্ষুদ্র জাতিও চারিত্রিক দিক দিয়ে তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। বস্তুত কোন জাতি প্রথম অভ্যন্তরীণ শত্রু বিলাসিতার শিকার হয়, তখন তাদের বাইরের শত্রু তাদের উপর আক্রমণ করার সাহস পেয়ে থাকে। কিন্তু যখন কোন উন্নতিশীল ও শক্তিশালী জাতি অসদাচরণ ও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে, তখন তাদের ধ্বংসের ইঙ্গিত সাধারণভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কিছুদিন পর ভবিষ্যত বংশধরদের এটা পূর্ণভাবে জ্ঞান লাভ হয় যে, তারা বাহ্যত একটি শক্তিশালী ও সতেজ বৃক্ষের ন্যায় ছিল, যার সমস্ত মূল ও শিকড় পিপীলিকা এবং জমির পোকামাকড় খেয়ে উজাড় করেছে, ফলে সাধারণ ঝড়ের একটি আঘাতে তাকে ভূপাতিত করে ফেলেছে।

এভাবে বর্তমান যুগের উন্নয়নশীল সুসভ্য জাতি এবং তাদের উন্নয়নে প্রভাবিত ও ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহ ব্যভিচার ও শরাব পান করাকে আনন্দ-উল্লাস ও সামাজিক জীবনের উপাদান এবং অক্ষতিকর বলে মনে করে। তারা এটাও বিশ্বাস—করে যে, তাদের কখনো পতন হবে না। তাদের আরও বিশ্বাস দিন দিন তারা

সামনের দিকেই এগোতে থাকবে আর তাদের এই প্রমত্ততা তাদের উন্নতির পথে অন্তরায় হচ্ছে না এবং কখনো হবে না।

নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যে শব্দের চেয়ে বেশী বিদ্যুৎ গতিতে উন্নতি করে চলছে কিন্তু এ গতির সাথে প্রত্যেক প্রকারের বিলাসিতা, ব্যভিচার প্রভৃতি তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এমনি দ্রুতগতিতে এর বিপজ্জনক ও ধ্বংসকারী পরিণাম তাদের সামনে উপস্থিত হয়। নরনারীর সংস্পর্শে গঠিত অপরিণামদর্শী রোগ—যা ব্যভিচার ও যিনার ফলে হয়ে থাকে, ঐ সমস্ত দেশে সংক্রামক ব্যাধির আকার ধারণ করে। এ বিপদের সাথে সাথে শরাব পানের আধিক্য এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, ধন-সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধির দিক দিয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানোর পরও তাদের নেতৃবৃন্দ ও সরকারকে কঠিন চিন্তার মধ্যে ফেলেছে। যেগুলোকে পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক এবং জাতীয় সংসদে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করা হয়।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবত আমরা দেখে আসছি যে, এ জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে কত উন্নতি করে চলেছে কিন্তু এর সাথে সাথে নির্লজ্জতা, উলঙ্গপনা ইত্যাদির মাঝে এতটা সীমাতিক্রম করে চলেছে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোন উদাহরণ মেলে না। মান-সম্মান, নম্রতা ও ভদ্রতার সূত্র পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঐ সমস্ত ঘটনা, যা ইশারা বা ইঙ্গিতে বলা কোন ভদ্রলোক পসন্দ করবে না, তা নিয়ে আজ প্রকাশ্যভাবে গৌরব করা হয়, পত্র-পত্রিকায় লেখা হয় এবং ফিল্মে তা প্রদর্শন করা হয়।

আমার মনে পড়ে যখন ১৯১৭ সালে আমার এক শিক্ষক ইংরেজ প্রফেসর ক্লাসে বক্তৃতাকালে বলেন, "আমার মেয়ে যদি অভিনেত্রী হয়ে যায়, তাহলে আমি গৌরববোধ করব', তখন আমার উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ যুগে আমি একটি বই পাঠ করে বিস্ময়াভিভূত হয়েছি যে, ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্প-কারখানায় শ্রমজীবী চৌদ্দ বছর বয়সের কোন অবিবাহিত মেয়েই তার সতীত্ব বজায় রাখতে পারে না।

আমি প্রায় বাইশ বছর যাবত সিনেমা দেখা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু পত্র-পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানা যায় যে, সিনেমা পর্যায়ক্রমে উলঙ্গপনা ও লজ্জাহীনতা পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছে এবং কোন ছবির মধ্যে তা যত বেশী প্রদর্শন করা হয়, ততই জনগণের মধ্যে তা বেশী গ্রহণযোগ্য হয়। এর যে প্রতিক্রিয়া চরিত্র ও স্বাস্থ্যরক্ষায়, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের উপর পড়ে, তার প্রমাণ প্রত্যেকটি সভ্য ও উন্নত দেশের বিচারালয়ে কিশোর-কিশোরীদের অপরাধের স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায়!

পোশাক-পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য (দেহের হিফাযত) ব্যাহত করে দিন দিন পোশাক ইঞ্চি ইঞ্চি করে হ্রাস পাচ্ছে। এমনকি উলঙ্গপনা একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে!

আমেরিকা ও ইউরোপে কতিপয় আইনের দৃষ্টিতে বালেগ বা প্রাপ্ত-বয়স্ক হওয়ার জন্য আঠারো থেকে একুশ বছর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রায়ই এ সমস্ত দেশে বর্তমানে বয়সের বহু পূর্বেই অর্থাৎ তের বা কোন কোন সময় দশ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীদের এক বিরাট অংশ যৌন সম্পর্কিত স্তর পার হয়ে গর্ভধারণ, গর্ভপাত বা ভ্রূণহত্যার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সৎ বা পবিত্র থাকার মত লোক সেখানে খুবই বিরল। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে যৌনরোগ এত ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করেছে যা বর্ণনাতীত।

আমার এক বন্ধু প্রথম মহাযুদ্ধের পর দীর্ঘদিন পাশ্চাত্যের কোন এক দেশে বাস করতেন। ঐ দেশের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন, ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের পকেটে যৌনরোগের ট্যাবলেট এবং পিচকারী পাওয়া যায়। যার পকেটে এটা না পাওয়া যায় তাকে 'দাকিয়ানূসী' বা প্রাচীন আমলের লোক বলে গণ্য করা হয়।

বায়রূপাল (ফ্রান্স) তার 'টুয়ার্ডস মার্ল ব্যাংকরেফটেসী' নামক গ্রন্থে (১৯২৮ সালে প্রকাশিত) বলেন যে, প্রথম যুদ্ধের পর ইউরোপ ও আমেরিকায় অন্যায়-অসদাচরণ, যিনা, কুপথে গমন, ভ্রূণ হত্যা, অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিশোরী, যাদের বয়স চৌদ্দ বা এর চেয়েও কম, তাদের হাজার হাজার কুপথে গমনের যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তা শুনলে লোম শিহরিয়ে উঠে।

জোসেফ ক্রেড পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের ব্যভিচারের কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে ১৯৩৯ সালে 'ট্রেডস্ ইন ওম্যান' (মহিলা ব্যবসায়ী) নামক একটি গ্রন্থ লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। জুলুম, অত্যাচার এবং ধ্বংসের এমন মর্মান্তিক ঘটনা বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকার কিশোরীদের সম্পর্কে এই গ্রন্থে লিখা হয়েছে, তা বর্ণনাতীত।

তিনি তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ঐ সমস্ত দেশের ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তিগণ বিলাসপ্রিয় কিশোরীদের বয়স, চাল-চলন, দেহের গঠন, দেহের সৌন্দর্য এবং জাতিগত পরিচয় খোঁজ করে ঐ সমস্ত কোম্পানীর কাছে সন্ধান দিয়ে থাকে, যাদের প্রতিনিধি প্রতিটি দেশে গোপনে কাজ করে থাকে এবং তারা স্বীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী পনের বা এর চেয়ে কম বয়সের কিশোরীদের সরবরাহ করে। এ সমস্ত কুপথে পরিচালিত কিশোরীদেরকে ঐ লোকেরা নিজেদের কাছে দু'তিন বছর রেখে ব্যভিচারের আড্ডাখানা বা পতিতালয়ের মালিকদের নিকট বিক্রয় করে। এরপর তাদের উপর নেমে আসে এক বিপর্যয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে যখন তাদের যৌবন ও স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, তখন পতিতালয়ের মালিকগণ তাদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বিতাড়িত করে দেয়। এ অবস্থায় তারা পরিবারেও ফিরে যেতে পারে না এবং কেউ তাদেরকে আশ্রয়ও দেয় না। তাই ক্লান্তি, দুরবস্থা এবং মারাত্মক যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে তারা অলিতে-গলিতে ঘুরতে থাকে এবং যৌবনকালে অসময়ে মৃত্যুবরণ করে।

হিটলার তাঁর জীবনীতে জার্মানীর কিশোর-কিশোরীদের ব্যভিচার ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট অন্যায়-অবিচার এবং যৌনরোগ সম্পর্কিত ঘটনার বর্ণনা করে লিখছেন যে, বিচারালয়ে যখন এগুলো বর্ণনা করা হয়, তখন এগুলো শুনে লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় এবং আমেরিকার অধীনস্থ বিভিন্ন জাতির মাঝে ব্যভিচার ও বিলাসিতা যে তীব্র আকার ধারণ করে এবং যে দ্রুতগতিতে ঐ সমস্ত জাতি এদিকে অগ্রসর হয়, তা কোন গোপন ব্যাপার নয়।

এ সমস্ত জাতির বিবৃতি বক্তৃতা ও লেখনীতে খোলাখুলিভাবে অবিবাহিতা বা যুবতী মা-এর বিবরণ সর্বসাধারণ্যে তুলে ধরায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, ব্যভিচার কি আকৃতি ধারণ করেছে এবং তাদের লজ্জাহীনতা কতদূর চরম সীমায় পৌঁছেছে!

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ও সাহিত্যিক অসকারওয়াল্ড লিখিত (যাঁর সম্পর্কে ইংরেজ জাতি গৌরব করে থাকে) সাম্প্রতিক মাসিক রিডার ডাইজেস্ট-এ যার লাখো লাখো কপি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়—এতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাতে তাঁর অবৈধ জন্মদান এবং স্বীয় মা-এর সাথে অবৈধ আচরণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে! ইংল্যান্ডের আইন পরিষদ বা হাউস অব কমন্সে লেবার পার্টির এক সদস্য মিঃ কেন্ট রবিনসন রাষ্ট্রীয় কমিশনে আইন হিসাবে চালু করবার জন্যে ১৯৬০ সনের ২৯শে জুন একটি প্রস্তাব পেশ করেন যে, স্বেচ্ছায় যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অবৈধ কাজ করবে তাদেরকে যেন অপরাধী হিসেবে গণ্য করা না হয়। যদিও এ প্রস্তাব নাকচ করা হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রীয় কমিশন এবং একজন প্রভাবশালী সদস্যের এরূপ আইনের প্রস্তাবের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সভ্যতার ধারক-বাহক ইউরোপের অবস্থা কোন্ দিকে ধাবমান। যখন ঐ দেশে প্রকাশ্যভাবে অবৈধ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের এর উপর অঙ্গুলি নির্দেশের কারণে কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং মহিলাদের বাজারে গমনের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এর কিছু দিন পর ১৯৬১ সালের ২১শে অক্টোবর দৈনিক পত্রিকা 'মিরর'-এ প্রকাশ করা হয় যে, লন্ডনের বাজারে গমনকারী সমস্ত মহিলা তাদের কারবারের জন্যে এরূপ গোপনীয় রাস্তা গ্রহণ করেছে যে, পুলিশও এর সন্ধান পায়নি এবং অবৈধ কাজেও কোন প্রকার হ্রাস লক্ষ্য করা যায়নি।

ইংল্যান্ডের আইন পরিষদ, হাউস অব লর্ডস-এর সভায় লর্ড কার্জনের মেয়ে (বিরন্স আইউনসডেন ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী অবৈধ কাজের আস্তানা সম্পর্কে বক্তৃতায় বলেছেন, লন্ডনের মহিলাদের বাজারে গমন বর্তমানে কুকুরের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং এ কুকুর অবৈধ কাজ ও উলঙ্গপনা প্রদর্শনীর আড্ডায় পরিণত হয়েছে। অন্য এক লর্ড বলেছেন, এ দেশে অবৈধ কাজ এত বেশী প্রচলিত হয়েছে, যা পূর্বে কখনো হয়নি।

এক্ষণে এ দেশটির উলঙ্গপনা ও অবৈধ কাজের কুফল নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১৯৫৯ সালের ১৭ ই ডিসেম্বর এ. এফ. পি.-এর খবরে প্রকাশ, লন্ডনের

কেন্টাবাড়ী কাউন্সিলের স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিকেল অফিসার ডাঃ জে. এ. স্কট বিবৃতি প্রদান করেছেন যে, লণ্ডনে ১০% অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং এ অবৈধ জন্মহার ক্রমেই বেড়ে চলছে। এর প্রধানতম কারণ, অবিবাহিত মহিলাদের প্রতি শাসকদের সাহায্য।

সরকারী রেকর্ড অনুযায়ী স্পেনের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে অবৈধ জন্মের সংখ্যা ত্রিশ হাজার—যা তারা গোপনভাবে জন্ম দিয়ে থাকে। তা ছাড়া সময়ের পূর্বে গর্ভপাতের মাধ্যমে যে সমস্ত সন্তান হত্যা করা হয়, সে সংখ্যাও এর বাইরে। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, অঙ্গুলি নির্দেশ এবং দুর্নামের সম্মুখে সাহস করে এবং যে কোন প্রকার বিপদ ও যিম্মাদারীকে উপেক্ষা করে প্রকৃতির নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে সন্তান জন্মদানকারী মা-এর সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে গণনায় স্পেনে এরূপ কিশোরীর সংখ্যা দাঁড়ায় কয়েক লক্ষ।

এভাবে ১৯৫৯ সালের ২১ শে ডিসেম্বর সর্বপ্রথম জাতিসংঘের অপরাধ দমন সংক্রান্ত এক সভা প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে একজন বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডোরিয়া রোলি তাঁর পেশকৃত রিপোর্ট-এ উল্লেখ করেন যে, প্যারিসে জন্মহারের চেয়ে গর্ভপাতের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। সভায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয় যে, সেখানে জন্মহার মাত্র ৯৫ হাজার আর সেখানে গর্ভপাতের সংখ্যা দেড় লাখ!

আমেরিকার সোশ্যাল হাইজিন এসোসিয়েশনের ১৯৫৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, আমেরিকান যুবক, বিশেষ করে যুবতীদের মাঝে যৌনরোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মিঃ ফিলিপ মাথের বোস্টন প্রকাশ করেন যে, যুবক-যুবতীদের অন্যায় ও অবৈধ কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া সমস্ত জাতির উপর ছড়িয়ে পড়েছে এবং এদের মধ্যবয়স্ক যুবকদের মাঝে যৌন রোগের প্রকোপ বেড়েই চলছে। ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকায় এ রোগে আক্রান্তদের মোট সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী ঐ সমস্ত যুবক, যাদের বয়স এগার থেকে উনিশ বছরের মধ্যে এবং বর্তমান বছরে আনুমানিক দু'লাখ যুবক যৌনরোগে আক্রান্ত হবে। এ সমস্ত রোগ বিশ বছরের কম বয়সের কিশোরী ও যুবতীদের মাঝে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়া অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ।

১৯৬১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী রয়টারের খবরে প্রকাশ, আইনসম্মত উপায়ে গর্ভপাতের পদ্ধতি সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হাউস অব কমন্সের সভায় কেন্ট রবিনসন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ইংল্যাণ্ডে প্রতি বছর এক লাখ গর্ভপাত করানো হয়। অন্য এক সদস্য মিঃ রেটন বলেন, এ আইন অকার্যকর হবে। কেননা অবৈধ গর্ভপাত এ কারণে করানো হয় না যে, গর্ভধারণকারীর স্বাস্থ্য অথবা জীবনাশংকা দেখা দিতে পারে; বরং এর প্রধান কারণ হলো, তারা সন্তান পসন্দ করে না। অন্য কথায় ইংল্যাণ্ডের আইন পরিষদের সদস্যগণের কথা অনুযায়ী এ সমস্ত যুবতী মায়েরা নিজেদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা গোপন রাখার জন্যে গর্ভপাত করে থাকে।

১৯৬১ সালের ৫ই জুন দক্ষিণ আফ্রিকার হামবুর্গ থেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ, ঐ রাষ্ট্রে দৈনিক তিনটি অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং বিশ বছরের কম বয়সের 'মা'—এদের মধ্যে ১০% জন অবিবাহিত। শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী দল চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছেন যে, কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

আমেরিকার পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের মেডিকেল ডাইরেক্টর লেডী ডাঃ মেরী কালডিরদেন ১৯৫৯ সালে, ২০শে অকটোবর আটলান্টিক সিটি নিউজারসীতে এক বিবৃতিতে বলেন, আমরিকায় অবৈধ গর্ভপাত এক বিরাট সংক্রামক ব্যাধির আকার ধারণ করেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, ২ লাখ থেকে ১২ লাখ পর্যন্ত প্রতি বছর অবৈধ গর্ভপাত করানো হয়। যার মধ্যে ৯০%. জনকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয়। তিনি আরো বলেন, আমি এ ব্যাপারটি সমাধানের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাব।

আমেরিকার মিয়ামী বিচ (ফ্লোরিডা) হতে ১৯৬০ সালের ১৭ই জুনের খবর অনুযায়ী (ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি লসএঞ্জেলস) ডাঃ জীরুম কমর আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন-এর এক সভায় বর্ণনা করেন, এ বৎসর আমেরিকায় দশ লাখেরও বেশী অবৈধ গর্ভপাত করানো হয়েছে অর্থাৎ ২০%. গর্ভপাত আমেরিকান জীবনের অংশবিশেষ বলে মনে হয়। কিন্তু আমরিকার জনসাধারণ এর বাস্তবতা গ্রহণে অস্বীকার করে।

গর্ভপাত সম্পর্কে জনসাধারণের চিন্তাধারায় মতানৈক্য দেখা যায়। ডাক্তারগণ সরকারীভাবে এর থেকে বিমুখতা ও বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করেন

কিন্তু এর যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে যে, তাঁরা এটাকে মুক্তির উপায় হিসেবেও গ্রহণ করে থাকেন।

১৯৫৯ সনের ২২শে আগস্ট ওয়াশিংটন থেকে এ. পি. এ.-এর খবরে প্রকাশ, প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে ২ লাখের বেশী অবিবাহিতা যুবতী অবৈধ-ভাবে সন্তান জন্ম দেয় এবং বিশ হাজার এরূপ অবৈধ সন্তান প্রতিটি দেড় হাজার হতে তিন হাজার ডলারে বিক্রয় হয়। অতীতকালের মত শিশু খরিদ করার জন্যে এ দেশে ব্যবসায়ী এবং গোপন বাজার বসে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দশ বছরের কিশোরীকেও গর্ভবতী পাওয়া যায়। তখন সারা দেশে ঝড় বয়ে যায় এবং নৈতিক চরিত্র অবনতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং এদের তথাকথিত সভ্যতায় প্রভাবিত এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির অন্যায়, অশালীনতা এবং বিলাসিতার খতিয়ান তাদের পত্র-পত্রিকার দ্বারা অনুমান করা যায়। বিশেষত খৃস্টমাস ডে এবং নিউইয়ার্স ডে-তে যে দৃশ্য দেখা যায়, তাতে অনুমান করা যায়। ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে জাতিসংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন দুর্নীতি দমন এবং অপরাধীদের পরিশুদ্ধি ও দমন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর ৮৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এতে যোগ দেন। যুবক-যুবতীদের অবৈধ ও অন্যায় আচরণ সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তাঁদের সামনে পেশ করা হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত অবৈধ ও অন্যায় আচরণ ও কার্যকলাপ সম্পাদনকারী যুবক দলের বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করা হয়। এতে বলা হয় যে, যারা বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করে তাদের অন্যায় কার্যকলাপের মধ্যে অবৈধ কাজ ও মদ্যপান অন্যতম।

ভারতের ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রতি বছর সম্মিলিতভাবে ইউথ ফ্যাস্টিভ্যাল পালন করা হয়। যুবক-যুবতী ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাধীনভাবে সেখানে নাচগান ও খেলাধুলা করে থাকে। এরূপ অনুষ্ঠানে ধূমপানের সাথে তারা অশালীন রংবাজিও করে। যার ফলে উপাচার্য ইউনিভার্সিটির পরবর্তী সভায় এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব উঠাতে বাধ্য হন। সুতরাং সভায় সকলে একমত হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রী এরূপ অনুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দেন। (দিল্লী, ২০শে জুলাই, ১৯৬০)

জাতিসংঘের অধীনে ১৯৬০ সালের মে মাসে জর্জ উল্‌ফ (ফেডারেল রিপাবালিক অব জার্মান) পৃথিবীর শিশুদের কুপথে গমনের প্রবৃত্তি নামক একটি রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে মাননীয় জর্জ বলেন, পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে যুবকদের অন্যায় আচরণ তীব্র-গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। সে সমস্ত অন্যায়ের জন্যে দায়ী ও দোষীদের সম্পর্কে তথ্য এতে পেশ করা হয়। এতে অবৈধ যৌন আচরণও রয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের অন্যায়ের জন্যে দায়ী করা হলো ৪৫% জন যুবককে।

ইউরোপীয় এবং তাদের সভ্যতার ধারক ও বাহকগণ মৌখিকভাবে এটা স্বীকার করে এবং এ সম্পর্কে ভীষণ প্রোপাগান্ডা করে থাকে। এমনকি কোন কোন রাষ্ট্রে আইনও প্রচলন করা হয়েছে যে, বিনা বা কোন অবিবাহিতা মহিলার গর্ভধারণ করা কোন বেআইনী বা চারিত্রিক দোষ নয় এবং কোন লজ্জা বা নিন্দার ব্যাপারও নয়। কিন্তু তাদের কার্য-কলাপে অনুমান করা যায় যে, তাদের বিবেক বা মন যতই অপবিত্র ও কুসংস্কারপূর্ণ হোক না কেন, তবুও এ বিবেক এদেরকে দংশন করে এবং এর ধ্বনি কিছুতেই দমন করা যায় না। এর প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে গভীর চিন্তা করা যেতে পারে ঃ

প্রথমত, যে সমস্ত নরনারী অবৈধ যৌন সম্পর্ক সৃষ্টি করে তারা কেন এ চেষ্টা করে যেন এর ফলে গর্ভসৃষ্টি না হয় ? যদি প্রকাশ হয়েই যায়, তখন এটা গোপন ও ধ্বংস করার জন্যে এরা কেন চেষ্টা করে ? এমনকি প্রথমে গর্ভ বিনষ্টকারী ঔষধ-পত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। যদিও সাধারণত এর দ্বারা কৃতকার্য হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, যদি এটা নিন্দনীয় কাজ না হতো, তা হলে একাজের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের ৯৯% জনের বেশী এ ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর অত্যন্ত ভীরুতার সাথে এর বিরোধিতা করে এবং এতদসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে কেন বিমুখ হবে ? অধিকন্তু এসব ভাগ্যাহত মহিলাকে একাকী, সহায়-সম্বলহীন, দুরবস্থা এবং নিন্দা ও লজ্জার মাঝে ছেড়ে দিয়ে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির প্রমাণ পেশ করে ? আর ঐ দুর্দশাগ্রস্ত মহিলা সন্তান প্রসব বা গর্ভপাত পর্যন্ত সর্বদা ঐ দুশ্চিন্তার মাঝে কাল কাটায় যে, তার এখন কি

হবে? লোকনিন্দা ও লোকদের অঙ্গুলি নির্দেশের ভয় নিয়ে রাস্তায় চলা-ফেরা করে এবং নিজ স্বাস্থ্য ধ্বংস করে। গর্ভপাতের সময় অনেক সময় জীবনাশংকা দেখা দেয় এবং সে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। তবে এ অন্যায়ের ফল শুধু মহিলাদের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাই সে দুর্দশায় পড়ে। পক্ষান্তরে পুরুষ এর থেকে নিরাপদ থাকে। এজন্যে সে এটা অস্বীকার করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

তৃতীয়ত, যারা যিনা পসন্দ করে না, তারা এরূপ মহিলাদের প্রতি কেন অঙ্গুলি সংকেত করে? তাছাড়া কোন কোন দেশ—যেমন লণ্ডনে যুবকদের জন্য আশ্রয়স্থল রয়েছে এবং গোপনভাবে প্রসূতিগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এ সমস্ত ঘটনা গোপন রাখার জন্যে এবং অবিবাহিত মহিলা-দের ক্ষীণ ধারণা অঙ্গুলি সংকেত থেকে বাঁচবার জন্যে কালব নামে চিহ্নিত করা হয়।

চতুর্থত, মায়ের স্নেহ অতুলনীয়। মার পেট থেকে জন্মগ্রহণকারী শিশুর প্রতি মাতার ভালবাসা ও আকর্ষণ পৃথিবীতে অতুলনীয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, নিন্দা ও লজ্জা, অন্যের দৃষ্টিতে অপমানিত ও তাদের অঙ্গুলি সংকেতের অনুভূতি এ ধরনের মহিলাদের উপর এরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে, ঐ স্নেহ, ভালবাসা ও আকর্ষণের কোনই বাস্তবতা নেই বলে তা উড়িয়ে দেয় এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পর্যন্ত তারা গর্ভপাত করে। সন্তান প্রসব করলেও তা কোথাও নিক্ষেপ করে নিজে পলায়ন করে। এমনকি কোন কোন সময় গলা টিপে নবজাত শিশুকে হত্যা করে এবং হত্যার দায়ে দোষী ও পাপী হয়। এটা কেন?

পঞ্চমত, এ ধরনের যুবতীদের আত্মীয়-স্বজন এ সমস্ত ঘটনা পর্দার অন্তরালে রাখার জন্যে কেন চেষ্টা করে?

ষষ্ঠত, কৃষ্টি ও সভ্যতার ধ্বজাধারী এ সমস্ত রাষ্ট্রে যখন এ অবৈধ কাজ বিস্তার লাভ করে এবং সাথে সাথে এর ফলাফল প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন কেন তারা ঘাবড়িয়ে যায় এবং এগুলো বন্ধ করার চিন্তা-ভাবনা করে?

উপরিউল্লিখিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অবৈধ কাজ মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ভীষণ ক্ষতিকর। উন্নতি-শীল রাষ্ট্রে লক্ষাধিক যুবতী প্রতি বছর অবৈধ কাজের ফলে গর্ভপাত করতে

এবং নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়। লক্ষ লক্ষ নবজাত শিশুকে গলা টিপে হত্যা করে রাস্তা, আবর্জনার স্তূপ, কূপ, নর্দমা ও নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। অথবা অন্যের করুণার উপর ছেড়ে পলায়ন করে—এ সমস্ত ঘটনা হত্যারই নামান্তর।

এছাড়া দুনিয়ায় হত্যাকাণ্ডের প্রধানতম কারণ হলো স্বামীর অবৈধ প্রেম বা মহিলাদের আত্মীয়-স্বজনদের অতিরিক্ত ক্রোধ। এ সমস্ত ঘটনার দৃষ্টিতে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা বিঘ্নিত হয়। উপরিউল্লিখিত ঘটনার দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হয় যে, এ অবৈধ কাজের ফলে নরনারীদের মধ্যে যৌনরোগ বিস্তার লাভ করে। তাই এটা জাতীয়ভাবেও ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়।

এটা ঐতিহাসিক ঘটনা, যা আমরা অস্বীকার করতে পারবো না—তা হলো এই যে, বিগত ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যের মত ইসলামী দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্রের পতনের প্রধান কারণ ইসলামী শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে যিনা ও শরাবে ডুবে থাকা। এটা তো বহু পূর্বের কথা। ইদানিং আমাদের সামনে পৃথিবীর পঞ্চম শক্তির অন্যতম ফ্রান্স দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের কেন্দ্রস্থল বলে পরিগণিত হয়েছে। এখন এই দেশটি ধ্বংসের গহ্বরে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং প্রভূত চেষ্টা ও বন্ধুদের সীমাহীন সহযোগিতা সত্ত্বেও এ দুরবস্থা থেকে বের হতে সক্ষম হচ্ছে না। এশিয়া ও আফ্রিকার কিয়দংশ তাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছেড়েছে। ইংল্যান্ডেও একই অবস্থা চলছে এবং এর পতনের প্রধানতম কারণ শরাবের আধিক্য ও যিনায় ডুবে থাকা।

এখন এটা প্রকাশ্য বাস্তব যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত ইউরোপীয় জাতি অতীত অন্যান্য জাতির মত মাত্রাতিরিক্ত ধন-সম্পদ, জাঁক-জমক, বিদ্যা-বুদ্ধির আধিক্যের কারণে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত রয়েছে। এখন তাদের সে অবস্থা থেকে বের হওয়া বা ফিরে থাকা অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার। তারা এর মূল ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের এ বাহ্যিক শক্তি এবং বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে পারদর্শী কোন জাতি যা এ সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে উত্তম, তারা এদের উপর জয়যুক্ত হতে পারবে, তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারবে অথবা তারা নিজেরা যুদ্ধ-বিগ্রহ করে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ধর্মে যিনার বিরুদ্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এর থেকে বেঁচে থাকার জন্যে উপদেশ দেওয়া হয়। কোন কোন ধর্মে এ অন্যায়ের জন্যে কঠিন শাস্তিও নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুত এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এর ক্ষতিকর দিক চিন্তা করে অন্যান্য পাপের মত এর মূল উৎপাটন করা মানব জাতির মঙ্গল ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

যদিও প্রত্যেক ধর্মে এ অন্যায় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ রয়েছে কিন্তু ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে, এ শত্রু থেকে বাঁচার জন্যে কোন বাস্তব পন্থা এবং এ কাজের কুফল সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেয়নি। ইসলাম এর বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রাচীর তৈরী করে 'নফসে আম্মারা' বা পশু প্রবৃত্তির যে কোন চারণক্ষেত্রের নিকটবর্তী হওয়া থেকেও বাধার সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক আক্রমণ ও প্ররোচনা থেকে বাধা দিয়ে এর পরিণাম দশা এবং মানুষের মাঝে এক সুদৃঢ় প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছেন।

এ কাজের উৎপত্তি ও প্ররোচনা প্রথমত শুরু হয় পরপুরুষ ও নারীর মধ্যে অবাধ মেলামেশা থেকে। মানুষ যখন এর থেকে রেহাই পায়, তখন এর পরিণাম দশা থেকে সহজেই বেঁচে যায় এবং নিজের দৃঢ়তা ও স্বাস্থ্যরক্ষা করে সুখী সুন্দর জীবন গঠন করতে পারে।

পবিত্র কুরআনে সূরা নূর-এ মুসলমানদেকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, "মুমিন স্বীয় দৃষ্টিকে নিচের দিকে রাখবে এবং অসতর্কভাবে এদিক-ওদিক দেখবে না। স্বীয় চক্ষুদ্বয়, কান, মুখ এবং লজ্জাস্থান নিরাপদ রাখবে (কুদৃষ্টি, কুকথা শোনা বা মুখ দ্বারা কুকথা বলা এবং অবৈধ কাজ থেকে)। এটা তাদের জন্যে আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক এবং শারীরিকভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন; তথা সুস্থ ও সবল থাকার উপায়। এভাবে মুমিনা স্ত্রীলোক নিকটাত্মীয় ছাড়া আপন সৌন্দর্য কোন পুরুষকে দেখাবে না, চক্ষুদ্বয় নাকের দিকে রাখবে, আপন সৌন্দর্য গোপন রাখার জন্যে পর্দা অবলম্বন করবে।"

ইসলাম পর্দার এ ব্যবস্থা এজন্য গ্রহণ করেছে, যাতে অনাত্মীয় ও অপরিচিত নরনারী একে অপরকে দেখতে না পায় এবং এরূপ অবৈধ কাজের উৎস সৃষ্টি না হয়—যা একক ও জাতীয় স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার শত্রু বলে বিবেচিত হয়। ইসলাম যখন অনাত্মীয় নরনারী পরস্পরকে দেখা

নিষিদ্ধ করেছে তখন স্বাধীনভাবে নরনারীদের মেলামেশা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এর চেয়ে বেশী অপসন্দনীয় কাজ।

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে, যিনার নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অত্যন্ত অপকর্ম ও অবৈধ পথ।[১] এর নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হলো এর সূচনা ও উস্কানি থেকে বেঁচে থাকা, যার ফলে এরূপ জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অবকাশ থাকে। এটা যে অপকর্ম ও অন্যায় পথ তা ঘটনাবলী ও পরিণামের দ্বারাই প্রতীয়মান হয়।

মহানবী (স.) বলেছেন, "যিনার মূলে উৎপাটন করে ফেলো।"[২] আমরা এ কথা বলেছি যে, এই অপকর্ম কিভাবে পৃথিবীর উন্নতিশীল জাতিকে ধ্বংস করে থাকে এবং বর্তমানে কিভাবে কোন কোন জাতির ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। এর আধিক্য ব্যক্তির উপরও একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক যৌনরোগের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

যিনা ও অপকর্মের কুফল ও প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে এ অপকর্মকে পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত গুরুতর অন্যায় বলে কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেছে। অর্থাৎ যিনাকার নর-নারীকে একশত করে বেত্রদণ্ড লাগাতে হবে।[৩] যদিও এ শাস্তি কঠিন কিন্তু অন্যায়ও অত্যন্ত কঠোর এবং মারাত্মক। যদি এটা একক বা জাতীয়ভাবে বিস্তার লাভ করে তাহলে সমগ্র জাতির জন্যে তা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় এর কুফল বর্ণনা করা হয়েছে।

অধিকন্তু এর সত্যতা প্রমাণের জন্যে পবিত্র কুরআন অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছে। কমপক্ষে চারজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী হতে হবে। এর চেয়ে কম সংখ্যক সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। যিনার ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষী প্রদানের জন্যে আশি দোর্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. সূরা বনী ইসরাঈল
২. الزنا يخرج الحياء
৩. সূরা নূর, রুকূ ১।

ইউরোপীয় এবং তাদের তথাকথিত সভ্যতার অনুসরণকারী অধিকাংশ নব্য শিক্ষিত মুসলমান এটাকে পশুসুলভ শাস্তি বলে বিবেচনা করে। বিশেষ করে যখন এটা দুইজন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে সংঘটিত হয়। কিন্তু তারা এটা ভুলে যায় যে, তাওরাতে এ অপরাধের শাস্তি পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মে মৃত্যুদণ্ড এবং বর্তমান সভ্যতার ধারক ও বাহক আমেরিকার কোন কোন রাজ্যে জবরদস্তি যিনার অপরাধ এবং এর সূচনার শাস্তি হিসাবে ফাঁসি নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা রয়টার, এ. ঐফ. পি. এবং ইউ. পি. আই-এর ১৯৫৯ সালের ৩রা জুলাই-এর খবরে প্রকাশ, বিউফোর্ট রাজ্যের দক্ষিণে কিরোলিনার এক বিচারালয় কোন এক শ্বেত চামড়াধারী কর্তৃক এক কৃষ্ণকায় মহিলাকে ধর্ষণ করায় এবং একজন কৃষ্ণকায়কে অন্য একজন সাদা চামড়াধারী মহিলাকে ধর্ষণ করার পাঁয়তারা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়।

এ. এফ. পি-এর জর্জিয়া হতে ১৯৫৯ সালের ১২ই আগস্ট-এর খবর অনুযায়ী দেখা যায় যে, তিনজন কৃষ্ণকায়কে দুইজন শ্বেতকায় মহিলাকে ধর্ষণ করার অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

মার্শাল 'ল এর সময় পাকিস্তানে মহিলাদের মান-সম্মান ও পবিত্রতার উপর আক্রমণ করা বা তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করার অপরাধে বেত্রাঘাত করা হতো।

হোম সেক্রেটারী মিঃ রিচার্ড বাটলার বার্ডন মাউথে পুলিশ অফিসারদের এক এসোসিয়েশনে ১৯৬০ সালের ২৬ শে মে তাঁর ভাষণে বলেন, শারীরিক শাস্তি—বিশেষ করে বেত্রাঘাতের শাস্তি ইংল্যান্ডে পুনরায় শুরু করা হবে এবং এতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরদের অপরাধও গণ্য হবে।

বৃটেনের নতুন অধিকারভুক্ত দেশ কেনিয়ায় ১৯২২-২৪ সালে ধর্ষণ করার শাস্তি ফাঁসি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেখানে এখনো সে ব্যবস্থা চলে আসছে।

এ সমস্ত শাস্তির তুলনায় ইসলামী শাস্তির বিধান অত্যন্ত সহজতর। যদি যিনার অপরাধে ইসলামী শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলন করা যায়, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া শুধু ব্যক্তির উপরই পড়বে না, বরং অনেক সামাজিক অপরাধের মূলও এর দরুন উৎপাটিত হবে। এ অপরাধের মাত্রা যত হ্রাস পাবে, ততই ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নতি লাভ করবে।

১০

পর্যটন, ভ্রমণ ও স্বাস্থ্য

এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, ভ্রমণ ও পর্যটন, আবহাওয়া পরিবর্তন, ভ্রমণের কষ্ট ও বিপদ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভ্রমণ করা কোন কোন রোগের জন্যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ চিকিৎসা বলে প্রমাণিত হয়। সুস্থ ব্যক্তির জন্যেও ভ্রমণ অত্যন্ত ফলদায়ক।

পবিত্র কুরআনের কয়েক স্থানে বলা হয়েছে, "তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং বিভিন্ন জাতির অবস্থা অবলোকন কর। দেখ কিভাবে তারা উন্নতি করেছে এবং কিভাবে অপকর্মের ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পরবর্তীদের জন্যে সাবধান বাণী রেখে গেছে।"[১] অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, "পৃথিবী ভ্রমণ করো এবং দেখ কিভাবে বিশ্বের সারা বস্তু সৃষ্টি হয়েছে এবং কিভাবে এর উৎপত্তি হয়েছে।"[২]

অতঃপর ভ্রমণের সময় ইবাদত ও পরস্পর লেনদেন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নীতি ও নির্দেশের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ভ্রমণ কতটুকু গুরুত্ব রাখে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যথা, ব্যবসা ও বিদ্যার্জনের জন্যে ভ্রমণ করা অতি উত্তম। মহানবী (স.) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ব্যবসার উদ্দেশ্যে অনেক ভ্রমণ করেছেন এবং এরপরও ভ্রমণ করেছেন। বিদ্যার্জনেব জন্যে ভ্রমণ করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ বলে মহানবী (স) ঘোষণা করেছেন।[৩]

---

১. সূরা আলে-ইমরান, রুকূ ১৪; সূরা নহল, রুকূ ৫।

২. সূরা নহল; সূরা আনকাবূত, রুকূ ২।

৩. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৮৯-১৯৭।

এরপর হজ্জের জন্যে ভ্রমণ ঐ মুসলমান ব্যক্তির উপর ফরয, যিনি অর্থ ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এর সামর্থ্য রাখেন। প্রত্যেক ধর্মেই স্বীয় ধর্মীয় কেন্দ্রে সমবেত হওয়ার কোন না কোন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেন তাদের অনুসরণকারী পরস্পর মিলেমিশে ও সাক্ষাতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হতে পারে কিন্তু ইসলামের কেন্দ্র বায়তুল্লায় সমাবেশ অর্থাৎ হজ্জ শুধু আধ্যাত্মিক উপকারিতার জন্যেই নয়; বরং মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

সম্পদশালী লোক সাধারণত সাদাসিধে এবং দুঃখ-কষ্টের জীবন যাপন অপসন্দ করে। কিন্তু যখন তারা হজ্জের ভ্রমণ শুরু করে তখন বেশ কিছুদিনের জন্যে তারা অনিচ্ছাকৃত হলেও অত্যন্ত সহজ-সরল; এক-দুই প্রস্থ কাপড় দ্বারা কাজ চালিয়ে নেয়। তাছাড়া হজ্জের যাবতীয় বিধি-বিধান ও ইবাদত করার উদ্দেশ্যে কয়দিন কংকরময় মাঠে অতিবাহিত করতে হয়। অনেক সময় কষ্ট স্বীকার করে ইবাদত করতে হয়। মাঠে দৌড়াতে হয়, রোযা রাখতে হয়। অনেক ভীড়ের মধ্যেও বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিক ঘুরতে হয় যাকে তাওয়াফে কা'বা বলা হয়। বস্তুত কয়েকদিনের জন্যে তাদের অত্যন্ত পরিশ্রম ও কষ্টের সাথে সৈনিক জীবন, তাও দুর্গের মাঝে অতিবাহিত করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

এ ভ্রমণ তাদের স্বাস্থ্যের জন্যে উত্তম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তাদের আপদ-বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সাহস ও শক্তি প্রদান করে।

নিদ্রা ও স্বাস্থ্য

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে নিদ্রাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সারা দিন দৌড়া-দৌড়ি, বিভিন্ন কাজে মগ্ন থেকে পরিশ্রমের ফলে মানুষ স্বাভাবিক-ভাবেই এটা চায় যে, কিছুটা বিশ্রাম করে যেন আগামী দিনের জন্যে নতুন শক্তি সঞ্চয় করে তা কাজে লাগাতে পারে। এ চাহিদা শুধু নিদ্রার দ্বারা পূর্ণ হতে পারে। এর দ্বারা সমস্ত অলসতা ও জীর্ণতা দূর হয়ে যায় এবং দেহের যাবতীয় ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি ফিরে আসে।

যদি কয়দিন নিদ্রা ত্যাগ করা হয় অথবা কাউকে জবরদস্তি নিদ্রা-থেকে বিরত রাখা হয় তাহলে সে কয়দিন পর উন্মাদ হয়ে যাবে অথবা কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হবে। কোন কোন দেশে দোষী ব্যক্তিদের সংশোধন করার জন্যে কয়েকদিন জাগ্রত-থাকার শাস্তি দেওয়া হয়।

পবিত্র কুরআনে অনেকবার নিদ্রাকে শান্তি ও আরামের উপায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে[১] এবং এটা ছেড়ে দেওয়া অথবা পরিমিত সময়ের চেয়ে হ্রাস করা ইসলামের দৃষ্টিতে পসন্দনীয় নয়। বস্তুত ইসলামের প্রথমেই, যখন মহানবী (স.) রাতের বেশীর ভাগ জাগ্রত থেকে ইবাদতে কাটাতেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা জরুরী নির্দেশ দেন, "পরিমিত সময় পর্যন্ত নিদ্রা যাও।" নিশ্চয়ই জাগ্রত থাকা আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করার উত্তম উপায়। যদি তুমি অধিক রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাক এবং পরিশ্রমের দ্বারা নিজকে দুর্বল কর তাহলে দিনের কাজ ও দুনিয়ার হিদায়তের জন্যে সেখানে অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন কিভাবে নিষ্পন্ন করবে ?"[২]

হুযুর (স.) প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে আহারের পর সামান্য আরাম করতেন। এ আরাম করাকে 'কাইলুলা' বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে যদিও এ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বা সরাসরি নির্দেশ নেই কিন্তু আনুসঙ্গিকভাবে এর বর্ণনা চলে এসেছে। সূরায়ে নূর এর আট রুকুতে যেখানে ঘরে প্রবেশ করার জন্যে খাদিম ও প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে,, সেখানে তিনটি সময় বর্ণনা করা হয়েছে : (১) ইশার নামাযের পর, (২) ফজরের নামাযের পর, এবং (৩) দ্বিপ্রহরের সময়, যখন কাপড় খুলে বিশ্রাম করা হয়।

শীতপ্রধান দেশে কাইলুলার তেমন প্রয়োজন নেই কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করা এবং গরমের শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর করার জন্যে এটা অত্যন্ত উপকারী এবং এ অভ্যাসের ফলে স্বভাবে সজীবতার সৃষ্টি হয়। এটা সর্বজনস্বীকৃত এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত যে, অত্যন্ত বেশী শ্রান্তি-ক্লান্তি এবং মানসিক পরিশ্রমের পর দিনে কয়েক মিনিট নিদ্রা অত্যন্ত ফলদায়ক।

---

১. সূরা নাবা, রুকূ ১।

২. সূরা মুজাম্মিল, রুকূ ১।

১১

গৃহে সংঘটিত দুর্ঘটনা এবং নিদ্রা সম্পর্কে কতিপয় উপকারী নির্দেশ

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, হুযূর (স.) নামাযে ইশা আদায়ের পর শীঘ্র শুয়ে পড়া এবং সকাল সকাল নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন —যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রসূ নীতি বা পদ্ধতি। এছাড়া নিদ্রা ও বিশ্রাম সম্পর্কে রহানবী (স.) এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন, যার গুরুত্ব ও উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না; বরং তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। এর মধ্যে কিছু এরূপও আছে, যা এ যুগে আবিষ্কৃত হওয়ার দাবি রাখে।

তিনি এরূপ ছাদে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন যার চতুষ্পার্শ্বে উঁচু দেয়াল না থাকে।[১] গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে মানুষ সাধারণত খোলা জায়গায় বা ছাদে শয়ন করে থাকে। যেখানে দেয়াল নেই এমন কোন ছাদে শয়ন করা বিপদমুক্ত নয়। কোন সময় হয়ত রাতের আঁধারে নিদ্রিত ব্যক্তি হঠাৎ কোন প্রয়োজনে উঠে, তখন সামান্য অসাবধানতার ফলে নীচে পতিত হতে পারে। কোন কোন লোক ঘুমের ঘোরে ঘুরাফিরা শুরু করে। এটা রোগের কারণেও হয়। অনেক সময় ঘুমের ঘোরে ভুলে যায় সে কোথায় এবং কিরূপ জায়গায় শয়ন করেছে।

আমার এক বন্ধুর ছেলে নিজেদের দোতালা দালানের ছাদে দেয়ালের অতি নিকটে চারপায়া (চৌকি) বিছিয়ে শুয়েছিল। রাতে সে অজ্ঞাতসারে

১. মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪৪৪৩।

ঘুম থেকে উঠে দেয়ালের পাশ দিয়ে নীচে নামছিল। হঠাৎ বিকট শব্দে নীচে পতিত হলে তার উভয় বাহু ভেঙ্গে যায়। মাটি শক্ত হলে এতে তার মৃত্যুও ছিল অনিবার্য।

মহানবী (স.) বলেছেন, "প্রদীপ এবং আগুন নিভিয়ে শয়ন করো।"[১] প্রথমত অন্ধকারে খুব গভীর নিদ্রা আসে। দ্বিতীয়ত দরিদ্র লোকদের খড় দিয়ে তৈরী ঝুঁপড়িতে আগুন লাগার আশংকা থাকে। আর দুনিয়াতে এ ধরনের লোকের সংখ্যাই বেশী।

বর্তমানে মাটির তৈরী তেলের প্রদীপ ও ল্যাম্প ব্যবহার করা হয়। আবদ্ধ কামরায় এর ধোঁয়া এবং গ্যাস স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

শয়নের পূর্বে আগুন নিভিয়ে ফেলার উদ্দেশ্য এটাই যে, রাতে অসাবধানতার ফলে বায়ু প্রবাহে আগুনের কোন জ্বলন্ত কণা উড়ে কোন ঝুঁপড়িতে না পড়ে। তাছাড়া শীতকালে আবদ্ধ কক্ষে লাকড়ি বা কয়লার আগুন থেকে নির্গত ধোঁয়া এবং গ্যাস কোন কোন সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, তবে বিদ্যুতের আলো এবং অতি শীতপ্রধান অঞ্চলে বিশেষ ধরনের অঙ্গারধানিকা দ্বারা সারারাত আবহাওয়ার কঠোরতা থেকে বাঁচার জন্যে উষ্ণ রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। সে সব গৃহে এ ধরনের বিপদের আশংকা খুব কমই থাকে। কিন্তু দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকা এ সহজ পদ্ধতি থেকে এখনো বঞ্চিত।

বর্তমান যুগে আরো একটি বস্তু এ ধরনের বিপদ সৃষ্টির কারণ। হুক্কা এবং সিগারেটে অভ্যস্ত ব্যক্তি রাতেও তা পান করে থাকে। ঘুমের সময় অসাবধানতা বেশী হয়ে থাকে। তাদের সামান্য অসাবধানতার ফলে বিরাট বিরাট ইমারতও জ্বলে ছারখার হয়ে যায় এবং অসংখ্য জানমাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

হুযূর (স.) আরো একটি উৎকৃষ্ট ফলদায়ক নির্দেশ দিয়েছেন, যে পাত্রে পানি বা পানাহারের দ্রব্য থাকে, তা উপর থেকে ঢেকে

১. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৯৩ ও ২১১; তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩; মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০৪১, ৪০৪৩।

দিতে হবে।[১] কেননা এতে সাধারণত ইঁদুর মুখ দিয়ে থাকে কিংবা কীট-পতঙ্গ এবং ক্ষতিকর জীবজন্তু পতিত হয়। এটা দেখা যায়, যে পাত্রে দুধ রাখা হয়, এর মুখে কিছু পতিত হলে দুধ ফেটে যায়। এ কারণেই আমাদের গ্রামে ঐ সমস্ত মটকা ও পাত্রের মুখে বিরাট বিরাট পেয়ালা বা ঢাকনা দিয়ে রাখা হয় যেন কোন বিষাক্ত বা কষ্টদায়ক জীবজন্তু এর কাছে পেঁছতে না পারে।

এ সম্পর্কে আরো একটি নির্দেশ দেওয়া যায়—বিছানায় শয়নের পূর্বে এটা ঝাড়-ফুঁক করে নিও।[২] উষ্ণ অঞ্চল এবং বিরাট বিরাট কুঠি ও বাংলোতে, যার চারিদিকে বাগান বা জঙ্গল থাকে, সেখানে এ সাবধানতা অত্যন্ত ফলদায়ক। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে যায় যে, কোন বিষাক্ত জীব বিছানায় ঢুকে থাকে এবং অসাবধানতাবশত শয়নকারীকে কেটে থাকে। কয়েকবারই এ সম্পর্কে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে।

চওড়া পালংকে অনেক সময় ইঁদুর এবং কোন কোন সময় এমনকি সাপও ঢুকে যায়। এভাবে সোফাসেটে এরূপ জীব ডিম পেড়ে বাচ্চা ফুটিয়ে নিজ বাসস্থান তৈরী করে।

কিছুদিন পূর্বে আমাদের এলাকায় এক জমিদারের বাসস্থানে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। তার একটি মেয়ে রাতে বিছানায় শুয়েছিল। সে হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠে এবং বলে আমার জামার ভিতর কিছু ঢুকেছে এবং আমাকে কেটেছে। মা দৌড়ে এসে একটানে তার জামা খুলে ফেলে কিন্তু ইত্যবসরে ঐ বিষাক্ত জীব তাকেও কাটে। দু'তিন ঘণ্টা পর মেয়েটি মারা যায়। মা পনের দিন হাসপাতালে কাটিয়ে সুস্থ হয়।

হুযূর (স.) বলেছেন, ডান কাত (পাশ) হয়ে শয়ন করবে।[৩] স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, বাম দিকে হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী। তাই এ পার্শ্বে শয়ন করলে এগুলোর উপর চাপ পড়ে। ফলে নিদ্রায় এগুলোর কার্যাবলী সঠিকভাবে চালু থাকতে পারে না।

---

১. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ২১১; তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩।
২. আলওয়াহুল হুদা, পৃ. ২৩২ (হাওলা, বুখারী ও মুসলিম)।
৩. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১১৩৭ এবং ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪৪৩৭।

তিনি আরো বলেন, মুখ উপর দিকে রেখে চিৎ হয়ে শয়ন করা ঠিক নয়।[১] এভাবে শয়ন করলে হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়ে এবং ভীতিজনক স্বপ্ন দেখা যায়। কোন কোন সময় যখন মানুষ এভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে অসাবধানতাবশত বুকের উপর হাত রাখে, তখন নিজের উপর বিরাট বোঝা পতিত হচ্ছে বলে মনে হয় এবং মারাত্মক ভীতির উদ্ভব হয়। অনুরূপ অধিক পরিমাণে আহারের ফলে দুঃস্বপ্ন দেখা যায় এবং শয়নে অস্থিরতা বিরাজ করে। তাছাড়া মুখ নীচের দিকে করে শয়ন করতেও নিষেধ করা হয়েছে।[২]

মহানবী (স.) আরো বলেছেন, রাতে যদি পানি পান করার প্রয়োজন হয়, তা হলে পানি এবং পানির পাত্র ভালভাবে দেখে নিতে হবে। আল্লাহ্ না করুক ঐ পাত্র বা পানিতে কোন বিষাক্ত জীবও থাকতে পারে।[৩]

উষ্ণ অঞ্চলে এ সাবধানতা অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা কীট-পতঙ্গ গরম থেকে বাঁচার জন্যে পানির পাত্রের নিকট একত্র হয়। পানি পান করার সময় যদি লক্ষ্য করা না হয়, তা হলে এরূপ জীব মুখে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি বিষাক্ত হলে কেটেও থাকে। এরূপ এক ঘটনা আমিও পত্রিকায় পড়েছি।

এক বালক রাতের আধারে পানি পান করার জন্যে না দেখেই গ্লাস মুখে নেয়। একটা বিচ্ছুও ঐ পানির সাথে তার গলায় ঢুকে পড়ে এবং দংশন করে। ফলে ছেলেটি মারা যায়।

হুযূর (স.) রাতে বিশ্রামের পূর্বে ওযূ করতেন[৪] এবং পাক-পবিত্র হয়ে বিছানায় শয়ন করতেন। স্বাস্থ্যরক্ষার দৃষ্টিতে এ পদ্ধতি অত্যন্ত ফলদায়ক।

---

১. মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪৪৩২।
২. মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪৪৪০।
৩. তাজরীদে বুখারী, কিতাবু বাদউল খালক।
৪. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১১৯৫।

ঘরে সংঘটিত দুর্ঘটনার প্রতিষেধকের জন্যে বর্তমানে সভ্য ও উন্নতিশীল রাষ্ট্রের সরকার ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন নির্দেশ জারি করে থাকে। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসের রিডার ডাইজেস্টের সাথে এরূপ নির্দেশাবলী সম্বলিত ২৮ পৃষ্ঠার একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এরূপ নির্দেশাবলী বাস্তবিক পক্ষে অত্যন্ত উপকারী ও কার্যকর। এগুলোর উপর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা বিপদ ক্রয় করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ নির্দেশাবলী উচ্চ পর্যায়ের জীবনযাত্রা ও নির্দিষ্ট স্থানের সাথে সম্পর্কিত। অনুন্নত ও অবহেলিত দেশ ও জাতির জন্যে এর কোন সার্থকতাই নেই। কেননা তাদের এরূপ দুর্ঘটনার সাথে খুব কমই সাক্ষাত হয়।

কিন্তু মহানবী (স.)-এর শিক্ষায় একটি বিশ্বজনীনতা রয়েছে। ঘরে সংঘটিত দুর্ঘটনার প্রতিষেধকের জন্যে মহানবী (স.) চৌদ্দশত বছর পূর্বে এরূপ সার্বজনীন নীতি ও নির্দেশ পেশ করেছেন, যা দুনিয়ার যে কোন পরিবেশে কাজে লাগাতে পারে এবং এতে প্রয়োজনানুযায়ী হ্রাস-বৃদ্ধিও করা যায়। বর্তমান যুগে ঘরে নিদ্রা ও অসতর্কতার সময় এরূপ দুর্ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলছে। ইংল্যান্ডের মত শহর, যেখানে ছয় কোটি অধিবাসীর বাস, সেখানে ১৯৫০ সালে এরূপ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ১৯৫৯ সাল থেকে ৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ দেশে প্রতি বছর সাড়ে বারো লাখ ব্যক্তিকে চিকিৎসালয়ে যেতে হয়েছে এবং আট হাজার ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। শুধু ধূমপানের ফলে দশ হাজার অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে। এর দ্বারা অন্যান্য উন্নতিশীল দেশ ও সারা পৃথিবীতে এরূপ দুর্ঘটনার একটি ধারণা পাওয়া যায়।

নাগরিক স্বাস্থ্যরক্ষা

ব্যক্তি হতে জাতির সৃষ্টি। ব্যক্তি পরিচ্ছন্নতা পসন্দ করলে সমস্ত জাতিরও পরিচ্ছন্নতা সম্ভব। এ কারণে মহানবী (স.) ব্যক্তির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী পেশ করেছেন। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গ ব্যক্তিগণ, যাঁরা হুযুরে (স.) এর নির্দেশাবলী কিতাব, হাদীস ও ফিকাহর মাঝে একত্র করেছেন এতে ব্যক্তি-জীবন থেকে এর সূচনা করেছেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রাও এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাদ পড়েনি।

বায়ু, পানি, বাড়ী ঘর, মসজিদের পবিত্রতা সম্পর্কে ইসলামী আহকাম —যেমন ইবাদতের পরিপ্রেক্ষিতে ওযুর নীতিমালা, দেহ ও পোশাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা, দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর ব্যবহারের নিষিদ্ধতা এগুলো এরূপ নির্দেশ, যা বাস্তবে গ্রাম ও শহরে স্বাস্থ্যরক্ষার নীতির সাথে সম্পর্কিত এবং শহুরে জীবনের উপর নিশ্চিতভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মসজিদ শুধু নিজ নিজ এলাকায় নয়; বরং জাতির সম্মিলন কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয় এবং এর পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে নির্দেশ বস্তুত গ্রাম ও শহরের উপর সমভাবে প্রযোজ্য।

আমরা বলেছি ছায়াযুক্ত ও ফলবান বৃক্ষ রোপণের জন্যে ইসলামে খুব উৎসাহিত করা হয়েছে। বৃক্ষ, শাক-সব্জি, ফলমূল ইত্যাদির প্রভাব শহুরে জীবনে সর্বতোভাবে পড়ে। বর্তমানে বৃক্ষ রোপণের উন্নতি বাস্তবে মহানবী (স.)-এর অবদান। অন্য কোন ধর্মে কোন পথ প্রদর্শক বা নেতাই তাঁদের অনুসারীদের এরূপ কোন নির্দেশ দেন নি। মুসলমানই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণের কাজের শুরু করে।

মহানবী (স.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর লা'নত করেন, যে ছায়াযুক্ত এরূপ বৃক্ষের নীচে পায়খানা-প্রস্রাব করে, যেখানে মানুষ বা জীবজন্তু আরাম করে অথবা পথ চলে। হুযুর (স.) খুবই সংক্ষিপ্তভাবে অত্যন্ত মূল্যবান ও কার্যকর পদ্ধতি সহকারে গ্রামীণ ও শহুরে পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা ও গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। যদি এরূপ ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ স্থানে পায়খানা-প্রস্রাব আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়, তবে সাধারণ জায়গায় ময়লা ও আবর্জনা ফেলে আশেপাশের পরিবেশকে নোংরা করে জীবাণু ও কীট-পতঙ্গ সৃষ্টির দ্বারা বিভিন্ন রোগ ছড়ানো হলে এটা আল্লাহ্ তা'আলা এবং মহানবী (স.)-এর দৃষ্টিতে কত জঘন্য পাপ ও অপরাধ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে হুযুর (স.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে। কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি যদি কোন শহরে ব্যাধি আকারে দেখা দেয়, তাহলে ঐ শহরের কোন বাসিন্দা যেন অন্য শহরে না যায়। কেননা ঐ জায়গায়ও রোগ ছাড়াবার আশংকা থাকে। এমনিভাবে

অন্য শহরের অধিবাসীকেও রোগ ছড়ানো এলাকায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে।[১] তবে এ সংক্রামক ব্যাধি হতে নিরাপদ থাকার জন্যে ঐ এলাকা থেকে বাইরে উন্মুক্ত মাঠে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করা নিষিদ্ধ নয়; বরং এটা অতি উত্তম রোগ প্রতিষেধক।

অলিগলি, রাস্তাঘাটের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা শহুরে জীবনের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পবিত্র কুরআনে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত রাস্তা সম্পর্কে কয়েক স্থানে উল্লেখ রয়েছে (সূরা আম্বিয়া, সূরা নূহ)। এক স্থানে বলা হয়েছে, "আমরা জমিতে উন্মুক্ত রাস্তা তৈরী করেছি যেন তোমরা এর উপর চলতে পারো।" অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে উন্মুক্ত ভূমি তৈরী করেছেন, যেন তোমরা এর প্রশস্ত রাস্তার উপর চলতে পারো।"

রাস্তাঘাট, অলিগলি পরিবেশ অনুযায়ী এরূপ প্রশস্ত হওয়া উচিত যাতে আসবাব-পত্র ইত্যাদি উঠানো নামানো সম্ভব হয়। হুযূর (স·)-এর যুগে লোকেরা অলিগলি সম্পর্কে কোন নির্ধারিত নিয়ম-শৃংখলা খুব কমই মেনে চলতেন। একবার হুযূর (স.)-এর নিকট গলি বা রাস্তার প্রশস্ততা নিয়ে একটি কলহ ও বিবাদ উপস্থিত হয়। এতে তিনি রাস্তা সাত হাত প্রশস্ত রাখার নির্দেশ দেন।[২] এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অলিগলির প্রশস্ততা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত পসন্দনীয় ব্যাপার।

হুযূর (স.) রাস্তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন। যদি বসার প্রয়োজন হয় তবে রাস্তার হক তথা পথচারীদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। রাস্তায় কোন বাধা-বিপত্তি না থাকা বান্ছনীয়। কোন নোংরা বস্তুও রাস্তায় রাখা অনুচিত।

হুযূর (স.) বলেছেন, "রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দাও।"[৩] এ আদেশ ব্যক্তি এবং সমষ্টিগতভাবে পালন করতে হবে। রাস্তাঘাট, অলিগলি প্রভৃতির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কষ্টদায়ক

১. তাজরীদে বুখারী, ২য় খন্ড, কিতাবু বাদ উল-খালক, হাদীস নং ২৭৪৮
২. তাজরীদ, ১ম খন্ড, হাদীস নং ৭৭৫।
৩. তাজরীদ, ১ম খন্ড, হাদীস নং ৭৭৪ এবং তিরমিযী, কিতাবুত তাহারাত।

বস্তুর মধ্যে যে কোন প্রকার অপবিত্র নোংরা বস্তু, কাঁটা, খোলা-পাথর, সীসা ইত্যাদির টুকরা অথবা অন্য যে কোন বস্তু রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

রাস্তায় কোন ডাল-পালা, কাঁটা, পাথর বা অন্য কোন নোংরা বস্তু দেখলে হুযূর (স.) নিজেই উঠিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে দিতেন এবং বলতেন, "যে ব্যক্তি রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখে, আল্লাহ্ তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন।"[১] রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, রাস্তার উপর বসা বা এর উপর কোন দ্রব্যাদি ফেলে রাখা অথবা রাস্তায় পায়খানা-প্রস্রাব করা আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ।[২]

মসজিদ, মুসাফিরখানা, নদী-নালা ইত্যাদি থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকুল উপকৃত হয় এবং আরামবোধ করে। হুযূর (স.) এরূপ সেবা-মূলক কাজের অত্যন্ত পুণ্য ও সওয়াবের কথা বলেছেন।[৩]

নামাযে কথাবার্তা বলা, নির্ধারিত নড়াচড়া ব্যতীত এদিক-সেদিক তাকানো একেবারেই নিষেধ। নামাযে পূর্ণ একাগ্রতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও এটা নির্দেশ রয়েছে যে, জামা'আতে নামায হচ্ছে—এ অবস্থায় যদি কোন বিষাক্ত প্রাণী, তথা সাপবিচ্ছু সামনে বের হয় বা দেখা যায় তাহলে এটা মেরে ফেলতে হবে যেন কাউকে ক্ষতি করতে না পারে।[৪] এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ কোন দুর্ঘটনাকে বাধা দেওয়া, যাতে অন্য মানুষের ক্ষতির আশংকা থাকে—এ অবস্থায় নামায ছেড়ে দেওয়ায় কোন ক্ষতি নেই।

মৃতদেহ ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা

আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে যদি আমরা মানুষের এ দুনিয়া থেকে শেষ প্রস্থান ও বিদায় সম্পর্কে কিছু পেশ না করি। যখন একজন লোক মৃত্যুবরণ করে তখন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্ত নীতিমালা থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এখন মৃতদেহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা,

১. মুসলিম, কিতাবুল বাররে ওয়াসসিলাহ্।
২. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩০৪ ও ৩২০।
৩. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৩১।
৪. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯২৪।

উত্তম কাপড় পরিধান করানো যায় অথবা অপবিত্র ও দুর্গন্ধযুক্ত করেও রাখা যায়। এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মৃত ব্যক্তির দেহের জন্যে যা কিছু পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করা হয় তা জীবিতদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই হয়ে থাকে।

সমস্ত ধর্মেই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে নীতি ও নির্দেশাবলী পাওয়া যায়। সমাজের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে মনে করা হয়। ইসলাম স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে যে নির্দেশাবলী পেশ করেছে তা আমরা এখানে উপস্থাপন করছি।[১]

একজন পীড়িত ব্যক্তি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে, তখন এরূপ কোন বস্তু, যা দেহের শক্তি আনয়ন করে—যেমন মধু ইত্যাদি, তার মুখে দিতে হবে। মৃত ব্যক্তির মুখ, চক্ষু বন্ধ করে ও হাত-পা সোজা করে দিতে হবে।[২] মৃত্যুর লক্ষণ শুরু হলেই দেহে কুঞ্চন বা মোচড়ানো আরম্ভ হয়। চক্ষু এবং মুখ যদি খোলা থাকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি বাঁকা হয়ে থাকে তা হলে মৃত ব্যক্তির অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করে। দর্শনকারীদের উপর এটা অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মৃতদেহ যেহেতু খুব শীঘ্র গলা বা পচা শুরু হয়, তাই ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যে, যত শীঘ্র সম্ভব মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তি—বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশে কয়েকদিন পর্যন্ত মৃতদেহ দাফন ছাড়াই পড়ে থাকে। এটা গণস্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। মৃতদেহে যতই সুগন্ধি লাগানো হোক, টীকা দেওয়া হোক বা বরফের স্তূপে রাখা হোক কিন্তু তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। যদিও এ পদ্ধতি প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মৃতদেহ পচন থেকে রক্ষা করে, তবুও এটা ধনিক শ্রেণীর লোকেই

১. মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে সমস্ত ফিকাহ ও হাদীসের কিতাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে এবং সমস্ত মুসলিম বিশ্বে এর উপর কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

২. রিয়াযুস সালিহীন, সম্পাদনায় আল্লামা নববী, প্রকাশ ১৯৩৮, মিসর, প্রথম খণ্ড, মুদ্রণ ঃ মুস্তফা আল বাবী, পৃ. ৪০৯।

করতে পারে। দুনিয়ার অধিকাংশ লোক এ ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও উত্তরাধিকারিগণ মৃতদেহ দাফন না হওয়া পর্যন্ত শোকে দুঃখে মুহ্যমান থাকে এবং পানাহার ও বিশ্রাম থেকে দূরে থাকে—যা তাদের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

তাই স্বাস্থ্যনীতি মৃতদেহ খুব শীঘ্র দাফন করার তাগিদ দিয়েছে। ইসলামী স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী মৃতদেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় ও যথা গোসল করানো হয় যেভাবে তিনি জীবিতকালে করতেন। গোসলের পানিতে কর্পূর মিশিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দেহে পানি ঢালা হয়। কর্পূর জীবাণু ও দুর্গন্ধ দূর করে। এরপর-পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড়ে জড়িয়ে[১] ক্ষমতানুযায়ী সুগন্ধি[২] লাগানো হয়। যাতে ভিতর থেকে বের হওয়া পূঁজ বা দুর্গন্ধ দূর হয় এবং শীঘ্র পচন না ধরে জীবিতদের স্বাস্থ্যের উপর এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে। মৃত ব্যক্তির গোসল-দানকারীদের জন্যে দাফন-কাফনের পর গোসল করা অত্যন্ত প্রয়োজন।[৩]

কবর এতটুকু গভীর হওয়া প্রয়োজন যে, মৃতদেহ পচনের পরেও দুর্গন্ধ যেন বাইরে বের না হয়। কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে মানুষ শোকাভিভূত হয়ে যায়। হুযুর (স.) বলেছেন, "শোকাতুর লোকদেরকে এরূপ খাদ্য খাওয়াতে হবে যাতে দেহ-মনের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শোক দূরীভূত হয়।[৪]

---

১. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৫৮০।

২. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩০৪ ও তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ-১১৮ ও ১২৭।

৩. মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৮৯।

৪. তিরমিযী আবওয়াবুল জানায়েয।

১২

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার কতিপয় বিধান

ইবাদতে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি

প্রায় সমস্ত ধর্মেই পরিত্রাণ, মুক্তি ও স্রষ্টার নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে দেহ ও আত্মার উপর কষ্ট দিয়ে বিভিন্ন প্রকার কঠোরতা, সাধনা, উপাসনা ব্রত ইত্যাদি পসন্দ করা হয়। ওগুলোর মধ্যে বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগ করাকে অতি পুণ্য মনে করা হয়। এটাও আত্মার উপর এক প্রকার কঠোরতাই।

কোন কোন লোক উপাসনার নামে দেহ ও আত্মার উপর এত কঠোরতা অবলম্বন করে থাকে যা দেখে হতভম্ব হতে হয়। গ্রীষ্মের কঠোরতায় বা কঠিন শীতের মাঝে উন্মুক্ত মাঠে বা লোহার আসনে বসে কোন কোন ব্যক্তি উপাসনা করে। আমি নিজে হিন্দু ব্রাহ্মণদেরকে আশ্চর্যজনক পূজা-পার্বন করতে দেখেছি। কেউ কেউ সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ উল্টো দিকে লটকে থাকে। আবার কেউ কেউ লেংটি বেঁধে লোহার আসনের উপর বসে শুয়ে থাকে এবং এ অবস্থায় প্রত্যেকটি কাজ সমাধা করে। সকলেরই এভাবে বছরের পর বছর চলে যায়। এমনি একজন ব্রাহ্মণ আমাদের শহরে আসে জুন মাসের মাঝামাঝি। প্রখর রৌদ্রে লেংটি পরে সে খালি জায়গায় চাটাইর উপর বসে যেত। মুখের উপর কাপড় ভিজিয়ে রাখত এবং নিজের চতুর্দিকে কয়েক মণ লাকড়িতে আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকত। এমনিভাবে আগুনের মাঝে বসে তপস্যা করত এবং ঐ সময় উঠত যখন আগুন নিভে যেত। একাধারে কয়েকদিন সে এরূপ করত।

ঐতিহাসিক গিবন তাঁর 'রোম সাম্রাজ্যের পতন' নামক গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ইসলামের পূর্বে সিরিয়ার একজন খৃস্টান যুবক খোলা মাঠে একটি বাঁশ গেড়ে এটার শীর্ষদেশে নিজকে বেঁধে নেয় এবং হাত দ্বারা বুকের উপর ক্রুশের চিহ্ন তৈরী করে অনাহারে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করে। বর্তমান যুগের খৃস্টানরা তাকে আল্লাহ্‌র মনোনীত এবং দরবেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

কিন্তু ইসলাম এরূপ 'উপাসনাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ (স.)-কে নবুয়ত প্রাপ্তির শুরুতেই সারা রাত জাগ্রত হয়ে 'ইবাদত করার জন্যে নিষেধ করা হয়েছে[১] এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রাম করার জন্যে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যখন ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (স.)-এর জন্যে এ নির্দেশ রয়েছে তখন সমস্ত মুসলমানের উপর এটা কর্তব্য যে, এরূপ কঠোর সাধনা থেকে বিরত থাকে এবং সর্বদা নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে। ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিতে এ ধরনের 'উপাসনা কখনো পসন্দনীয় নয় এবং এর পরিবর্তে কোন সওয়াবও পাওয়া যায় না।

পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, নিজেকে নিজে ধ্বংস করো না।[২]

একদা হযরত রসূল (স.) স্বীয় বিবির ঘরে একটি রশি ঝুলতে দেখে বললেন, এ রশি কিসের ? সবিনয়ে উত্তর এলো, রাতে ইবাদত করার সময় যখন নিদ্রা আসে তখন এটা মাথার চুলের সাথে বাধা হয়। যখন তন্দ্রা আসে তখন এটাতে টান লাগাতে চক্ষু খুলে যায়। হুযুর (স.) বললেন, এ ধরনের 'ইবাদত নাজায়েয। আমল এতটুকু হওয়া চাই যা সহ্য করা যায় এবং সহজে পালন করা যায়।[৩]

পবিত্র কুরআন মাতাল বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া থেকে নিষেধ করেছে।[৪] সমস্ত তাফসীর বিশারদ এবং বুযুর্গান-ই-ইসলাম এ বিষয়ে

১. সূরা মুজাম্মিল, রুকূ ১।
২. সূরা বাকারা, রুকূ ২৪।
৩. রিয়াযুস সালিহীন, পৃ. ৮৬০।
৪. সূরা নিসা, রুকূ ৭।

একমত যে, নিদ্রাও এক প্রকার নেশা। যখন এর মাত্রা বেড়ে যায় তখন নামায না পড়াই শ্রেয়।

ইসলামের প্রথম দিকে মসজিদে নববীর মেঝে কাঁচা ছিল। তখন গরমের তীব্রতায় লোকেরা নিজ নিজ পাগড়ী বা টুপীর উপর সিজদা করত এবং জামার আস্তিন বা হাতা আগে বাড়িয়ে এর উপর হাত রাখত।[১]

ইসলামে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব এবং এর প্রতি দৃষ্টি রাখার পরিমাপ বা মূল্যায়ন এই নির্দেশের দ্বারাই বোঝা যায় যে, যখন নামায শুরু হবে এমনি সময় যদি কোন মুসল্লীর পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ হয় তখন নামায ছেড়ে তাকে ঐ কাজ থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। নতুবা তার নামাযই হবে না।[২] কেননা পায়খানা-প্রস্রাব বাধা দিয়ে রাখা হলে ইবাদতে একাগ্রতা ও মনোযোগ আসে না। দ্বিতীয়ত এতে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া এবং অন্য কোন রোগ সৃষ্টিরও আশংকা থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী বিরক্তিকর নামায পড়া থেকেও শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে। ইমামের জন্যে দীর্ঘস্থায়ী নামায পড়ানো থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[৩]

এছাড়া 'ইবাদতে যুক্তিসম্মত ওজর বা কারণ থাকলে যেমন অসুস্থতা, ক্লান্ত হওয়া, ভ্রমণ ইত্যাদির সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ইসলাম দিয়ে থাকে। অসুস্থতা বা ক্লান্তির কারণে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম হলে বসে, শুয়ে বা ইশারায়ও নামায আদায় করা যায়। ভ্রমণ ও অসুস্থতায় রোযা স্থগিত রাখা যায়। নারীদের প্রকৃতিগত বিপত্তির কারণে যখন তারা ওযু বা পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম, তখন তাদের জন্য অনেক 'ইবাদত মাফ করা হয়। এরূপ অবস্থায় 'ইবাদতে নির্ধারিত পদ্ধতির উপর একাগ্রতা মানুষের স্বাস্থ্য ধ্বংস করারই নামান্তর।

---

১. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৩১।

২. তিরমিযী, ১ম খণ্ড, আবওয়াবুত তাহারাত, পৃ. ২০।

৩. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৮৫ ও ৩৮৬।

হুযূর (স.) স্বাস্থ্যরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সাধারণ নীতি স্থির করে বলেছেন, 'আমল ও 'ইবাদতে মধ্যপন্থা গ্রহণ কর।[১] তিনি আরো বলেছেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঐ 'আমল অতি পসন্দনীয়, যার উপর মানুষ সর্বদা 'আমল করতে সক্ষম হয়।[২] অর্থাৎ যা স্বাস্থ্যরক্ষা করে পালন করা সম্ভব। 'ইবাদতের জন্যে তিনি রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকা এবং চুপ থাকা হতে নিষেধ করেছেন (রিয়াযুস সালিহীন)।

আত্মহত্যা

যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, সে চূড়ান্ত পর্যায়ের নিরাশ হয়েই এ কাজ করে থাকে। না সে নিজের উপর, না অন্যের উপর—এমনকি আল্লাহ্র উপরও তার ভরসা থাকে না। স্বীয় জীবনের পরিসমাপ্তিতেই সে মুক্তি খুঁজে পায়। পৌরুষ ও বীরত্বের সাথে বিপদের মুকাবিলার পরিবর্তে অত্যন্ত ভীরুতার সাথে তা থেকে পলায়ন করে। ইসলাম এটাই চায় যে, প্রতিটি মানুষ জীবনের প্রতিটি বিপদাপদের সাথে পৌরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক এবং আঁকড়িয়ে থাকুক। তাহলে নিশ্চয়ই যে কোন মুক্তির উপায় বের হয়ে আসবে। তাই পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিও না।[৩]

প্রায় হাদীসের প্রতিটি কিতাবেই আত্মহত্যাকারীদের তিরস্কার করা হয়েছে। হাদীসে বুখারীতে বলা হয়েছে, এরূপ ব্যক্তির উপর বেহেশ্ত হারাম।[৪] এমনকি অধিক বয়স, অসুস্থতা বা কোন মুসীবতের সময় মৃত্যু কামনা করা থেকেও কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

উন্মুক্ত অস্ত্র নিয়ে চলা বা
এগুলো দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা

হুযূর (স.) উন্মুক্ত তীর নিয়ে বাজারে বা মসজিদে চলাফেরা করতে

১. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮৮৩।
২. ঐ, হাদীস নং ৮৮৪।
৩. সূরা বাকারা, রুকূ ২৪।
৪. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ২৭০।

নিষেধ করেছেন।১ কেননা এর ফলে কারো আহত হবার আশংকা থাকে। বাজার এবং মসজিদ সর্বসাধারণের মিলন কেন্দ্র। এ নির্দেশের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ জায়গায়, যেখানে লোকজন একত্র হয়, ঘোরাফেরা করে—কোন উন্মুক্ত অস্ত্র নিয়ে যেমন—তীর, বর্শা তলোয়ার ইত্যাদি নিয়ে ঘোরা বিপদ থেকে মুক্ত নয়। তাই বর্তমান যুগেও গুলীভর্তি বন্দুক বা পিস্তল নিয়ে এরূপ জায়গায় যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়। আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই এরূপ আইন-কানুন রয়েছে যার দৃষ্টিকোণ থেকে অস্ত্র নিয়ে এরূপ স্থানে চলাফেরা করা নিষিদ্ধ।

অন্য এক জায়গায় হুযুর (স.) বলেছেন, কোন অস্ত্র যেমন—তীর তলোয়ার, বর্শা ইত্যাদি দিয়ে কারো দিকে ইঙ্গিত করা উচিত নয়। হয়ত শয়তান তার হাত থেকে ঐ অস্ত্র ছেড়ে দেবে। ফলে অন্য কোন ব্যক্তি আহত হবে।২ কোন কোন সময় মানুষ ঠাট্টা করে অন্যের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করে; যেন তাকে ভয় দেখায় যে, তাকে হাতিয়ারে দাবিয়ে দেওয়া হবে। হাতে যখন কোন অস্ত্র থাকে, তখন কোন কোন সময় মাথায় এমনি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যে, মানুষ এটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও চালিয়ে দেয় এবং এর ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়।

বন্দুক, পিস্তল, রাইফেল ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে। শিকার সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ লিখেছেন, তাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কখনো কোন আগ্নেয়াস্ত্র খালি হলেও কারো দিকে উঠানো উচিত নয়। কোন কোন সময় অসাবধানতাবশত বন্দুক খালি মনে করা অথচ তা ভর্তি থাকে; ফলে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। অভিজ্ঞ শিকারী সর্বদা বন্দুক বা রাইফেল ভর্তি হোক বা শূন্য এরূপভাবে রাখে—যাতে ঘটনাক্রমে ছুটে গেলে জমিতে বা আকাশের দিকে যাবে; কাউকে আঘাত করবে না। বর্তমান সভ্য দেশগুলোতেও অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা নিষিদ্ধ।

---

১. তাজরীদ, ২য় খন্ড, হাদীস নং ৭৭০-৭৭১-১০২৪ ও ১০২৫।

২. তাজরীদ, ১ম খন্ড, হাদীস নং ২৬১।

হাই তোলা, হাঁচি দেওয়া ও অট্টহাসি

হাই তোলার সময় শীঘ্র মুখে হাত রাখা উচিত।[১] কোন কোন সময় হাই তোলার কারণে চোয়াল দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খোলা থাকে এবং মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। মুখের উপর হাত রাখলে এ ভীতি হ্রাস পায় এবং ক্ষতির আশংকা কম থাকে। এজন্যে জোরে হাই তোলা থেকে হুযূর (স.) নিষেধ করেছেন।

কোন কোন সময় যখন এরূপ হাঁচি আসে তখন জোরে ভয়ানক এক আওয়াজ বের হয়। হুযূর (স.) এও নিষেধ করেছেন। এরূপ অবস্থায় হুযূর (স.) কাপড় বা হাত মুখের উপর রাখতেন,[২] কেননা এর দ্বারা রক্তবাহী শিরায় চাপ পড়ে এবং এটা ফেটে যাওয়ার আশংকা থাকে। ফলে নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে পারে।

অধিক হাসতে হুযূর (স.) নিষেধ করেছেন। হুযূর (স.) নিজেও হাসতেন। কিন্তু হাসার সময় মুখে হাত রাখতেন।[৩] এর ফলে মুখ বেশী খোলে না। কোন কোন সময় হাসতে হাসতে চোয়াল বেশী খুলে যায়। এটা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। যেরূপ হাই তুললে হয়ে থাকে।

ইদানিং পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নিজ গৃহে কোন কথায় উচ্চৈস্বরে হেসে দেয় এবং বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত এ হাসি চলতে থাকে। এরপর এরূপ অবস্থা হলো যে, তার হাসি আর থামাতে পারল না; বরং কয়েকদিন এভাবে হাসতে থাকল। অনেক চিকিৎসা করা হলো। কিন্তু কোন ফল হল না। অবশেষে হাসতে হাসতে সে মৃত্যুবরণ করল।

একবার হুযূর (স.) বলেন, বেশী হাসলে অন্তর মরে যায়। এবং দারিদ্র্যের সৃষ্টি করে।[৪] অধিক ঠাট্টা তামাসা এবং উচ্চৈস্বরে হাসি চিন্তা

---

১. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮৬৮, মিশকাত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪৪৫৯।

২. ঐ।

৩. শামায়েলে তিরমিযী, পৃ. ৯৬।

৪. كثرة الضحك يميت القلب ويورث الفقر

ও বিষণ্ণতা আনয়ন করে। এতে সময় অপচয়ের কারণে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়।

জ্বর

হুযুর (স.) বলেছেন, কারো কঠিন জ্বর হলে তার মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালতে হয়।[১] যখন কারো এরূপ অবস্থা হতো তখন তিনি মশকের মুখ দ্বারা তার মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করতেন। আজকাল এ অবস্থায় মাথায় বরফ দেওয়া হয় এবং এটা সর্বপ্রকার জ্বরে অত্যন্ত সহজ ও কার্যকর চিকিৎসা হিসেবে গণ্য হয়। এতে রোগীর মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়ে তার অত্যন্ত শান্তি বা সুস্থতা অনুভূত হয় এবং জ্বরের প্রকোপ কমে যায়।

রোগীর প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতি

প্রত্যেক রোগী সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। কেননা এ সহানুভূতি শীঘ্র রোগ থেকে মুক্তিলাভের কারণ হয়ে থাকে। মহানবী (স.) রোগীর সেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বয়ং রোগীদের নিকট যেতেন এবং তাদের মাথায় পবিত্র হাত রেখে সান্ত্বনা দিতেন ও দোয়া করতেন। রোগীদের অন্তরে-এর গভীর প্রতিক্রিয়া পড়ত।

হুযুর (স.)-এর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, এর ফলে যে কোন রোগীর সাহস ও উৎসাহ বেড়ে যায় এবং প্রত্যেক ডাক্তার, কবিরাজ ও চিকিৎসকের পক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়। তা ছাড়া শিক্ষার উন্নতির জন্যে একটি প্রশস্ত এবং সীমাহীন ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়।

মহানবী (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রয়েছে। দুনিয়াতে এমন কোন রোগ নেই যার ঔষধ বা রোগমুক্তি নেই।"[২] যে রোগীকে এটা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, তার রোগ চিকিৎসার বাইরে নয়,

---

১. তাজরীদে বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস নং ৭৮৪; মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৪৭৪।

২. তাজরীদ, ২য় খণ্ড; হাদীস নং ৭৭৪।

তখন নিরাশ অন্তর এবং রোগাক্রান্ত স্বাস্থ্যের উপর এর উত্তম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং রোগী কখনো নিরাশায় পতিত হয় না।

কুষ্ঠরোগ

হুযূর (স.) বলেছেন, কুষ্ঠরোগকে এভাবে ভয় কর যেমন বাঘকে ভয় কর।[১] কুষ্ঠ একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। যে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, তার কান, নাক এবং হাত-পা-র অঙ্গুলি খসে পড়ে। সে কোন কাজের উপযুক্ত থাকে না। তার দেহে এক প্রকার দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এরূপ রোগীর সাথে মানবিক সহানুভূতি প্রদর্শনে নিষেধ করা হয়নি। নিজের নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তার সাথে সহানুভূতিশীল ব্যবহার করা উচিত।

ক্রোধ

এমন কোন লোক নেই, যার ভিতর সামান্যতম ক্রোধ নেই। এটা এমন একটি মানবীয় দোষ, যার ফলে ভয়ানক বিবাদ এবং ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রতিক্রিয়া মানুষের স্বাস্থ্যের উপর পড়ে। আবেগের তীব্রতার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং রক্ত চলাচলের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

হুযূর (স.) বলেন, যখন ক্রোধ আসে তখন আ'উযু পড়া বা পানি পান করা উচিত এবং দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে বসে যাওয়া বা চুপ হয়ে যাওয়া উচিত।[২] এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, মানুষের ক্রোধের সময় যদি তার দৃষ্টি অন্যদিক সরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে ক্রোধের প্রচণ্ডতা হ্রাস পায় এবং ক্রোধ দূর হয়ে যায়।

হুযূর (স.) আরো বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে কুস্তি লড়াইয়ে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে, বরং শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।"[৩]

---

১. তাজরীদে বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস নং ৭১১।

২. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ২১২।

৩. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮৫৩।

দ্রুত চলা

হুযুর (স.) বলেছেন, "দ্রুত চলা চেহারার উজ্জ্বলতাকে বিনষ্ট করে। কোন কোন লোক অভ্যাসগতভাবে দ্রুত চলে, আবার কেউ ধীরে ধীরে চলে। এ নির্দেশ প্রত্যেক মানুষের অভ্যাস সম্পর্কে। স্বীয় অভ্যাসের বিরুদ্ধে যদি কেউ দ্রুত চলে তাহলে তার মুখমণ্ডল থেকে সজীবতা ও উজ্জ্বলতা দূরীভূত হয় এবং ভয়ভীতি ও চিন্তা শুরু হয়, যার ফলে স্বাস্থ্যের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

দাঁত দ্বারা কাটা

হুযুর (স.) বলেছেন, তোমরা পরস্পরকে মুখ দ্বারা কেটো না অর্থাৎ কামড়ে দিও না। এ নির্দেশের কারণ খুবই স্পষ্ট। একজন মানুষ অন্যজনকে মুখ অর্থাৎ দাঁত দ্বারা কাটা পশুত্ব এবং হিংস্রতা ছাড়াও স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। দাঁতের বিষ প্রায়ই স্বাস্থ্যের পক্ষে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। সাধারণত শিশুদের এ অভ্যাস হয়ে থাকে। তাই তাদের এটা থেকে বিরত রাখতে হবে।

১৩

জীব-জন্তুর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা

আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বর হযরত রসূলে আরাবী (স.) শুধু মানব জাতির স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কেই নযীরবিহীন নির্দেশ দেন নি বরং বাকহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের সম্পর্কেও হুযূর (স.)-এর স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আমরা এখানে বর্ণনা করছি ঃ

১. হুযূর (স.) বলেছেন, কোন প্রাণীকে আগুন দিয়ে পোড়ানো উচিত নয়।[১] যেখানে ক্ষুদ্র প্রাণী সম্পর্কে এ নির্দেশ রয়েছে, সেখানে কোন জীবন্ত মানুষকে আগুনে নিক্ষেপ করা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কত বড় অন্যায় তা সহজেই বিবেচ্য।

২. তিনি আরো বলেছেন, মুরগী বা অন্য কোন জন্তু বেঁধে এটার উপর নিশানা বা চিহ্নকারীর উপর আল্লাহ্র লানত বা গযব নিপতিত হবে।[২]

৩. কোন প্রাণীকে মুসলা অর্থাৎ এগুলোর নাক, কান, লেজ, গোড়ালচী ইত্যাদি কাটা কিংবা এর চক্ষু উপড়িয়ে ফেলা অনুচিত।[৩] প্রকৃতি জীব-জন্তুকে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছে এর মধ্যে কোনটাই অপ্রয়োজনীয় সৃষ্টি করেনি। এগুলো কাটা হলে জীব-জন্তুকে এ সমস্তের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে।

আজকাল কুকুরের কান-লেজ এবং ঘোড়ার লেজ কাটার সাধারণ নিয়ম প্রচলিত হয়েছে। মশামাছি দ্বারা এসব জীবজন্তু অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে

১. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১২০।
২. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৩৪।
৩. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৩৫।

থাকে। ওরা লেজ দ্বারা এগুলো তাড়াতে পারে। মানুষ তার নাকে একটি মশা বা মাছি বসতে দেয় না। কিন্তু নিজেদের সামান্য আরাম বা আনন্দের জন্যে বাকহীন জীব-জন্তুকে এ অসহনীয় বিপদ থেকে বেঁচে থাকার একটি উপায় থেকে বঞ্চিত করে রাখে।

হুযুর (স.) বলেছেন, কোন জীব-জন্তুর লেজ বা কেশর কাটা উচিত নয়। কেননা লেজ তার কাজে লাগে এবং কেশর বিছানার কাজে লাগে।

৪. কোন জীব-জন্তুকে পিপাসার্ত রাখা উচিত নয়।[১]

হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে পিপাসার কারণে কাদা মাটি খেতে দেখে তিনি তার মোজা দ্বারা কূপ থেকে পানি এনে কুকুরটিকে পান করান। ফলে তাঁকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হয়।

৫. কোন জীব-জন্তু দ্বারা অধিক কাজ করানো উচিত নয় এবং এদের উপর ক্ষমতার বেশী বোঝা চাপানো উচিত নয়।

৬. অসুস্থ উট সুস্থ উটের নিকটে রাখা উচিত নয়।[২] এ নির্দেশের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য অসুস্থ জীব-জন্তুর ব্যাপারে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. হুযুর (স.)-এর একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে। কোন জীব-জন্তুকে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। বরং কোন বিপদগ্রস্ত বা অসুস্থ জীব-জন্তুর সেবা করা সওয়াবের কাজ।[৩]

৮. পবিত্র কুরআনে আছে, "সৎলোকের উপার্জনে বা ধন সম্পদে সায়েল ও মাহরুম অর্থাৎ ভিক্ষুক ও দরিদ্রের অংশ রয়েছে।"[৪] এখানে সায়েলের অর্থ হলো, যে কথা বলতে পারে এবং অন্যের কাছে চাইতে পারে এবং মাহরুম-এর অর্থ হলো ঐ জীব-জন্তু যে এ শক্তি রাখে না অর্থাৎ বাকহীন। ক্ষিধে বা পিপাসার সময় মানুষের কাছে কিছু চাইতে

১. আবু দাউদ ও সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ১৭৩।
২. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৯৩।
৩. তাজরীদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৪৩।
৪. সূরা আযযারিয়াত, রুকূ ১।

পারে না সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে বাকহীন জীব-জন্তু–কুকুর, বিড়াল, কাক, চিল, চড়াই প্রভৃতিকে পানি ও খাদ্য প্রদান করা অত্যন্ত নেকীর কাজ।

৯. হুযুর (স.) বলেছেন, কোন জীব-জন্তুর মুখমণ্ডলে আঘাত করা উচিত নয়। এর ফলে ব্যথা খুব বেশী অনুভূত হয় এবং ঐ জন্তু অকর্মণ্য হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

১০. পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযুর (স.) বলেছেন, এরূপ ফল ও ছায়াদানকারী বৃক্ষ রোপণ কর, যার ছায়ার নিচে মানুষ ও জীব-জন্তু বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং এর ফল খায়। এটা অত্যন্ত নেকীর কাজ।[১] তিনি আরো বলেছেন, এরূপ ছায়াদানকারী বৃক্ষের নীচে পায়খানা-প্রস্রাব করা, যার নীচে মানুষ ও জীব-জন্তু বিশ্রাম করে, আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া আর কিছুই নয়।

১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এক সফরে আমরা কপোত পাখির দুটি ছোট বাচ্চা ধরে ফেলি। ফলে এদের মা ভয়ে আমাদের চারদিকে উড়তে থাকে। তা দেখে হুযুর (স.) বললেন, বাচ্চাগুলো ছেড়ে দাও।[২]

১২. হুযুর (স.) জীব-জন্তুর মুখে দাগ লাগানো থেকে নিষেধ করেছেন। যদি প্রয়োজন হয় তবে পিঠের উপর লাগানো যায়।[৩]

মুসলমান জাতি সম্প্রতি এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এদের দেখে ইউরোপের বাসিন্দাগণও জীব-জন্তুর পিঠে দাগ লাগানো শুরু করেছে। এমনি আরো বহু হাদীস রয়েছে, যেখানে কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য বাকহীন জীবজন্তু–বিশেষত নিজেদের বোঝা বহনকারী জীবজন্তুকে কষ্ট দেওয়া, এদের ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা অথবা এদের ক্ষমতার বেশী কাজ করানো সম্পর্কে কঠোর নিষেধ করা হয়েছে এবং এদের আরাম দেওয়া সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

---

১. তাজরীদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৩৯।
২. রিয়াযুস সালিহীন, পৃ. ৬১৩।
৩. ঐ, পৃ. ৬১২।

এ সমস্ত উপদেশের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যে সমস্ত লোক ক্ষুদ্র জীব-জন্তুর স্বাস্থ্য ও আরামের জন্যে এতটুকু খেয়াল রাখে এবং এগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তাদের অন্তরে স্বীয় জাতির মঙ্গল, উন্নতি এবং স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যের স্থায়িত্বের জন্য কতটুকু দৃষ্টি ও চিন্তা থাকবে! আর সহানুভূতির তীব্রতাই বা কতটুকু বৃদ্ধি পাবে?

এ চিন্তাধারা আমরা অন্য কোন ধর্মীয় নেতার মধ্যে দেখতে পাই না। এটা মহানবী (স.) এবং তাঁর প্রচারিত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হওয়ার একমাত্র ও বিশিষ্ট প্রমাণ।

বর্তমানে পাশ্চাত্যের সরকারদের একটি প্রতিষ্ঠান জীব-জন্তুর উপর হৃদয়হীনতা দমনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাকে ইংরেজীতে S.P.C.A — 'সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু এনিমেলস' বলা হয়। এটা প্রতিষ্ঠা করাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, একাজ অত্যন্ত ভাল ও উত্তম। সেদিকে মহানবী (স.) তাঁর অনুসারীদেরকে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইঙ্গিত দিয়েছেন, যখন অন্যান্য জাতি এ চিন্তা থেকে একেবারে অমনোযোগী ছিল।

১৪

শেষ কথা

উপরে বর্ণিত আবেদন-নিবেদনগুলো স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা উপমাহীন এবং অত্যন্ত উত্তম বলে আমরা দাবি করছি। দার্শনিক, শরীর বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসাবিদগণ কোন বিষয়ে সঠিক ফলাফলে পৌঁছাবার জন্যে দু'চার-পাঁচ,-দশজনের উপরে নয়; বরং হাজারো লাখো মানুষের উপর পরীক্ষা চালান। এরপর তাঁদের অভিজ্ঞতা ও ফলাফলের দ্বারা উপকার লাভ করে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের উপকার সাধন করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি মনে করতে হবে।

মানুষের স্বাস্থ্য ও এর স্থায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয় বর্তমানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে। দুনিয়ার প্রতিটি জাতি উন্নত হোক বা অনুন্নত, জাতীয়ভাবে বা আন্তর্জাতিকভাবে এ উদ্দেশ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান চালু করেছে এবং ক্ষমতানুযায়ী লাখো কোটি টাকা নিজেরা ও অন্যান্য দেশ থেকে সাহায্য নিয়ে ব্যয় করে থাকে। এমন কোন জাতি ধর্মীয় গোঁড়ামী ও অনুরাগের ঊর্ধ্বে উঠে দার্শনিক অনুসন্ধান এবং মানবজাতির উন্নতি কল্পে যদি এ নীতিগুলোকে নিজেদের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা করে এবং কয়েক ব্যক্তির উপর পরীক্ষা চালিয়ে এদের স্বাস্থ্য ও স্থায়িত্বের উপর এগুলোর প্রতিক্রিয়ার অনুমান করে, তাহলে আমরা অভিজ্ঞতা ও পরিদর্শনের মাধ্যমে অত্যন্ত নির্ভরতার সাথে বলতে পারি, এগুলো অত্যন্ত ফলদায়ক বলে বিবেচিত হবে। যদি কোন রাষ্ট্র বা সরকার বিরোধীদের ভয় না করে নিজেদের দেশে এগুলোর প্রচলন করে

এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা অন্যান্য জাতিকে জ্ঞাত করে, তা হলে তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের বিরাট সেবা করতে সক্ষম হবে।

এ উদ্দেশ্যে একটি সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। তা হলো, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ থেকে দু'একশত বৃদ্ধ বা প্রাচীন লোক—নির্বাচন করতে হবে যারা জীবনের শুরু থেকে এ সমস্ত নীতি পালন করে আসছে।

তাছাড়া আরো এতদসংখ্যক সমবয়সী লোক নিতে হবে, যারা এ সমস্ত নীতির উপর আমল করেনি। এ দু'দলের স্বাস্থ্যেরও তুলনামূলক পরীক্ষা কোন অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যবিদ দ্বারা করাতে হবে। তাহলে প্রথমোক্ত দলে শেষোক্ত দলের তুলনায় স্বাস্থ্যবানদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী হবে এবং তাদের আয়ুও অধিক হবে।

অবশেষে পাঠকদের নিকট আমাদের শেষ অনুরোধ এই যে, তারা যেন নিজেদের আবেগ-অনুরাগ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঊর্ধ্বে উঠে নিজের জ্ঞানের পরিধি দ্বারা এ সমস্ত নীতির উপর গবেষণা ও চিন্তা করে এবং এগুলোর দ্বারা উপকার ও ফল লাভ করে।

IFP—86-87—P/3391—5250—15.9.1986